মঈদুল হাসান

মূলধারা '৭১

মূলধারা '৭১

মঈদুল হাসান

ওয়েব সংস্করণ

সূচিপত্র

প্রকাশকের ভূমিকা

www.profile-bengal.com ওয়েব সাইট- এ মঈদুল হাসান রচিত মূলধারা: '৭১ পাঠকদের কাছে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিতে দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)- কে কিছুটা দ্বিধায় পড়তে হয়েছিল।

কেননা ১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকেই বইটি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। ১৯৯২ সালে বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যে বইটি এখন ওয়েব সাইট- এ পরিবেশিত হয়েছে সেটি ঐ সংস্করণের ৫ম মুদ্রণ (২০০৮)। একটি বাণিজ্য- সফল বইয়ের সম্পূর্ণ অংশ কোন মূল্য ছাড়াই ওয়েব সাইট- এ উন্মুক্ত করে প্রত্যক্ষভাবেই প্রকাশক কিছুটা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছে।

অন্যদিকে ওয়েব সাইট- এ মূলধারা: '৭১ উন্মুক্ত করার পক্ষের কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমটি হলো সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষি বৃহত্তর পাঠকের কাছে সম্পূর্ন বইটি সহজলভ্য করা। দ্বিতীয়টি হলো, এর ফলে নতুন করে বইটির উপর যে সব আলোচনা শুরু হবে তা এই বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ অথবা অন্য আরো বই রচনার কাজে সহায়ক হতে পারে।

এই বইতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ও তার আগে- পিছের তাৎপর্যময় ঘটনার বিশ্লেষন ও বর্ণনা আছে - যা লেখা হয়েছিল ঐ সময়কার জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রেক্ষিত গভীরভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক ঘটনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা এই বইটিকে করে তুলেছে একটি অনন্য দলিল। এটা এই লেখকের পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বেশ কিছু কূটনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এবং প্রত্যক্ষভাবে না- হলেও তিনি অনেক ঘটনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

মূলধারা: '৭১ প্রকাশের পর বিভিন্ন সূত্র থেকে, বিশেষ করে মার্কিন সরকার ও ইউএস লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, সম্প্রতিকালে বেশ কিছু দলিলপত্র জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছে। কাজেই এই বই এবং সম্প্রতিকালের দলিলপত্র অবলম্বন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিষয়ে নতুন তথ্য, প্রসঙ্গ ও বিবেচনা উঠে আসার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাও ক্ষীণ নয় যে, এই ওয়েব সংস্করণের ফলে বইটির আসন্ন ইংরেজি ভাষ্য পাঠকের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

মহিউদ্দিন আহমেদ
প্রকাশক, ইউপিএল

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সমকালীন ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর রাজনৈতিক ভাবাবেগ ও পক্ষপাতিত্ব প্রায়শ এক সাধারণ সমস্যা। যদি কোন কারণে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে বর্ণনাকারীর কিছু সংস্রব ঘটে, তবে আত্মপ্রকাশের প্রবণতাও একটি অতিরিক্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিবরণ হারায় ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতা। এই দ্বিবিধ বাধা অতিক্রমের জন্য যে নিরাসক্ত নিষ্ঠা ও সততা প্রয়োজন, তা সম্যক আয়ত্ত করার দাবী আমার নেই। তবে এই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ও যত্নবান থেকেছি বিনীতভাবে তার উল্লেখ রাখতে চাই।

এই গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও মূল ঘটনাধারাকে নিয়ে লেখা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের যে সব নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে আমি জড়িত হয়ে পড়েছিলাম এবং এই সংগ্রামের সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্হাপনার যে দিকগুলি সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম, সেগুলিকে ভিত্তি করেই ১৯৭২ সালে এই গ্রন্হের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করা হয়। পরে সেই ভিত্তির সমপ্রসারণ ঘটে। মূল ঘটনাপ্রবাহ ও তার জটিল বিস্তার অনুধাবনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে, মুখ্যত এই বিবেচনা থেকে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উল্লেখ এই গ্রন্হে করা হয়েছে। কাজেই সমগ্র কর্মকাণ্ডের অনুপাতে এগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব নগণ্য বলে মনে করা হলে আমার কোন আপত্তি নেই। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার ব্যাপ্তি বিশাল, উপাদান অত্যন্ত

জটিল এবং অসংখ্য ব্যক্তির আত্মত্যাগ ও অবদানে সমৃদ্ধ। এই সমস্ত কিছুর উল্লেখ ও বিবরণ এই গ্রন্থের বর্তমান কলেবরে সম্ভব ছিল না। এর ফলে কারো অবদান খর্বিত বা অনুল্লেখিত হয়ে থাকলে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং তজ্জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। একাত্তুরের সংগ্রামের মূল উপাদান ও তথ্যাদি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে, সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং সময় ও ঘটনার পারস্পর্য অক্ষুণ্ন রেখে উপস্হাপন করাই এই গ্রন্থের প্রয়াস।

এই গ্রন্থের আলোচিত সময় ১৯৭১-এর মার্চ থেকে ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারীতে শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত। একাধিক কারণে এই সময়কে একটি অখণ্ড কাল হিসেবে আমি গণ্য করেছি। আগের ইতিহাসের সামান্য পটভূমি স্পর্শ করা ব্যতীত এই গ্রন্থের বর্ণনাকে উপরোক্ত সময়ের অনুশাসনে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। সম্ভবত এর ফলে এই সময়কে তার নিজস্ব আলোকে উপলব্ধি করা সহজতর হবে।

ঘটনার চৌদ্দ বছর পর এই রচনা সমাপ্ত হতে চলেছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে স্মৃতি প্রায়শই অনির্ভরযোগ্য। কাজেই এই গ্রন্থ রচনাকালে অসমর্থিত স্মৃতিকে পরিহার করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন এবং সেই ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে গ্রন্থ রচনার প্রথম উদ্যোগকালে, ১৯৭২ সাল থেকে পরবর্তী চার বৎসরে, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও যে গবেষণার চেষ্টা আমি করেছিলাম তার ফলে দলিলপত্র, সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত জার্নাল, মুদ্রিত তথ্য, ঘটনাপঞ্জি প্রভৃতি অনেক কাগজপত্র জমে ওঠে। এগুলি বিস্মৃতির ক্ষতিপূরণে বহুলাংশে সহায়ক হয়েছে। গত দু'বছরে এই গ্রন্থ রচনাকালে আরও কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যাদির সূত্র বা উৎস কোন কোন ক্ষেত্রে অনুল্লেখিত থাকলেও এগুলির সত্যতা ও নিরপেক্ষতা যতদূর সম্ভব পুনর্বার যাচাই করে দেখার চেষ্টা করেছি। তৎসত্ত্বেও যদি তথ্যের কোন ভুলভ্রান্তি থাকে তার দায়িত্ব একান্ত ভাবেই আমার। গ্রন্থের পাদটীকায় 'একান্ত সাক্ষাৎকার' হিসাবে পরিবেশিত তথ্য ও অভিমতগুলি আজও অন্যত্র অপ্রকাশিত এবং বর্তমান রচনার জন্যই বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত।

এই গ্রন্থের রচনা, প্রকাশনা এবং বিশেষ করে, সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গবেষণাকালে যাঁদের অকৃপণ সহযোগিতায় আমি উপকৃত হয়েছি তাঁদের

নামের তালিকা দীর্ঘ। এঁদের অনেকে আজ লোকান্তরিত। এঁদের সবার কাছে আমি ঋণ স্বীকার করি।

ঢাকা,
১৮ইডিসেম্বর,১৯৮৫
মঈদুল হাসান

দ্বিতীয় সংস্করনের ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ও বর্তমান সংস্করণের মাঝে বিশ্বে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে তা আন্তর্জাতিক ব্যবস্হার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে যে বৈরিতামূলক ব্যবস্হা, ঠাণ্ডাযুদ্ধের যে উন্মত্ততা বহাল ছিল পৃথিবী জুড়ে, ইতিমধ্যে তার বহুলাংশের বিলোপ ঘটেছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। এই বিশাল পরিবর্তন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তির ক্ষেত্রকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে, যা দু'বছর আগেও অকল্পনীয় ছিল। এই সংস্করণ প্রকাশকালে পরিস্হিতি ও দৃষ্টিভঙ্গির এ সমুদয় পরিবর্তনের মধ্যে যতখানি প্রাসঙ্গিক তা আমি বিবেচনায় রেখেছি। আমার মনে হয়েছে, এই সংস্করণে প্রথম প্রকাশের বর্ণনা ও যুক্তিবিন্যাস অনেকখানিই অপরিবর্তিত রাখা যায়। অপরিবর্তিত রাখার বড় কারণটি অবশ্য পদ্ধতিগত - মুক্তিযুদ্ধকে তার নিজস্ব সময়ের যুক্তিতে উপস্হাপন করার প্রয়োজন বোধহয় সব সময়েই থাকবে, অন্যদিকে যেমন বিভিন্ন সময় ও পরবর্তী অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধ উপস্হাপিত বা বিশ্লেষিত হতে পারে বিভিন্নভাবেই।

কাজেই সংশোধন বা পরিবর্তন এই সংস্করণে বড় কিছু নেই। সংযোজন যতটুকু করা হয়েছে তা পূর্বে উল্লেখিত ঘটনা বা যুক্তিকে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই। এ যাবত অপ্রকাশিত কিছু দলিল পরিবেশন করা হল এই সূত্রে। আর কিঞ্চিৎ পরিমার্জনা করা হয়েছে কিছু ভাষার।

লেখক
জানুয়ারী ১৯৯২

অধ্যায় - ১ : ২৫ শে মার্চের প্রাক্কাল

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দূরবর্তী কারণ অনেক ছিল। এর মাঝে সর্ববৃহৎ কারণ ছিল ১৯৪৭ সালে - বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তিকালে - ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্হানের সকল বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনার অভিনবত্বে। দ্বিতীয় বৃহৎ কারণ ছিল ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন নানা ভাষাভাষীদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের উপযোগী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অন্বেষণে পাকিস্তানী নেতৃবর্গের সম্যক ব্যর্থতা। ফলে পাকিস্তানের কাঠামোগত স্ববিরোধিতার সমাধান না ঘটে বরং দ্বন্দ ও সংঘাতের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে ওঠে।[১] পাকিস্তান গঠনের পর থেকেই বাঙালীরা রাষ্ট্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত,বঞ্চিত ও শোষিত হতে শুরু করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা কখনো রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন,কখনো স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন,কখনো জনসংখ্যাভিত্তিক আইন পরিষদ গঠনের দাবী এবং কখনো অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবী করে এসেছে।

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে পূর্ব বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ। নানা জোয়ার ও ভাটা,ঐক্য ও বিভেদ সত্ত্বেও এই সংগ্রামের ধারা সর্বদা প্রবহমান ছিল। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে পূর্ব বাংলার মানুষের সুস্পষ্ট অভিমত প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে সংঘটিত প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে। বিরোধীদলীয় যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচী ‘একুশ- দফায়’ বলা হয়, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত অপর সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আনা প্রয়োজন। নব নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু অচিরেই পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন আরোপ করে ব্যাপক দমনমূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করে। এর পর শুরু হয় স্বায়ত্তশাসনকামী দলসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব,বিভেদ ও তাদের একাংশের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস।

প্রায় একই সময়ে আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডাযুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ায় সম্প্রসারিত হয় এবং পাকিস্তানের সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার এক পর্যায়ে ১৯৫৮ সালে

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ফলে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সমস্যা নিরসনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ১৯৬০ সাল থেকে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার উপায় হিসেবে পূর্ব বাংলার সম্পদের একতরফা পাচার রোধ এবং সেই সম্পদ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তার একনিষ্ঠ অনুগামী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৩ সালে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এই দলকে পুনরায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষাবলম্বী করে তোলেন। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার যুদ্ধ অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানে যে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়, সেই পটভূমিতে শেখ মুজিব তার বিখ্যাত ছ’দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা ছিল পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে বাঙালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ দাবী।

পূর্ব ও পশ্চিমের এই বিরোধ ছাড়াও সামরিক বনাম বেসামরিক শাসনের বিষয় ছিল দেশের আর একটি প্রধান রাজনৈতিক বিতর্ক। এই শেষোক্ত বিতর্কের সূত্র ধরে ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুবের ১০ বছর স্হায়ী স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। তার কিছু পরে পূর্ব পাকিস্তানে যখন এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে,তখন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্হা ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবী সম্বলিত ছ’ দফা কর্মসূচীর প্রবক্তা শেখ মুজিব বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

আইয়ুবের পতনের পর সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য সরাসরি দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও গণ- অভ্যুত্থানের ব্যাপকতাদৃষ্টে একথা তাদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দেশে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের পুনঃপ্রবর্তন অসম্ভব এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের গণদাবী অপ্রতিরোধ্য। এই অবস্হায় সেনাবাহিনী রাজনৈতিক দলসমূহের এক দুর্বল যুক্ত সরকার গঠন করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। কেন্দ্রে একটি বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন সামরিকচক্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নানা দ্বিপাক্ষিক গোপন সমঝোতা গড়ে তুলতে থাকে। তারই ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[২]

পাকিস্তানের অনন্যসাধারণ গঠন- কাঠামোর দরুন এবং বিশেষত পূর্ব বাংলার উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নের ফল হিসেবে এই অঞ্চলে নির্বাচনের রায় প্রায় সর্বাংশে যায় আওয়ামী লীগের ছ'দফার পক্ষে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন দখল করে আওয়ামী লীগ ৩১৩ আসন- বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠনে ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যোগ্যতা অর্জন করে। ঘটনাটি ছিল পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সমূহ আঘাত।

পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলঃ (১) পূর্ব বাংলার উপর পাঞ্জাবের তথা পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বিক আধিপত্য এবং (২) আর্থিক বরাদ্দ লাভের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ অধিকার। ছ'দফায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ে এই দুটি স্বার্থই সমূলে বিপন্ন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রে একটি দুর্বল বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের পূর্ববর্তী পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষমতাসীন জান্তা পরোক্ষ পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের আশা ত্যাগ করে এবং তৎপরিবর্তে প্রত্যক্ষ সামরিক পন্থায় ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার পরিকল্পনা তৈরিতে উদ্যোগী হয়।[৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ তেইশ বছর পর প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন ছিল এই প্রথম। নির্বাচনী ফলাফল থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন ও ক্ষমতার ভাগ- বাটোয়ারার প্রশ্নে দেশের দুই অংশের জনমত সম্পূর্ণ বিভক্ত ও পরস্পরবিরোধী; এই পরস্পরবিরোধী জনমতকে একত্রিত বা নিকটবর্তী করার ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দলেরই নেই। পাকিস্তানের এই সুগভীর রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলার জন্য ক্ষমতাসীনদের সামনে ছিল মূলত দুটি বিকল্পঃ ছ'দফা কর্মসূচী অনুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের লুপ্ত- প্রায় পারস্পরিক আস্থা পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা করা; অথবা, নির্বাচনের রায় অগ্রাহ্য করে নগ্ন সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তন করা। ১৯৭১ সালে কোন বিকল্প পন্থাই দেশ বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকি থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না। তবে, প্রথম বিকল্পে যেমন রক্তপাত ও প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল তুলনামূলকভাবে কম, তেমনি উভয় অংশের পূর্ণ বিচ্ছেদ বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী।

পাকিস্তানী জান্তা তাদের পেশাগত প্রবণতার দরুন সামরিক শক্তি প্রয়োগের পথকে বেছে নেয়। পাকিস্তানের দুরারোগ্য রাজনৈতিক সঙ্কটের ওপর এহেন সামরিক সমাধান চাপিয়ে দেবার সাথে সাথে পাকিস্তানের বিপর্যয় ত্বরান্বিত হয়।

সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু সময়ের। কাজেই জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানে নানা গড়িমসির পর ভুট্টোর মাধ্যমে কিছু শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়। জান্তা পরোক্ষভাবে এ কথাই জানিয়ে দেয় যে, ছ'দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র তাদের গ্রহণযোগ্য নয় এবং আওয়ামী লীগ ছ'দফার সংশোধনে সম্মত না হলে পরিষদ অধিবেশনের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ছ'দফার পক্ষে পূর্ব বাংলার মানুষের সর্বসম্মত রায়ের ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষে এমন আপোসরফা ছিল রাজনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর।

তা ছাড়া জাতীয় পরিষদ বৈঠক বাতিলের সাথে সাথে সারা পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত গণ- বিস্ফোরণ ঘটে। এই অভূতপূর্ব গণ- অভ্যুত্থানকে একটি অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করতে আওয়ামী লীগ অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। গণ- আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রদেশের সমগ্র প্রশাসন বিভাগ কার্যত এক বিকল্প সরকারে পরিণত হয়। তৎদৃষ্টে সামরিক জান্তা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে একমাত্র চূড়ান্ত আঘাতের মাধ্যমেই বাঙালীদের এই নতুন আত্মপ্রত্যয় প্রতিহত করা সম্ভব।

জানুয়ারী বা সম্ভবত তার আগে থেকেই যে সমর প্রস্তুতির শুরু হয়েছিল,[৪] তার অবশিষ্ট আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য মার্চের মাঝামাঝি থেকে ইয়াহিয়া- মুজিব আলোচনার ধূম্রজাল বিস্তার করা হয়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুগপৎ সন্দিহান ও আশাবাদী থাকায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পক্ষে আসন্ন সামরিক হামলার বিরুদ্ধে যথোপযোগী সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্হা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত একই কারণে ২৫/২৬শে মার্চের মধ্যরাতে টিক্কার সমর অভিযান শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বাধীনতার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উঠতে পারেননি। শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী যারা তার সাথে দেখা করেছিলেন, তাদেরকে নিরাপদ স্হানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েও তাদের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ

নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব রয়ে যান নিজ বাসভবনে। সেখান থেকে গ্রেফতার হন হত্যাযজ্ঞের প্রথম প্রহরে। কিন্তু যেভাবেই হোক, ঢাকার বাইরে একথা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন এবং পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করে চলেছেন। সম্ভবত তিন সপ্তাহাধিক কালের অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় এমন এক মৌল রূপান্তর ঘটে যে পাকিস্তানীদের নৃশংস গণহত্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তানী আক্রমণের সাথে সাথে অধিকাংশ মানুষের কাছে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ঘোষণা হয়ে ওঠে এক অভ্রান্ত পথ - নির্দেশ।

অধ্যায় - ২: মার্চ - এপ্রিল

২৫/২৬শে মার্চে নিরস্ত্র জনতার উপর পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণ সামরিক বর্বরতার ক্ষেত্রে সর্বকালের দৃষ্টান্তকে ম্লান করে ফেললেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই আক্রমণ ছিল দুর্বল এবং মূলত আত্মঘাতী। পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের অধিবাসীদের মধ্যে তুলনাহীন ভীতির সঞ্চার করে পাকিস্তানী রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। কিন্তু ঢাকার বুকে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড শুরু করায় এবং বিশেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানায় ‘ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস’ (ইপিআর)- এর সদর দফতরের উপর পাকিস্তানী বাহিনীর ঢালাও আক্রমণ চালাবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঢাকার বাইরে ঘটনা মোড় নেয় অভাবনীয় বিদ্রোহের পথে।

ঢাকার রাজারবাগ ও পিলখানায় এবং চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানী বাহিনী যথাক্রমে বাঙালী পুলিশ, ইপিআর এবং ‘ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট’ (ইবিআর)- এর সৈন্যদের পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করেছে এই সব সংবাদ আগুনের মত সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন স্হানে সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী অংশ আত্মরক্ষা ও দেশাত্মবোধের মিলিত তাগিদে, উচ্চতর রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারো আহ্বান ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই, বিদ্রোহ শুরু করে।

এর ফলে সেনাবাহিনীর নির্মম ও সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানী কর্তৃত্ব পুনঃপ্রবর্তনের যে পরিকল্পনা টিক্কা খানের ছিল,[৫] তা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়। সশস্ত্রবাহিনীর বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ এবং উদ্ভূত খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে চট্টগ্রামস্থিত ৮ইবি ও ইপিআর বাহিনীর সশস্ত্র প্রতিরোধ একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। স্বল্পকালের জন্য চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র যখন বিদ্রোহীদের দখলে আসে, তখন ২৬শে মার্চ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান এবং ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় ৮ইবির বিদ্রোহী নেতা মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া তাঁর প্রথম বেতার বক্তৃতায় নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসেবে ঘোষণা করলেও, পরদিন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করেন। এই সব ঘোষণায় বিদ্যুতের মত লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, শেখ মুজিবের নির্দেশে সশস্ত্রবাহিনীর বাঙালীরা স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই শুরু করেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বেতারের এই সব ঘোষণার পিছনে না ছিল এ ধরনের রাজনৈতিক অনুমোদন, না ছিল কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি।

অন্যদিকে পাকিস্তানী বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, বেপরোয়া গোলাগুলি ও অগ্নি-সংযোগের মুখে রাজনৈতিক নেতা, কর্মী এবং সশস্ত্রবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালীরা তো বটেই, বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষও নিরাপত্তার সন্ধানে শহর থেকে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে শুরু করে, প্রথমে হাজারের অঙ্কে, পরে লক্ষের - বিরামহীন, বিরতিহীন। এমনিভাবে পাকিস্তানের আঞ্চলিক বিরোধ ও গৃহযুদ্ধের সাথে ভারত ক্রমশ জড়িত হয়ে পড়ে এই ভীত সন্ত্রস্ত শরণার্থীদের জোয়ারে।[৬] চৌদ্দশ' মাইল স্থল-সীমান্ত বিশিষ্ট কোন অঞ্চলের উপর যে ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর পরীক্ষিত 'সমাধান' চাপিয়ে দেয়া যায় না, এই উপলব্ধি টিক্কা খানের পরিকল্পনায় ছিল মর্মান্তিকভাবেই অনুপস্থিত। পূর্ব বাংলার এই অনন্য ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য একদিকে যেমন পাকিস্তানী আক্রমণ ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তেমনি অন্যদিকে আক্রান্ত পূর্ববঙ্গবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম ক্রমশ এক সফল মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়।

সামরিক আক্রমণের অবর্ণনীয় ভয়াবহতার ফলে সাধারণ মানুষের চোখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অস্তিত্বের অবশিষ্ট যুক্তি রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই ভয়াবহতা থেকে উদ্ধার পাওয়ার

একমাত্র উপায় হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম অধিকাংশ মানুষের নৈতিক সমর্থন লাভ করে। আর যারা আক্রান্ত অথবা বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তারা অচিরে জড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধের লড়াইয়ে। ২৬শে মার্চের পর থেকে প্রথম দশ দিনের মধ্যেই এই প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্বে তিনটি স্বতন্ত্র উদ্যোগ পরিস্ফুট হয়।

প্রথম উদ্যোগ ছিল আক্রান্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর-এর সেনা ও অফিসারদের সমবায়ে গঠিত। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল বাঙালী সৈন্য ও অফিসারই যে এতে যোগ দিয়েছিল তা নয়। অনেকে নিরস্ত্রকৃত হয়েছে, অনেকে বন্দী হয়ে থেকেছে, আবার অনেকে শেষ অবধি পাকিস্তানীদের পক্ষে সক্রিয় থেকেছে। বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ যুদ্ধে ইপিআরদের অংশগ্রহণ বরং ছিল অনেক বেশী ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত। যেমন ছিল বাঙালী পুলিশদের। মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলির মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এই সব স্হানীয় ও খণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হবার বিষয়টি এদের জন্য মুখ্যত ছিল অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উপস্হিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এই যুদ্ধের রাজনৈতিক উপাদান সম্পর্কে এদের অধিকাংশের জ্ঞানও ছিল সীমিত। তবু বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে এদের জন্য পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়।[৭] হয় 'কোর্ট মার্শাল' নতুবা স্বাধীনতা - এই দুটি ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে। এমনিভাবে পাকিস্তানী আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে স্বাধীনতার লড়াইয়ে শামিল হয় প্রায় এগারো হাজার ইবিআর এবং ইপিআর-এর অভিজ্ঞ সশস্ত্র যোদ্ধা - কখনও কোন রাজনৈতিক আপোস-মীমাংসা ঘটলেও দেশে ফেরার পথ যাদের জন্য ছিল বন্ধ, যতদিন না বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়।

প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্বে দ্বিতীয় উদ্যোগের সমাবেশ ও গঠন প্রথম ধারার মত ঠিক আকস্মিক, অপরিকল্পিত বা অরাজনৈতিক ছিল না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী যুব সংগঠনের চারজন নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ ও আবদুর রাজ্জাক সরাসরি কোলকাতায় এসে পড়েন। শেখ মুজিবের বিশেষ আস্হাভাজন হিসাবে পরিচিত এই চার যুব নেতারই আওয়ামী লীগের তরুণ কর্মীদের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল। বিশেষ করে অসহযোগ

আন্দোলন চলাকালে এই তরুণ নেতাদের ক্ষমতা অসামান্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রবেশের পর থেকে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত ভূমিকা গ্রহণ করেন। এদের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্হা 'Research and Analysis Wing' (RAW)- এর পৃষ্ঠপোষকতায় ‘মুজিব বাহিনী’ নামে প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন এক সশস্ত্রবাহিনীর জন্ম হয়, এক সময় যার কার্যকলাপ স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনেকখানি বিভক্ত করে ফেলে।

এই সংস্হার সাথে তাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ আকস্মিক ছিল না। যতদূর জানা যায়, পাকিস্তানী শাসকবর্গ যদি কোন সময় পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসী হয়, তবে সেই আপৎকালে আওয়ামী লীগপন্থী যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং প্রদানের জন্য শেখ মুজিব ভারত সরকারকে এক অনুরোধ করেছিলেন। এই ট্রেনিং যে উপরোক্ত চার যুব নেতার অধীনে পরিচালিত হবে সে কথা সম্ভবত মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের কোন এক পর্যায়ে তিনি ভারত সরকারকে জানান। শেখ মুজিবের এই কথিত অনুরোধের সত্যাসত্য নিরূপণের কোন উপায় না থাকলেও, এই চার যুবনেতা সীমান্ত অতিক্রম করার পর প্রাকাশ্যে দাবী করতে থাকেন যে, সশস্ত্রবাহিনী ট্রেনিং এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনার জন্য শেখ মুজিব কেবল মাত্র তাঁদের চারজনের ওপরেই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, অপর কারো ওপরে নয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ অবধি তাদের এই দাবী ও ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকে।

প্রতিরোধ যুদ্ধের তৃতীয় উদ্যোগ যদিও অচিরেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ধারায় পরিণত হয়, তবু সূচনায় তা না ছিল বাঙালী সশস্ত্রবাহিনীর বিদ্রোহের মত অভাবিত, না ছিল যুব ধারার মত ‘অধিকারপ্রাপ্ত’। পাকিস্তানী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কার্যত সমগ্র আওয়ামী লীগ সংগঠন দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আক্রমণের অভাবনীয় ভয়াবহতা, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নেতার কারাবরণ, পরবর্তী কর্মপন্হা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে সম্যক অনিশ্চয়তা ইত্যাকার বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মূলত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ এক দুর্লভ বৈপ্লবিক পরিস্হিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে প্রয়াসী হয়। আওয়ামী লীগের এই প্রয়াসে অনেক নেতা এবং অগণিত কর্মীর অবদান ছিল। এদের মধ্যে মত ও পথের বিভিন্নতাও ছিল বিস্তর। তৎসত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে এই দল পরিণত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের

প্রধান রাজনৈতিক যন্ত্রে। এবং যন্ত্রের চালক হিসাবে একজনের ভূমিকা ছিল সন্দেহাতীতরূপে অনন্য। তিনি তাজউদ্দিন আহমদ।

তাজউদ্দিন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, দুই দশকেরও অধিক কাল ধরে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হবার পর থেকে সকল দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর অন্যতম মুখ্য প্রণেতা, দলের সকল মূল কর্মকাণ্ডের নেপথ্য ও আত্মপ্রচার-বিমুখ সংগঠক। ’৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মুজিবের পরেই ছিল সম্ভবত তাঁর স্হান।

২৫শে মার্চের সন্ধ্যায় যখন পাকিস্তানী আক্রমণ অত্যাসন্ন, তখন শেখ মুজিব তাজউদ্দিনকে ঢাকারই শহরতলিতে আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন যাতে ‘শীঘ্রই তাঁরা পুনরায় একত্রিত হতে পারেন’।[৮] তারপর এক নাগাড়ে প্রায় তেত্রিশ ঘণ্টা গোলাগুলির বিরামহীন শব্দে তাজউদ্দিনের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি- যে অনুমানের ভিত্তিতেই তাঁকে শহরতলিতে অপেক্ষা করতে বলা হয়ে থাকুক, তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। তরুণ সহকর্মী আমিরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ২৭শে মার্চ ঢাকা ত্যাগের আগে দলের কোন নেতৃস্হানীয় সদস্যের সাথে আলাপ-পরামর্শের কোন সুযোগ তাজউদ্দিনের ছিল না।[৯] তা সত্ত্বেও পরবর্তী লক্ষ্য ও পন্থা সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের কোন বিলম্ব ঘটেনি: (১) পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সর্বাত্মক আঘাতের মাধ্যমে যে নতুন পরিস্হিতির সৃষ্টি হয় তার হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ তথা মুক্তির লড়াই; (২) এই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামকে সংগঠিত করার প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ হিসাবে ভারত ও অন্যান্য সহানুভূতিশীল মহলের সাহায্য-সহযোগিতা লাভের জন্য অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া।[১০] প্রথমে আত্মরক্ষা, তারপর প্রস্তুতি এবং সব শেষে পাল্টা-আঘাতের পর্যায়ক্রমিক লক্ষ্য স্হির করে সসঙ্গী তাজউদ্দিন ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ার পথে পশ্চিম বাংলার সীমান্তে গিয়ে হাজির হন ৩০শে মার্চের সন্ধ্যায়। সারা বাংলাদেশে তখন বিদ্রোহের আগুন। বিদ্রোহী সিপাহীদের পাশে প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা। স্বাধীনতার জন্য সারা দেশ একতাবদ্ধ।

অধ্যায় - ৩: এপ্রিল

সীমান্ত অতিক্রম করার আগে কয়েকবারই তাজউদ্দিন মনে করেছিলেন হয়তবা এই আপৎকালীন পরিস্হিতি মোকাবিলার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে কোন ব্যবস্হা ভারত সরকারের সাথে করা হয়েছে। তাঁর এ কথা মনে করার বিশেষ একটি কারণ ছিল। ৫ই অথবা ৬ই মার্চে শেখ মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দিন গোপনে সাক্ষাৎ করেন ঢাকাস্হ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার কে. সি. সেনগুপ্তের সঙ্গে। উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানের শাসকেরা যদি সত্য সত্যই পূর্ব বাংলায় ধ্বংসতাণ্ডব শুরু করে, তবে সে অবস্হায় ভারত সরকার আক্রান্ত কর্মীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ সংগ্রামে কোন সাহায্য- সহযোগিতা করবে কিনা জানতে চাওয়া। উত্তরের অন্বেষণে সেনগুপ্ত দিল্লী যান। সারা ভারত তখন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে মত্ত। সেখানে সরকারী মনোভাব সংগ্রহ করে উঠতে উঠতে তাঁর বেশ কদিন কেটে যায় এবং ঢাকা ফেরার পর সেনগুপ্ত ১৭ই মার্চে ভাসাভাসাভাবে তাজউদ্দিনকে জানান যে, পাকিস্তানী আঘাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইসলামাবাদস্ত ভারতীয় হাইকমিশনার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন; ‘তবু আঘাত যদি নিতান্তই আসে’, তবে ভারত আক্রান্ত মানুষের জন্য ‘সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা’ প্রদান করবে। এই বৈঠকে স্হির হয়, তাজউদ্দিন শেখ মুজিবের সাথে পরামর্শের পর সেনগুপ্তের সঙ্গে আবার মিলিত হবেন এবং সম্ভবত তখন তাজউদ্দিন সর্বশেষ পরিস্হিতির আলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য- সহযোগিতার প্রকার ও ধরন সম্পর্কে নির্দিষ্ট আলোচনা চালাতে সক্ষম হবেন। ২৪শে মার্চে এই বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে না পারায় এবং নির্ধারিত সময়ে তাজউদ্দিনকে অসহযোগ আন্দোলন- সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সংশোধনের মুসাবিদায় ব্যস্ত রাখায়, সেনগুপ্তের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সীমান্ত অতিক্রমের আগে তাজউদ্দিন ভেবেছিলেন, হয়তবা ২৪শে মার্চের আলাপ অন্য কারো মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে এবং সম্ভবত এই আপৎকালীন পরিস্হিতি মোকাবিলার কোন ব্যবস্হা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।[১১]

সীমান্তে পৌঁছুবার পর তাঁর আশাভঙ্গ ঘটে। তিনি দেখতে পান, বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সেনাদের সমর্থনে ভারতের সামরিক ইউনিটসমূহের হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নেই; এমনকি অস্ত্র ও গোলা- বারুদ সরবরাহের কোন এখতিয়ারও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের হাতে নেই। স্হানীয় ভিত্তিতে দু'একটি জায়গায় ব্যতিক্রম থাকলেও সে সব ক্ষেত্রেও তাদের দেওয়া সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অতি সামান্য। মুক্তিফৌজ গঠনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বরাদ্দ করার আবেদনের জবাবে সীমান্ত রক্ষী (বিএসএফ)- প্রধান রুস্তমজী প্রাঞ্জল ভাষায় তাজউদ্দিনকে জানান: মুক্তিফৌজ ট্রেনিং বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এই ট্রেনিং সমাপ্ত হবার পরেই কেবল তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে; কিন্তু এই ট্রেনিং বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের দেওয়া হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্তের সংবাদ এখনও তাঁর জানা নেই; এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এবং তাজউদ্দিন চাইলে তাঁকে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার ব্যবস্হা করে দিতে পারেন মাত্র।[১২] তাজউদ্দিন বুঝলেন, ভারতের সঙ্গে কোন ব্যবস্হাই নেই, কাজেই শুরু করতে হবে একদম প্রথম থেকে।

৩রা এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা শুরু করার পূর্বে কয়েকটি মূল বিষয়ে তাজউদ্দিনকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তখনও তিনি দলের নেতৃস্হানীয় অপরাপর সহকর্মীদের সাক্ষাৎ পাননি। তাঁরা জীবিত কি মৃত, পাকিস্তানী কারাগারে বন্দী কি সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টায় রত - এমন কোন তথ্যই তখন অবধি তাঁর কাছে পৌঁছায়নি। এই অবস্হায় তাঁকে স্হির করতে হয় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনাকালে তাঁর নিজের ভূমিকা কি হবে? তিনি কি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের একজন ঊর্ধ্বতন নেতা হিসাবে আলাপ করবেন? তাতে বিস্তর সহানুভূতি ও সমবেদনা লাভের সম্ভাবনা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী পর্যাপ্ত অস্ত্র লাভের কোন আশা আছে কি? বস্তুত তাজউদ্দিনের মনে কোন সন্দেহই ছিল না যে, একটি স্বাধীন সরকার গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে সেই সরকারের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত হওয়ার আগে, ভারত তথা কোন বিদেশী সরকারের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করা নিরর্থক। কাজেই, সামরিক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে যদি সরকার গঠন করে থাকেন তবে সেই সরকারের নেতৃস্হানীয় সদস্য হিসাবে তাজউদ্দিনের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আসা এবং সাহায্য

সংগ্রহের চেষ্টা করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত ও সহজসাধ্য হবে বলে তাজউদ্দিন মনে করেন। অন্ততপক্ষে ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা একটি অনিবর্তনীয় বিষয় হিসাবেই গণ্য হবে বলে তাঁর ধারণা জন্মায়।

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকের আগের দিন দিল্লীতে তাঁরই এক ঊর্ধ্বতন পরামর্শদাতা পি.এন. হাকসার তাজউদ্দিনের সাথে আলোচনাকালে জানতে চান, আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে কোন সরকার গঠন করেছে কিনা। এই জিজ্ঞাসা ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা থেকে তাজউদ্দিন বুঝতে পারেন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে কি হয়নি সে সম্পর্কে কোন প্রকৃত সংবাদ ভারত কর্তৃপক্ষের জানা নেই এবং সরকার গঠনের সংবাদে তাদের বিস্মিত বা বিব্রত হওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই। বরং সরকার গঠিত হয়েছে জানতে পারলে 'পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে সাহায্য করার' জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট ৩১শে মার্চ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা এক নির্দিষ্ট ও কার্যকর রূপ লাভ করতে পারে বলে তাজউদ্দিনের ধারণা জন্মায়।[১৩]

এই সব বিচার-বিবেচনা থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের সূচনাতে তাজউদ্দিন জানান যে পাকিস্তানী আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ২৫/২৬শে মার্চেই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে একটি সরকার গঠন করা হয়েছে। শেখ মুজিব সেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে যোগদানকারী সকল প্রবীণ সহকর্মীই (পরে 'হাইকমান্ড' নামে যাঁরা পরিচিত হন) মন্ত্রিসভার সদস্য। শেখ মুজিবের গ্রেফতারের খবর ছাড়া অন্যান্য সদস্যের ভাল-মন্দ সংবাদ তখনও যেহেতু সম্পূর্ণ অজানা, সেহেতু তাজউদ্দিন দিল্লীতে সমবেত দলীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।[১৪]

তাজউদ্দিনের এই উপস্থিত সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অসামান্যভাবে শক্তি সঞ্চারিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী 'বাংলাদেশ সরকারের' আবেদন অনুসারে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। কিন্তু তাজউদ্দিনের এই একক ও উপস্থিত সিদ্ধান্ত মুক্তিসংগ্রামের জন্য যতই ফলপ্রসূ হয়ে থাকুক, এর ফলে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে

নেতৃত্বের দ্বন্দ্বও অনিবার্য হয়ে ওঠে। নেতৃত্বের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় সমগ্র রাজনীতিকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করে রাখে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনুকূল সাড়া দেবার প্রধান কারণ সম্ভবত ছিল তিনটি। প্রথম কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের নিরবচ্ছিন্ন বৈরী সম্পর্ক এবং তৎকারণে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব। দ্বিতীয় কারণ আদর্শের ক্ষেত্রে, বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্র ও অসামপ্রদায়িকতার প্রশ্নে, আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় কংগ্রেস দলের দৃষ্টিভঙ্গিগত মিল। তৃতীয় কারণ ছিল মানবিক - পাকিস্তানী সেনাদের বর্বরতায় সারা দুনিয়ার মানুষের মন আলোড়িত হয়েছিল, ভৌগোলিক নৈকট্য হেতু স্বভাবতই ভারতে মানবিক সহানুভূতি ও সমবেদনায় সাড়া পড়েছিল সব চাইতে বেশী। কাজেই ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করার রাজনৈতিক ও মানবিক কারণ ছিল সমভাবে বিদ্যমান।

যে কোন মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিচালনার জন্য প্রধান আবশ্যকীয় শর্ত তিনটি। এক, জনগণের ব্যাপক সমর্থন। দুই, মুক্তিসেনাদের নিরাপদ আশ্রয়স্হল। এবং তিন, সমরাস্ত্রসহ বিভিন্ন উপকরণের নিয়মিত সরবরাহ। এই তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথমটি, তথা ব্যাপক জনসমর্থন, বিপুলভাবেই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পূর্ব বাংলার স্বল্প আয়তন এবং দখলদার সেনাদের ক্ষিপ্র চলাচল ও আক্রমণ ক্ষমতার দরুন পূর্ব বাংলার কোন অংশই মুক্তিসেনাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। কাজেই মুক্তিবাহিনীর সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সীমান্তের ওপারে নিরাপদ ঘাঁটির প্রয়োজন ছিল সর্বাগ্রে। প্রবাসী সরকারের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় ও অবাধ কাজকর্মের অধিকার লাভের প্রশ্ন ছিল সম পরিমাণেই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও ছিল সাধারণ শরণার্থীদের আশ্রয় দানের মানবিক প্রশ্ন। নক্সাল আন্দোলনবিক্ষত জনবহুল পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত অগণিত বিদেশী শরণার্থীর জন্য, বিশেষত সশস্ত্র বিদ্রোহীদের জন্য, উন্মুক্ত করা অসামান্য ঝুঁকিপূর্ণ হলেও আশ্রয়দানের ব্যাপারে প্রথম থেকেই ইন্দিরা গান্ধীর সম্মতি ছিল দ্ব্যর্থহীন। এই সাহসিকতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের পিছনে পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মানুষের অবদান সামান্য নয়। ইয়াহিয়ার গণহত্যার প্রতিবাদে ৩১শে মার্চ কোলকাতায় যে অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়, তার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও সম্ভাবনা কোনটিই নয়াদিল্লীর জন্য উপেক্ষণীয় ছিল না।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ইন্দিরা গান্ধী ও তাজউদ্দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত দুই দফা বৈঠকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য আশ্রয় এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য অবাধ রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাবার অধিকার প্রদান করা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস সাধারণভাবে জ্ঞাপিত হয়।[১৫] এই সব সাহায্য- সহযোগিতার প্রকার ও পরিমাণ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ধারণা গঠন করা সে মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। তৎসত্ত্বেও তাজউদ্দিন এই উপলব্ধিতে পৌঁছান যে: (১) পাকিস্তান শীঘ্র যদি হত্যা, উৎপীড়ন ও গণবিতাড়নের নীতি থেকে বিরত না হয়, তবে গোটা উপমহাদেশে এক অদৃষ্টপূর্ব উত্তেজনা ও সংঘাতের আবহাওয়া বিস্তার লাভ করবেই; এবং (২) সেই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়, তবে ভারতের প্রাথমিক সাহায্যের আশ্বাস উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হয়ে সর্বাত্মক রাজনৈতিক ও সামরিক সহায়তায় পরিণত হতে পারে।[১৬]

বস্তুত, এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেন, তার প্রথমটি ছিল ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত করার এবং দ্বিতীয়টি ছিল বাংলাদেশ সরকারকে ভারতীয় এলাকায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালাবার অধিকার দান করার। এই দুয়েরই তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। এই কারণে উভয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কেই ভারতীয় মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে এবং উচ্চতর প্রশাসনিক মহলে- বিশেষত পাশ্চাত্যপন্থী অংশের পক্ষ থেকে জোরাল আপত্তি ওঠে।[১৭] আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক শালীনতার বিষয় ছাড়াও উপরোক্ত দুই সিদ্ধান্ত ভারতের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা সে সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্ন প্রকাশ্য বিরোধিতার রূপ নেবার আগেই ইন্দিরা গান্ধী মূলত একক সিদ্ধান্ত আরোপ করেই সকল মতবিরোধের অবসান ঘটান।[১৮] মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে বিপুলভাবে জয়যুক্ত না হলে তাঁর পক্ষে এই দুই সিদ্ধান্ত এমনিভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হত কি না বলা কঠিন।

আশ্রয় ও মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার বিষয়ে ভারতীয় সম্মতি আদায়ের পর তাজউদ্দিন মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার সুদৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পান এবং সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ে সাংগঠনিক পরিকল্পনা শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন পরিকল্পনার এই পর্যায়ে তাজউদ্দিনের প্রধান বিবেচ্য

বিষয়গুলি ছিল: (ক) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সীমান্তবর্তী রণাঙ্গন নির্ধারণ, বিভিন্ন রণাঙ্গনের দায়িত্ব অর্পণ এবং অন্তর্বর্তীকালের জন্য সরবরাহ ও সহায়তা ব্যবস্হা নিশ্চিতকরণ; (খ) মন্ত্রিসভা গঠন; (গ) স্বাধীনতার স্বপক্ষে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের পন্হা নিরূপণ; (ঘ) দেশের অভ্যন্তরে অসহযোগ আন্দোলন সক্রিয় রাখার ব্যবস্হা গ্রহণ; (ঙ) বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে অস্ত্র, অর্থ ও কূটনৈতিক স্বীকৃতি লাভের আয়োজন; এবং (চ) শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম গঠন।[১৯]

দিল্লীতে তাজউদ্দিন যখন মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক পরিকল্পনা শুরু করেন, সেই সময় অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল সিলেট জেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী ইউনিটগুলির কমান্ডারগণ একত্রিত হন প্রতিরোধ যুদ্ধের সমস্যাবলী আলোচনা এবং সম্মিলিত কর্মপন্হা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। এ বৈঠকে যোগ দেন ইবিআর-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী, লে. কর্নেল আবদুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল্লা, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর মমিন চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন। এই প্রথম বিদ্রোহী কমান্ডাররা তাদের আঞ্চলিক অবস্হান ও প্রতিরোধের খণ্ড খণ্ড চিত্রকে একত্রিত করে সারা দেশের সামরিক পরিস্হিতি উপলব্ধি করার সুযোগ পান। কিন্তু যা জানতে পারেন তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। সব দিকেই পাকিস্তানী বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হতে শুরু করেছে, সবখানেই বিদ্রোহীরা প্রতিরোধের যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্হায় ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদের অভাব মেটাবার জন্য তাঁরা অবিলম্বে ভারতের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিদেশ থেকে সমর-সম্ভার সংগ্রহ করার জন্য রাজনীতিকদের সমবায়ে যথাশীঘ্র স্বাধীন সরকার গঠনের আবশ্যকতাও তাঁরা অনুভব করেন। কিন্তু সরকার গঠনের জন্য অপেক্ষা না করে, বাস্তব পরিস্হিতির চাপে তাঁরা সমস্ত বিদ্রোহী ইউনিটের সমবায়ে সম্মিলিত মুক্তিফৌজ গঠন করেন এবং কর্নেল ওসমানীকে তা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সীগুলির মাধ্যমে পূর্ব রণাঙ্গনের প্রতিরোধ সংগ্রামের এই সব ঘটনা ও সিদ্ধান্তের সংবাদ তাজউদ্দিনের কাছে পৌঁছুতে শুরু করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।[২০]

এই সব বহুমুখী বিকাশ ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির কিয়দংশ প্রতিফলিত হয় তাজউদ্দিনের প্রথম বেতার বক্তৃতায়।[*] এপ্রিলের প্রথম

সপ্তাহে দিল্লী অবস্হানকালে তাজউদ্দিনকে স্বাধীনতাযুদ্ধের মূলনীতি সম্বলিত এই বক্তৃতা তৈরীর কাজে সাহায্য করেন রেহমান সোবহান এবং আমিরুল ইসলাম।[২১] ১১ই এপ্রিল বাংলাদেশের নিজস্ব বেতার কেন্দ্রের অভাবে শিলিগুড়ির এক অনিয়মিত বেতার কেন্দ্র থেকে তা প্রচার করা হয়।[২২] পরে তা 'আকাশবাণী'-র নিয়মিত কেন্দ্রসমূহ থেকে পুনঃপ্রচারিত হয়।

এর আগে দিল্লী থেকে কোলকাতা ফিরে তাজউদ্দিন ৮ই এপ্রিল ভবানীপুর এলাকার রাজেন্দ্র রোডের এক বাড়ীতে কামরুজ্জামানসহ উপস্হিত আওয়ামী ও যুব নেতৃবৃন্দকে দিল্লী বৈঠকের ফলাফল অবহিত করেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনাকালে কোন্ বিবেচনা থেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও সরকার গঠনকে অনিবর্তনীয় বিষয় হিসাবে উপস্হিত করেন তাও ব্যাখ্যা করেন। উপস্হিত নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যের ব্যাপারে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করার যৌক্তিকতা অথবা দিল্লী আলোচনার উপযোগিতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেননি। তাঁরা অধিকাংশই বিতর্ক তোলেন মুখ্যত তাজউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের বৈধতা নিয়ে।[২৩] যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি অবশ্য মন্ত্রিসভা গঠনেরই বিরোধিতা করেন এবং বাংলাদেশ স্বাধীন সরকার ও সামরিক কমান্ড গঠন- সংক্রান্ত তাজউদ্দিনের প্রস্তাবিত বেতার বক্তৃতা বন্ধ করার দাবী জানান।[২৪] পরে তিনি ৪২ জন উপস্হিত আওয়ামী লীগ ও যুব নেতার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তাজউদ্দিনের বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক আবেদন পাঠান।[২৫] তাজউদ্দিন কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠন এবং তাঁর প্রস্তাবিত বেতার ভাষণ রদ করার ক্ষেত্রে বরিশালের সাবেক পরিষদ- সদস্য চিত্ত সুতারকে এক উদ্যোগী ভূমিকায় অত্যন্ত তৎপর দেখা যায়। বস্তুত শেখ মণি গ্রুপের সমর্থনে তার তাৎপর্যময় ভূমিকা ১৯৭২ সালের প্রথম অবধি অব্যাহত থাকে।

শেখ মুজিবের অনুপস্হিতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কে বা কারা দেবেন এ বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত না থাকায় দলের মধ্যে নেতৃত্ব- কলহ ও বিশৃঙ্খলা একরূপ অবধারিত ছিল। তাজউদ্দিনের আশঙ্কা জন্মায়- মার্চের অসহযোগ আন্দোলন, ২৬শে মার্চ থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, বাঙালী সশস্ত্রবাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ এবং সম্মিলিত সিপাহী- জনতার প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে অবয়ব ফুটে উঠতে শুরু করেছে, আওয়ামী

লীগের নেতৃত্ব-কলহ ও বিশৃঙ্খলা তাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে; বিশেষত মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত আশ্বাস কার্যকর রূপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত অস্হায়ী সরকারের গঠনে কোন বড় পরিবর্তন শেখ মুজিব কর্তৃক সরকার গঠিত হওয়ার দাবী সম্পর্কেই সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে পারে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করতে পারে।[২৬] কাজেই রাজেন্দ্র রোডে সমবেত দলের রাজনৈতিক ও যুবনেতা এবং সাধারণ কর্মীদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাধীন সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তাজউদ্দিন অটল থাকেন।

৯ই এপ্রিল সকালে তাজউদ্দিন আমিরুল ইসলামকে সাথে নিয়ে এক পুরানো ডাকোটা প্লেনে করে প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার অবশিষ্ট সদস্যদের খুঁজতে বের হন। মালদহ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, রূপসা (ধুবড়ীর কাছে) ও শিলচর হয়ে, পথে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আবদুল মান্নান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সঙ্গে করে, তাজউদ্দিন আগরতলা পৌঁছান ১১ই এপ্রিল।[২৭] খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং কর্নেল ওসমানী আগরতলায় অপেক্ষা করেছিলেন। এদের মধ্যে দু'দিন ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক চলার পর অবশেষে তাজউদ্দিন কর্তৃক প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার গঠন ও আয়তন বহাল থাকে। অবশ্য এই মতৈক্যে পৌঁছুবার স্বার্থে মন্ত্রিসভার ক্ষমতার পরিসরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং তা ১৭ই এপ্রিলে ঘোষিত 'স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণায়' প্রতিফলিত হয়। 'স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার' প্রধান মূল প্রয়োজন দেখা দেয় নবগঠিত সরকারের আইনগত ভিত্তি বৈধকরণের জন্যই।[২৮] তাজউদ্দিনের ১১ই এপ্রিলের প্রথম বেতার বক্তৃতাকে বৈধ সরকার গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য 'স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণা'র তারিখ ১০ই এপ্রিল বলে ঘোষণা করা হয়।**

১৭ই এপ্রিলে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রচারিত এই 'স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণায়' শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির অথবা তাঁর অনুপস্হিতিতে অস্হায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয় এবং এই আদেশটি ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকারিতা লাভ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়। অস্হায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের হাতে আইন প্রণয়ন ও কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায়

প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য বিভিন্ন দাবীদার তাঁদের আকাঙ্ক্ষার লড়াই স্বল্পকালের জন্য মুলতবি রাখেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে এবং বিশেষত পরবর্তী নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্তের অভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বসঙ্কট যেখানে একরূপ অবধারিত ছিল, সেখানে মন্ত্রিসভার গঠন নিঃসন্দেহে ছিল এক বিরাট রাজনৈতিক অগ্রগতি।

নতুন মন্ত্রিসভা আগরতলা থেকে কোলকাতা আসার পর অন্যতম মুখ্য প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় নতুন সরকারকে এমনভাবে বহির্বিশ্বের কাছে উপস্থিত করা যাতে এর পক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ১৫ই এপ্রিল তাজউদ্দিন গোপনে দেখা করেন কোলকাতায় নিযুক্ত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী সঙ্গে। হোসেন আলী এবং ডেপুটি হাইকমিশনে নিযুক্ত সকল বাঙালী যাতে ১৮ই এপ্রিল একযোগে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করে, তার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয় দু'দফা বৈঠকে।[২৯] ১৭ই এপ্রিল বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সম্মুখে নবগঠিত মন্ত্রিসভার প্রকাশ্য শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বাংলাদেশের দ্রুত সঙ্কুচিত মুক্তাঞ্চলের এক প্রান্তে- কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার সীমান্তবর্তী গ্রাম বৈদনাথতলায়, যার নতুন নামকরণ হয় 'মুজিবনগর'। কিন্তু আসন্ন পাকিস্তানী আক্রমণের আশঙ্কায় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পর পরই বৈদ্যনাথতলা পরিত্যক্ত হয় এবং 'মুজিবনগর' রাজধানী প্রতিষ্ঠার এক বিমূর্ত বাসনা হিসাবে বিরাজ করতে থাকে। বাংলার সশস্ত্র বিদ্রোহ তখন সর্বত্র স্তিমিত। পাকিস্তানী বাহিনীর দ্রুত অভিযানের মুখে সমগ্র বাংলাদেশের পতন প্রায় সম্পন্ন হওয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি লাভের আশা অনিশ্চিতকালের জন্য পিছিয়ে যায়। তিন সপ্তাহের অধিককাল ধরে পাকিস্তানের হত্যাতাণ্ডব, অগ্নিসংযোগ ও বর্বরতার মুখে বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ যখন বিপর্যস্ত, এমনি সময় বিলম্ব সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বিঘোষিত স্বাধীনতা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অধ্যায় - ৪: মে - জুন

২৫শে মার্চ থেকে ৭ই এপ্রিলের মধ্যে নতুন দুই ডিভিশন সৈন্য - ৯ম এবং ১৬শ - আকাশপথে নিয়ে আসার পর এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ পূর্ব বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলে পাকিস্তান নিজের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ২৬শে মার্চ থেকে প্রথম এক সপ্তাহে পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে যারা ভারতে প্রবেশ করে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার- মূখ্যত আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও বিদ্রোহী সশস্ত্রবাহিনীর লোকজন। ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষের অনধিক। পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণ সুদূর মফস্বল অবধি বিস্তৃত হওয়ায় এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে আশ্রয় নেয় এগারো লক্ষ বিপন্ন মানুষ। মে মাসে আশ্রয় নেয় আরও একত্রিশ লক্ষ মানুষ।[৩০] এপ্রিলের শেষ দিকেই শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান স্রোত ভারতের সরকারী মহলে অপরিসীম উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে পাকিস্তানী শাসকেরা ভারতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রথম দিকে কিছুটা অনিশ্চিত বোধ করলেও অচিরেই বুঝতে পারে যে, পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্যক অপ্রস্তুতি এবং সংখ্যাল্পতার জন্য ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সামরিক ব্যবস্হা গ্রহণে সক্ষম নয়। ভারত যদি পূর্বাঞ্চলে প্রকাশ্য সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়, তবে সেই সংঘর্ষ সীমিত ও অমীমাংসিত হওয়া একরূপ অবধারিত। উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে, কারণ কিছুটা আলাদা হলেও, সংঘর্ষের ফলাফল হত প্রায় অভিন্ন। এই পরিস্হিতিতে, ১৯৬৫ সালের মত, আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়া এবং 'পূর্ব পাকিস্তানের' পূর্বতন স্হিতাবস্হা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। অন্যদিকে এই অমীমাংসিত পাক-ভারত যুদ্ধের ডামাডোলে স্বাধিকারের জন্য পূর্ব বাংলার দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, '৭০-এর নির্বাচনের ঐতিহাসিক রায়, অন্যায় ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে আইন পরিষদের অধিবেশন স্হগিতকরণ, অসহযোগ আন্দোলন, সামরিক শাসকদের বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ, গণহত্যা, বাঙালী সেনাদের বিদ্রোহ, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার ঘোষণা এই সব কিছুই অন্তত বেশ কিছু কালের জন্য চাপা পড়ত।

অনুরূপ বিবেচনা থেকেই সঙ্কটের একদম গোড়ার দিকে বাংলাদেশের গৃহযুদ্ধে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের এক প্রস্তাব দিল্লীর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকমহল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়।[৩১] প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্ভবত তাজউদ্দিনই প্রথম উপলব্ধি করেন, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে, যদি এই পর্যায়েই পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে

কোন যুদ্ধ শুরু হয়, তবে তার ফলে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। অবশ্য এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার সময় তিনি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।[৩২] পরে পরিস্হিতির জটিলতা অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে তিনি যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করেন।

তাজউদ্দিন দেখতে পান, অমীমাংসিত পাক-ভারত যুদ্ধ এবং সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নই কেবল বেশ কিছুকালের জন্য চাপা পড়বে তা নয়, অধিকন্তু বিশ্ববাসীর কাছে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম নিছক 'ভারতীয় চক্রান্তের অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। তা ছাড়া বিঘোষিত স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে হলেও বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন-তার আগে কোন হঠকারিতা নয়। জাতীয় প্রস্তুতির এই অন্তর্বর্তীকালে ভারতের স্বীকৃতির প্রশ্নকে তাজউদ্দিন কেবল দাবী হিসাবে জীবিত রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন-উপযুক্ত সুযোগ ও সময়ের প্রতীক্ষায়। তাজউদ্দিনের এই উপলব্ধি অবশ্য তাঁর অধিকাংশ সহকর্মীর কাছে গৃহীত হয়নি-যাঁদের দাবীই ছিল ভারতের তৎদণ্ডেই কূটনৈতিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা।

সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে ভারত যে সেই সময় কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে অক্ষম, এই উপলব্ধির ভিত্তিতে পাকিস্তানী শাসকেরা ভারতের সকল প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী উপেক্ষা করে দেশের আনাচে কানাচে 'পরিষ্করণ অভিযান'(clearing operation) চালিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে চলে। নিধন ও নির্যাতনের পাশাপাশি বাঙালী জাতীয়তাবাদ সমর্থক সকল মানুষ এবং ব্যাপকতম অর্থে সংখ্যালঘু হিন্দুদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে বাংলাদেশ সমস্যার 'চূড়ান্ত সমাধানে' নিযুক্ত হতে তাদের দেখা যায়।[৩৩]

কিন্তু ব্যাপক সংখ্যায় শরণার্থী সৃষ্টিই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলির উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।[৩৪] ক্রমশ এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের জন্য উদ্বেগজনক

হয়ে ওঠে। শরণার্থীদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র ও হিন্দু মহাসভার মত ভারতের দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক দলগুলিও বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যথোচিত 'বলিষ্ঠতা' প্রদর্শনের দাবীতে ততবেশি সোচ্চার হতে থাকে। কাজেই যথাশীঘ্র সকল শরণার্থীকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠাতে না পারলে গোটা পরিস্থিতি যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের জন্য এক মারাত্মক রাজনৈতিক ফাঁদে পরিণত হতে পারে, সে ইঙ্গিত তখন মোটামুটি স্পষ্ট। সম্ভবত এক অমীমাংসিত যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কংগ্রেস সরকারকে রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করা ছিল এই সব চরম দক্ষিণপন্থী ভারতীয় দলগুলির বাংলাদেশ প্রীতির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে পাকিস্তানের উপর প্রভাব আছে এমন সব রাষ্ট্রের চাপে বা সৎপরামর্শে পাকিস্তান যে সামরিক নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে রাজনৈতিক সমাধানের পথ ধরবে, এমন আশা বজায় রাখাও ভারতের জন্য ক্রমশ কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। সরকারী পর্যায়ে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের জোরাল নিন্দা ও প্রতিবাদ ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের অথবা গোপন সমর্থকের। অবশ্য চীনের ভূমিকা ছিল প্রকাশ্য এবং মূলত তা পাকিস্তানের শাসকদেরই পক্ষে।

এহেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অন্তহীন শরণার্থীর স্রোত ভারতের জন্য সৃষ্টি করে এক কঠিন বাধ্য- বাধ্যকতা। শরণার্থীসৃষ্ট এই বাধ্যবাধকতার ফলে বাংলাদেশের বিপর্যস্ত মুক্তিবাহিনীকে নতুন ভিত্তিতে এবং বর্ধিত কলেবরে গড়ে তোলার অসামান্য সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সঙ্কটের উপযুক্ত সমাধান অন্বেষণকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ সংগ্রাম যাতে সম্পূর্ণভাবে না থেমে যায়, এ মর্মে ন্যূনতম ব্যবস্থা হিসাবে ছাত্র- যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দানের প্রয়োজন ভারতের কর্তৃপক্ষমহলে স্বীকৃত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ৩০শে এপ্রিল। ৯ই মে তাদের হাতে ন্যস্ত হয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু বাংলাদেশের তরুণদের সশস্ত্র ট্রেনিংদানের দায়িত্ব। এপ্রিল মাসে ভারতের 'সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী' (বিএসএফ) বিক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে অল্প স্বল্প সাহায্য করে চলেছিল তার উন্নতি ঘটে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত চার সপ্তাহ মেয়াদী এই ট্রেনিং কার্যক্রমের মান অবশ্য ছিল নেহাতই সাধারণ- মূলত শেখানো

হত সাধারণ হাল্কা-অস্ত্র ও বিস্ফোরকের ব্যবহার। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় দু'হাজার ছাত্র ও যুবকের প্রথম দলের ট্রেনিং।

অন্য অর্থে মে ছিল নিদারুণ হতাশার মাস। পাকিস্তানী বাহিনীর নির্মম অভিযানের মুখে মার্চ-এপ্রিলের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম ক্রমশ থেমে যাওয়ায় দেশের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই নিরুৎসাহের ভাব। মধুপুর, গোপালগঞ্জ এবং আরও দু'একটা ছোটখাট অঞ্চল বাদে গোটা বাংলাদেশ পাকিস্তানী সেনাদের করতলগত। দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্রই সামরিক সন্ত্রাস। তাদের সহযোগী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের উদ্যোগে গঠিত 'শান্তি কমিটির' তৎপরতার ফলে স্বাধীনতা-সমর্থক সবার পক্ষেই নিরাপদে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। যে সব বিদ্রোহী সেনা পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে স্বজন-পরিজন ফেলে ভারতে এসেছিল অস্ত্রশস্ত্রের আশায়, তারাও প্রত্যাশিত পাল্টা-অভিযান শুরু করতে পারলো না বাস্তব নানা অসুবিধার ফলে। গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র যা পাওয়া গেল তা প্রয়োজন ও প্রত্যাশার তুলনায় নিত্যন্ত কম। তদুপরি দেশের ভিতর থেকে দখলদার সেনাবাহিনীর ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধির সংবাদে মনোবল বজায় রাখা ছিল সত্যই কঠিন। তবু মে-জুনের এই হতাশার আবহাওয়ার মাঝেই ট্রেনিং কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত প্রস্তুতি।

তরুণদের ট্রেনিং দেওয়যার ব্যাপারে অবশ্য ভারতীয় প্রশাসনের সকল অংশের সমান উৎসাহ ছিল না। যেমন ট্রেনিং প্রদান এবং বিশেষত 'এই সব বিদ্রোহী ও বামপন্থীদের' হাতে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের আপত্তি প্রথম দিকে ছিল অতিশয় প্রবল।[৩৫] এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, নক্সালবাদী, নাগা, মিজো প্রভৃতি সশস্ত্র বিদ্রোহীদের তৎপরতা-হেতু পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা সম্পর্কে এদের উদ্বেগ। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত অস্ত্র এই সব সন্ত্রাসবাদী বা বিদ্রোহীদের হাতে যে পৌঁছবে না, এ নিশ্চয়তাবোধ গড়ে তুলতে বেশ কিছু সময় লাগে। মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং-এর ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে এই নিশ্চয়তাবোধ ক্রমে গড়ে ওঠে।প্রথম দিকে রিক্রুটিং সীমাবদ্ধ ছিল কেবল আওয়ামী লীগ দলীয় যুবকদের মধ্যে। পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যবস্হা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীরও মনঃপূত। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে আগ্রহীদের বিরাট সংখ্যার অনুপাতে ট্রেনিং-এর সুযোগ ছিল নিতান্ত কম। ট্রেনিং-এর আগে পর্যন্ত তরুণদের একত্রিত রাখা এবং

তাদের মনোবল ও দৈহিক সুস্হতা বজায় রাখার জন্য সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় 'যুব শিবির' ও 'অভ্যর্থনা শিবির' স্হাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সব শিবিরে ভর্তি করার জন্য যে স্ক্রীনিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তদনুযায়ী 'বহির্দেশীয় আনুগত্য' (Extra Territorial Loyalty) থেকে যারা মুক্ত, কেবল সে সব তরুণরাই আওয়ামী পরিষদ সদস্যদের দ্বারা সনাক্তকৃত হবার পর ভর্তির অনুমতি পেত।[৩৬] পাকিস্তানী রাজনৈতিক পুলিশের এই বহুল ব্যবহৃত শব্দ ধার করে এমন ব্যবস্হা খাড়া করা হয় যাতে এই সব শিবিরে বামপন্থী কর্মীদের প্রবেশের কোন সুযোগ না ঘটে।

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের নিজস্ব ব্যবস্হাপনা ছাড়াও, প্রত্যেক যুব শিবিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদমর্যাদাবিশিষ্ট একজন 'ক্যাম্প প্রশাসক' নিযুক্ত থাকার ব্যবস্হা ছিল।[৩৭] সম্ভবত এই 'ক্যাম্প প্রশাসকের' উপস্হিতির ফলে ট্রেনিং- এর জন্য বাছাই করা তরুণদের রাজনৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের মানসিক দুশ্চিন্তা বহুলাংশে হ্রাস পেত। অবশ্য পরে, আগস্ট- সেপ্টেম্বর মাসে, সামগ্রিক সমস্যার চাপে ভারত সরকারের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যখন দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব হ্রাস পায় এবং বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার মধ্যে তাজউদ্দিনের অবস্হান অপেক্ষাকৃত সবল হয়, তখন বাংলাদেশের বামপন্থী তরুণদের বিরুদ্ধে এই বিধি- নিষেধ বহুলাংশে অপসারণ করা হয়। জন- সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগের তুলনামূলক বিরাটত্বের দরুন মুক্তিবাহিনীতেও আওয়ামী লীগপন্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় এবং দলীয় পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে রিক্রুটিং করা হয়, তা কেবল অনাবশ্যকই ছিল না, অধিকন্তু তা দুই ধরনের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

প্রথমত, মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং- এর ব্যাপারে পরিষদ সদস্যদের সুপারিশ করার যে বিধান ছিল, অনেক ক্ষেত্রে সেই সুপারিশের অপব্যবহার ঘটতে দেখা গেছে। এঁদের অনেকে স্হানীয় রাজনীতির সুবিধার্থে অধিক সংখ্যায় কেবল নিজ নিজ এলাকার তরুণদের মুক্তিবাহিনীতে ঢোকাবার প্রবণতা দেখাতেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীর দৈহিক যোগ্যতা, সংগ্রামী স্পৃহা এবং চারিত্রিক গুণাগুণ শিথিলভাবে বিচার করা হয়েছে। অংশত এর ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহত্তর অংশ পরবর্তীকালে লড়াই থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে থাকে, এমনকি কোন

কোন ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ অপেক্ষা গ্রামীণ বিবাগ ও ব্যক্তিগত রেষারেষির নিষ্পত্তিতে, এমনকি সরাসরি লুটতরাজে অংশগ্রহণ করে।[৩৮]

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানেচ্ছু অপর নানা দল ও মতের ছাত্র-যুবকদের জন্য রিক্রুটিং-এর ব্যাপারে আওয়ামী লীগের একাধিপত্য ছিল প্রবল ক্ষোভ ও হতাশার কারণ। দেশের ভিতরে পাকিস্তানী নির্যাতন যতই গ্রাম-গ্রামান্তরে বিশেষভাবে তরুণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে, ততই প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্র-যুবক ট্রেনিং লাভের আশায় ভারতে এসে ভিড় করেছে, মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে সাধারণ শরণার্থী শিবিরে অথবা সরকার অননুমোদিত ক্যাম্পের অবর্ণনীয় দুর্দশার পরিবেশে। মার্চ-এপ্রিলে পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞের মুখে বিভিন্ন দল, মত ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য গড়ে উঠেছিল। মুক্তিযোদ্ধা মনোনয়ন ও ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে প্রদর্শিত বৈষম্য তরুণদের সেই একতাবোধকে বহুলাংশে বিনষ্ট করে। সেপ্টেম্বরে রিক্রুটিং-এর ক্ষেত্রে দলীয় বৈষম্যের নীতি অনেকখানি হ্রাস পেলেও মুক্তিযোদ্ধাদের পর্যায়ে অবিশ্বাস, রেষারেষি ও দ্বন্দ্বের জের মূলত চলতেই থাকে।

ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ দলীয় একাধিপত্যের নীতি প্রথম থেকেই ছিল তাজউদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত রাজনৈতিক পরিকল্পনার পরিপন্থী। ১০ই এপ্রিলের বেতার বক্তৃতায় তাজউদ্দিন 'আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য বিশেষভাবে সকল রাজনৈতিক দলের নেতাকে আমন্ত্রণ' জানান। তাজউদ্দিনের ইচ্ছা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের সমবায়ে মন্ত্রিসভা গঠনের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সরকারকে সমর্থনদানকারী সব ক'টি রাজনৈতিক দলের সমবায়ে একটি মোর্চা বা ফ্রন্ট গঠন করা এবং দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয়ের দায়িত্ব এই ফ্রন্টের হাতে অর্পণ করা।

পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী দুই দশকের পুরাতন এবং এই দাবীর জনপ্রিয়তা ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬-দফা দাবীর পক্ষে ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনী রায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সাধারণ জনমতকে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বল্প দিনের। মূলত নিরস্ত্র

মানুষের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর আকস্মিক হামলা, নির্বিচার হত্যা ও তুলনাহীন বর্বরতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্বাধীনতার দাবী রাতারাতি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতা দাবীর অন্তর্নিহিত এই নেতিবাচক ও তাৎক্ষণিক উপাদান সম্পর্কে তাজউদ্দিন সজাগ ছিলেন। এ কারণেই তিনি এই ঘটনা তাড়িত স্বাধীনতার দাবীকে ইতিবাচক ও স্হিতিশীল চেতনায় পরিণত করার জন্য আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য দল ও মতের মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। মে মাসে প্রতিরোধ সংগ্রামের বিপর্যয়ের পর যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলাদেশে পাকিস্তানী আধিপত্য সহজে বা শীঘ্রই শেষ হবার নয়, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে আওয়ামী লীগ, মোজাফ্‌ফর আহমদ পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, মণি সিংহ-এর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ কংগ্রেস দল এবং সম্ভব হলে ভাসানীপন্হী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্টে একত্রিত করার বিষয়ে চিন্তা করেন। এই ফ্রন্ট গঠনের চিন্তা ছিল আওয়ামী লীগ কর্তৃক গঠিত সরকারের কোন পরিবর্তন বা তাঁদের ক্ষমতা ও অধিকারের পরিসরকে সঙ্কুচিত না করেই।

কিন্তু আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী ছিলেন এরূপ বহুদলীয় ফ্রন্ট গঠনের বিরুদ্ধে। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ দলীয় সাফল্যের পর স্বভাবতই আওয়ামী লীগের সর্বস্তরে দলীয় শক্তিমত্তা সম্পর্কে প্রবল আস্হা সৃষ্টি হয়। তাদের সেই আস্হাবোধ পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণ এবং নিজেদের সম্যক পশ্চাদপসরণের পরেও অক্ষুন্ন থাকে। ২৬শে মার্চের পর দেশে যে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্হিতির উদ্ভব ঘটে, তার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং সেই পরিস্হিতি মোকাবিলার জন্য নিরেট দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন আওয়ামী লীগের খুব অল্প সংখ্যক নেতার কাছেই স্পষ্ট ছিল। যাঁদের ছিল তাঁরা সম্মিলিতভাবেও দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাজউদ্দিন যে পারতেন না সে কথা তাঁর নিজেরও জানা ছিল। ইতিপূর্বে দলের নীতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যদিও তাঁর স্হান ছিল সুউচ্চে, তবু দলের কাছে সেই নীতিকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যাপারে তাঁর নিজের ভূমিকা ছিল সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হত পরিকল্পিত নীতি সম্পর্কে শেখ মুজিবের সম্মতি আদায় করেই। শেখ মুজিবের দায়িত্ব ছিল প্রস্তাবিত নীতি সম্পর্কে দলের এবং দেশবাসীর সম্মতি আদায় করার। সেই জনপ্রিয় নেতার অনুপস্হিতিতে বহুদলীয় ফ্রন্ট গঠনের মত এক ঘোরতর অপ্রিয় প্রস্তাব সেই পর্যায়েই

পার্টির কাছে উত্থাপন করা তাজউদ্দিনের জন্য অন্তত দুরূহ ছিল। কাজেই সেই পর্যায়ে বহুদলীয় ফ্রন্ট গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতি অতিশয় ধৈর্যের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

মে মাসে এমনিতেই প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগ মহলে তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা শুরু হয়েছে। মন্ত্রিসভার অবশিষ্ট তিনজন সদস্যই প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ নিয়ে স্ব স্ব দাবীর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় কমবেশী তৎপর। মন্ত্রিসভার বাইরেও তাজউদ্দিন বিরোধী প্রচারণার উৎসমুখ একাধিক। শেখ মুজিবের গ্রেফতার হওয়ার কারণ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানে ভারত সরকারের বিলম্ব পর্যন্ত অনেক কিছুর জন্যই সরাসরি তাজউদ্দিনকে দায়ী করে এক প্রবল প্রচার- আন্দোলন চলতে থাকে আওয়ামী যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বে। প্রবীণ নেতাদের কেউ কেউ 'স্বাধীনতা ঘোষণা আদেশ' অনুযায়ী অস্হায়ী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করে তাজউদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়, তা অন্বেষণে ব্যস্ত। কোলকাতায় অনেক আওয়ামী লীগ নেতারই গড়ে উঠেছে ছোটখাট দফতর, উপদলীয় গ্রুপ, প্রভাব- প্রতিপত্তি, গাড়ী, অর্থ এবং প্রচারযন্ত্র। সবাই যে যার মত 'মুক্তিযুদ্ধে' ব্যস্ত। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখা যেত দুটি জিনিসের অভাব - দলীয় শৃঙ্খলাবোধ এবং নতুন সরকারের প্রতি প্রয়োজনীয় আনুগত্যের।

এই শৃঙ্খলাহীন পরিবেশে তাজউদ্দিন অনন্য নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারের নির্দলীয় প্রশাসন বিভাগ ও সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব আত্মকলহ ও উপদলীয় বিশৃঙ্খলতায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হওয়ার আগেই নতুন প্রশাসনের কর্মনিষ্ঠার ফলে সরকারের কাজকর্মে কিছু পরিমাণ সংগঠিত চিন্তা, সুস্হ কর্মপদ্ধতি ও শৃঙ্খলাবোধ প্রবর্তিত হয়। যে সব তরুণ সিএসপি ও অন্যান্য অফিসার প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতে চলে আসেন, তাঁদের নিয়োগ করার ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যেরই উৎসাহ ছিল বাহ্যত সমান। কিন্তু প্রশাসন বিভাগে 'অফিসার প্রাধান্য প্রতিরোধ' করার জন্য আমলাদের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের নিয়োগ করার দাবী মাঝে মাঝে যখন প্রবল হয়ে উঠত, তখন সেই সব দাবী নিবৃত্ত করার দায়দায়িত্ব নিতে হত মূলত তাজউদ্দিনকেই। ফলে দোষারোপের দায়ভার বেশীর ভাগই ছিল তাঁর একার। ২রা জুন নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের সমবায়ে সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় পাঁচটি আঞ্চলিক প্রশাসন কাউন্সিল

গঠন করার পর ক্রমে ক্রমে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের অপেক্ষাকৃত গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করার সুযোগ গড়ে ওঠে।[৩৯] জুলাই- এর শেষ দিকে এই আঞ্চলিক কাউন্সিল ব্যবস্হা আরও কিছু সংহত রূপ লাভ করে।[৪০]

প্রশাসন বিভাগের পাশাপাশি দলীয় প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাঁচটি ক্ষয়িত ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে ইপিআর বাহিনীর লোকজনদের একত্রিত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (জুলাই থেকে 'নিয়মিত বাহিনী' নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার প্রধান সেনাপতি কর্নেল (অবঃ) ওসমানী ছিলেন সামরিক ব্যাপারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরোধী। যদিও মুক্তিযুদ্ধ মূলতই রাজনৈতিক যুদ্ধ, তবুও ওসমানী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই সেনাবাহিনী সংগঠন ও পরিচালনার পূর্ণ সুযোগ পান। প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দিনের দৃঢ় সমর্থন ব্যতিরেকে বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার এবং রাজনৈতিক মহল উভয় দিকের বিরোধিতার ফলে ওসমানী সম্ভবত অসমর্থ হয়ে পড়তেন। নিয়মিত বাহিনী ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে অনিয়মিত লড়াই চালাবার জন্য যে মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রস্তুতি চলছিল তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার বিষয়টি অবশ্য তখনও বেশ অনির্দিষ্ট রয়ে যায়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামো সংগঠিত করার পাশাপাশি সর্বাধিক সংখ্যক সশস্ত্র স্বেচ্ছা- সংগ্রামীকে দেশের ভিতরে পাঠানোকেই তাজউদ্দিন সব চাইতে বড় কাজ হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই অনিয়মিত লড়াইয়ের জন্য সারা দেশে দু'তিনটি এলাকা বাদে না ছিল কোন নিরাপদ গোপন ঘাঁটি, না ছিল ন্যূনতম রাজনৈতিক সংগঠন। স্বাধীনতা সমর্থক রাজনৈতিক কর্মীরা সকলেই প্রায় দেশের বাইরে। রাজনৈতিক অবকাঠামোর অভাবে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধ সম্ভব নয়। এই অবস্হায় সুসংগঠিত গেরিলা যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার পরিবর্তে কমান্ডো ধরনের অনিয়মিত আক্রমণে শত্রুপক্ষের কিছু ক্ষয়ক্ষতি সাধনই কেবল সম্ভব ছিল। অথচ বাংলাদেশের নিজস্ব শক্তিতে স্বাধীনতাযুদ্ধ সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের।

অধ্যায় - ৫: মে - জুন

মে মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং- এর জন্য ভারত সরকার নিজস্ব সেনাবাহিনী নিযুক্ত করেন। এ ছাড়াও ভারত সরকার ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের’ জন্য একটি ট্রান্সমিটার বরাদ্দ করে বাংলাদেশ সরকারের আর একটি অনুরোধ পূরণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন বলার উপায় নেই যে, ভারত সরকারের নীতি তখনও বিভিন্নমুখী বিচার-বিবেচনা, পরস্পরবিরোধী স্বার্থের টানাপোড়েন এবং অস্পষ্টতা কাটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সহায়তায় প্রযুক্ত হয়েছে। বস্তুত ভারতীয় সীমান্ত উন্মুক্ত হবার পর, পাকিস্তান যে হারে সাধারণ মানুষকে ভিটে- মাটি থেকে উচ্ছেদ করে ভারত অভিমুখে পাঠাতে শুরু করে, তাতে অচিরেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করেন, বাংলাদেশ আন্দোলনকে সাহায্য করার সামরিক ঝুঁকি প্রায় সীমাহীন। কাজেই মে ও জুনে ভারতীয় নীতিনির্ধারকগণ ঝুঁকি ও লাভের নিরুত্তপ্ত হিসাব- নিকাশ এবং আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যের চুলচেরা বিশেষণে ব্যাপৃত হন। এই সব বিচার-বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে ভারতের উচ্চতর ক্ষমতার কেন্দ্রে মতপার্থক্য ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিশেষত তাদের মধ্যে বাম ও দক্ষিণের টানাপোড়েন ঘটতে থাকে।[৪১] তার ফলে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত সরকারের প্রকৃত ভূমিকা বাংলাদেশ নেতৃত্বের অধিকাংশের জন্য দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

একদিকে পাকিস্তানী হামলার মুখে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ সংগ্রামের অধোগতি এবং অপরদিকে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান উপদলীয় কলহের ফলে ভারতের নীতিনির্ধারকগণ ক্রমশ সন্দিহান হয়ে পড়েন যে এই প্রবাসী নেতৃত্ব দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় আদৌ সক্ষম কিনা।[৪২] এই অবস্হায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া তথা পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মত ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের দ্বিধা- দ্বন্দ্ব মোটামুটি বোধগম্য - বিশেষত সামরিক দিক থেকে যখন তারা অপ্রস্তুত। সামরিক প্রস্তুতি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সম্ভাব্য পাক- ভারত যুদ্ধে চীনের যোগদানের সম্ভাবনা উপস্হিত বলে বিবেচিত হওয়ায় এই প্রস্তুতির পরিসর ছিল আরও বিস্তৃত ও জটিল। তা ছাড়া কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। শরণার্থী সম্পর্কে বিস্তর সহানুভূতি, উদ্বেগ ও নিন্দা জ্ঞাপন সত্ত্বেও সমগ্র ঘটনা তখনও তাদের চোখে মূলতই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

বিশ্বজনমত আরও জোরদার হলে এবং পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকেরা বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাপ প্রয়োগ করলে ইয়াহিয়া-জান্তা শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ঘটাতে বাধ্য হবে এমন আশাবাদ তখনও বিভিন্ন মহলে বিদ্যমান। ভারতীয় নীতি- নির্ধারকমহলের দক্ষিণপন্থী অংশ মোটামুটিভাবে এই মার্কিন সদিচ্ছা উদ্রেক করার পক্ষে তাদের সরকারী শক্তিকে নিয়োগ করার পক্ষপাতী।[৪৩] পক্ষান্তরে তাদের কেন্দ্রের বাম হিসাবে পরিচিত অংশটি- ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি. এন. হাকসার এদের অন্যতম - যে সব যুক্তির সমাবেশ ঘটান তার ফলে স্হির হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং- এ সহায়তা করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ও গোলযোগ অব্যাহত রাখা এবং অধিক কার্যকর নীতির অন্বেষায় অপেক্ষা করা আপাতত অধিক যুক্তিযুক্ত।[৪৪] মে মাসে সীমিত সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং ও অস্ত্র প্রদানের জন্য ভারত সরকারের সম্মতি এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য ট্রান্সমিটার ব্যবহারের অনুমতি উপরোক্ত পরিস্হিতির আলোকেই বিচার্য। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সব সাহায্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ পাকিস্তানী শাসকবর্গের সহ্যশক্তির মাত্রাকে অতিক্রম না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বৃহত্তর যুদ্ধের ঝুঁকি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। বস্তুত পাকিস্তান যেখানে এক দশক ধরে নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের আশ্রয় দান থেকে শুরু করে ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে এসেছে, সেখানে ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের অনুরূপ সহায়তা প্রদান না ছিল কোন দৃষ্টান্তবর্জিত কাজ, না ছিল বৃহত্তর যুদ্ধের নিশ্চিত প্ররোচনা এবং সর্বোপরি, না ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে কোন চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সীমিতভাবে সাহায্য করা এবং প্রতীক্ষা করাই ছিল এই অন্তর্বর্তীকালে ভারতের ভূমিকা।[৪৫] তবে ভারতের ক্ষমতার কেন্দ্রে সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিলেন উদ্ভূত সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধানের' স্বপক্ষে, অন্তত জুলাই-এর মাঝামাঝি অবধি সাগ্রহে তাঁরা অপেক্ষমাণ ছিলেন মার্কিন প্রভাবের যাদুদণ্ডে যদি উদ্ভূত সঙ্কটের অবসান ঘটে।

কিন্তু সকলের অজ্ঞাতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন চীনের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনার কাজে জেনারেল ইয়াহিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ সোপান হিসাবে ব্যবহার করায়, অন্য সকল কারণ বাদেও ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে কোন গুরুতর মার্কিনী চাপ প্রয়োগের সম্ভাবনা ছিল না। ইয়াহিয়ার পক্ষেও শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগের সাথে পুনরায় আলাপ করার পথ ছিল বন্ধ। ২৬শে মার্চ শেখ মুজিবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' এবং

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে ইয়াহিয়ার নিজের হাতেই এই পথ বন্ধ হয়। ফলে মে মাসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিজেদের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরেও পাকিস্তানী শাসকেরা সম্ভাব্য রাজনৈতিক সুযোগ সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হয়। মার্চ- এপ্রিলে লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহারের পর এইরূপ রাজনৈতিক মীমাংসার অবকাশ কতটুকু ছিল তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। মীমাংসার সুযোগ যত সামান্যই থাকুক, রাজনৈতিক উদ্যোগের সম্যক অভাবে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকে, কতকটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই।

এদিকে বাংলাদেশ প্রশ্নে মে- জুন মাসে ভারতের নাজুক ভূমিকা বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা এবং আওয়ামী লীগের নেতৃমহলে বেশ কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এপ্রিলে ও মে মাসের শুরুতে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সদস্য পৃথক পৃথকভাবে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্ভবত দিল্লীর অজ্ঞাত ছিল না। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অস্হায়ী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীসহ সমগ্র মন্ত্রিসভা দিল্লীতে আমন্ত্রিত হন এবং ইন্দিরা গান্ধী সবার সঙ্গে একত্রে মিলিত হন। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা স্বভাবতই ভারতীয় নীতির অস্পষ্টতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তোলেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানে বিলম্ব করায় তাঁদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পি. এন. হাকসার ভারতের অসুবিধার কথা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে আমন্ত্রিতদের কাছে জানতে চান, এই স্বীকৃতি না দেওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ভারতের ভূখণ্ড থেকে অবাধে কাজ করার তথা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন বাস্তব অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে কিনা। পরে সম্ভবত ধৈর্যের মাত্রা আরও হ্রাস পেলে হাকসার বলেন, ভারতের স্বীকৃতি লাভের জন্য তাঁদের পীড়াপীড়ির অন্তরির্নহিত আকাঙ্ক্ষা যদি এই হয় যে ভারতের সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হতে হবে, তবে তা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত হওয়া বিধেয়।[৪৬] এই সব কথাবার্তা অধিকাংশ আমন্ত্রিতদের কেবল নৈরাশ্য ও ক্ষোভ বৃদ্ধিতেই সহায়ক হয়।[৪৭]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী যদিও তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনর্বার জ্ঞাপন করেন, তবুও বৈঠকে আমন্ত্রিত অধিকাংশ সদস্য এই ধারণা নিয়ে ফিরে আসেন যে ভারত বাংলাদেশ সরকারকে শীঘ্র স্বীকৃতি দানে অনিচ্ছুক, ভবিষ্যতে কবে এই স্বীকৃতি দেওয়া হবে তাও অনিশ্চিত। কিন্তু ভারত কেন অনিচ্ছুক, তা উপলব্ধির প্রচেষ্টা তাদের

কতদূর ছিল বলা শক্ত। একদিকে মন্ত্রিসভার একাংশের এই সন্দেহ এবং অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রদানে বিলম্ব ও গড়িমসির ফলে ক্রমেই এই ধারণা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে যে, ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক, ভারতের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য উভয়ই সন্দেহজনক; সম্ভবত ভাগ্যাহত দালাইলামা ও তিব্বতী শরণার্থীদের পরিণতিই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে।

তাজউদ্দিন স্বীকৃতির ব্যাপারে ভারতের এই বিলম্বকে অযৌক্তিক বোধ করেননি।[৪৮] ভারতে আশ্রয় গ্রহণের পর কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারত সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে তাঁর যে সব যোগাযোগ ও আদানপ্রদান ঘটে, তা থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী আধিপত্য বিলুপ্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ ও ভারতের এক ধরনের স্বার্থের পারস্পরিকতা তিনি লক্ষ্য করেন। একদিকে বাংলাদেশ নেতৃত্বের পক্ষে দেশের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানের নগ্ন সামরিক দখলকে বিলোপ করা যেমন অপরিহার্য ছিল, তেমনি অন্যদিকে ভারতের নেতৃত্বের অন্তত একাংশের কাম্য ছিল তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূসামরিক ক্ষমতা খর্বিত করে পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা। এই পারস্পরিক স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয় শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান ভিড়ে - একদিকে যেমন ছিল বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের পূর্ণ নিরাপত্তাসহ দেশে ফেরার ঐকান্তিকতা, অন্যদিকে তেমনি ছিল শরণার্থীদের যথাশীঘ্র ফেরৎ পাঠিয়ে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতের ব্যগ্রতা। স্বার্থের এই পারস্পরিকতার দরুন বাংলাদেশের মুক্তি সম্পর্কে উভয় তরফের আগ্রহ বা ইচ্ছা নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্ন ছিল কেবল বাস্তব সামর্থ্যের ব্যাপারে এবং তা ছিল উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বাস্তব সামর্থ্য সম্পর্কে ভারতের যেমন প্রভূত সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্যের পটভূমিতে যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করার ব্যাপারে ভারতের সামর্থ্য রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশ মহলেও।

আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ভারতের তুলনামূলক দুর্বলতা ও একাকিত্ব এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে এর সঠিক তাৎপর্য অন্বেষণই ১২ই ও ১৩ই মে কোলকাতায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ও আমার মধ্যকার প্রথম বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এপ্রিল মাসে ঢাকায় কিছু রাজনীতি- সচেতন ব্যক্তির সহযোগে এক গোপন প্রতিরোধ সংগঠন গড়ে তোলার এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে মতবিনিময়ের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং তদনুসারে 'মুজিবনগরের' উদ্দেশে স্বল্পকালের জন্য আমি ঢাকা ত্যাগ করি। ঢাকা টেলিভিশনের তদানীন্তন মহা- ব্যবস্থাপক জামিল চৌধুরী আমার সহযাত্রী ছিলেন। ৫ই মে আগরতলা অঞ্চলে সীমান্ত অতিক্রম করার পর সপ্তাহকালের মধ্যে কোলকাতায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। তাজউদ্দিন তার আগের দিন দিল্লী থেকে তাঁর দ্বিতীয় সফর শেষ করে ফিরেছেন। প্রায় সাত সপ্তাহের ব্যবধানে তাঁর সাথে আমার দেখা - প্রবাসে এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। কয়েকদিন ধরে কোলকাতায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু অনিশ্চয়তাবোধ ও হতাশার ভাব লক্ষ্য করার পর তাজউদ্দিনকে আমি দেখতে পাই স্বাধীনতাযুদ্ধের সাফল্য সম্পর্কে অবিচল আস্থাশীল।

উল্লেখিত দুদিনে আলোচনা অধিকাংশ সময় আমাদের দুজনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে - মোট প্রায় সাত- আট ঘণ্টা ধরে। দেশের সর্বশেষ আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, প্রবাসী সরকার এবং রাজনৈতিক দলসমূহের দ্বন্দ্ব- সমন্বয় প্রচেষ্টা, বিদ্রোহী সেনাদের অস্ত্র, মনোবল ও প্রস্তুতির সমস্যা, মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নে ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা ও মনোভাব, ভারত সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সাহায্য ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, পাকিস্তানের সম্ভাব্য বিকল্প পদক্ষেপ, অমীমাংসিত পাক- ভারত যুদ্ধের আশঙ্কা - এই সমুদয় বিষয় নিয়েই কমবেশী আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে, ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে কতদূর অবধি সাহায্য করতে সম হবে, এ প্রশ্ন আমি তুলি। এর কোন প্রত্যক্ষ জবাব না দিয়ে তাজউদ্দিন কেবল জানান, মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সমক্ষতা সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নকে আরও বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়াস চলে। আমার বিবেচনায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যদি

আক্ষরিক অর্থে পালিত হয়, তবে তার ফলে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব, তেমনি অন্যদিকে তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে পাকিস্তানের পক্ষেও সংঘর্ষকে তার নিজের সীমান্তের বাইরের সম্প্রসারিত করা স্বাভাবিক। এবং সম্ভবত এক্ষেত্রে পাকিস্তানের পক্ষে চীনের প্রত্যক্ষ সামরিক সহযোগিতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সমর্থন ও সামরিক সাহায্য লাভ করা খুবই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, সামরিক দিক থেকে ভারত মূলত নিঃসঙ্গ এবং সেই কারণে তুলনামূলকভাবে দুর্বল। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান যদি তার গৃহযুদ্ধকে পাক- ভারত যুদ্ধে পরিণত করতে চায়, তবে সেই ঝুঁকি মাথায় করে একাকী ভারতের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করা বেশীদূর কি সম্ভব হবে?

বিষয়টি আর গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় দুটি মূল প্রতিপাদ্য থেকে। প্রথমত, আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে নিজস্ব দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভারতের পক্ষে অবশিষ্ট বিকল্প শক্তি তথা সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব কিনা। চীনের উত্তর সীমান্তে উসুরী নদী বরাবর এবং সিনকিয়াং প্রদেশের পশ্চিমে মোতায়েন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যূন চল্লিশ ডিভিশন সৈন্য চীনের ভারতবিরোধী সামরিক প্রবণতার সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক হতে পারে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করার উদ্ভূত ঝুঁকি প্রতিবিধানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের তদ্রূপ সমঝোতা ও সহযোগিতার আশ্বাস ভারতের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা, তা আমাদের অজানা ছিল। দ্বিতীয়ত, আমাদের আরও জানা প্রয়োজন ছিল, বহু শ্রেণীর স্বার্থ ও মতের টানাপোড়েনে গঠিত ভারতের জাতীয় সরকার এবং বিশেষত এর দক্ষিণপন্থী অংশ ভারতের? বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন মৌলিক রূপান্তর আদৌ কার্যকর হতে দেবে কিনা। এই দুই প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের উপর ভিত্তি করে ভারতের সমতা সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। ভারতের উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করে তার সামরিক ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা না বাড়ানো অবধি মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি, তথা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রায়িতকরণ, সীমান্তযুদ্ধ পরিচালন, ভারতের সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি স্থাপন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি সকল ব্যাপারে অগ্রগতির সম্ভাবনা সীমিত বলে আমাদের আশঙ্কা জন্মায়। ভারতের ক্ষমতাসীন মহলে বেসরকারী আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয় দুটি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা গঠনের উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিন

আমাকে দিল্লী যেতে এবং আমার ঢাকা প্রত্যাবর্তনের কর্মসূচী পরিত্যাগ করে পলিসি পরিকল্পনায় তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন।

তারপর আরো এক সপ্তাহ ধরে কোলকাতায় বিষয়টির সংশ্লিষ্ট অপরাপর দিক নিয়ে তাজউদ্দিনের সাথে আরও তিন/চার-দফা আলোচনা হয়। ফলে আমাদের প্রেক্ষিতবোধ আরও কিছুটা প্রসারিত হয়। ভারতের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েট সহযোগিতা লাভের উদ্যোগ মূলত ভারতেরই নিজস্ব ব্যাপার। তবু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধই যেহেতু ভারতের এই নতুন নিরাপত্তাহীনতাবোধের মূলে, সেহেতু বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও এই মুক্তিযুদ্ধকে একটা বিবেচনাযোগ্য বিষয় হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি। এর কিছু আগে সোভিয়েট সমর্থন লাভের জন্য আবদুস সামাদ আজাদ বুডাপেস্টে শান্তি সম্মেলনে যোগদান শেষে মস্কোতে প্রেরিত হন। বুডাপেস্ট শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু মস্কোতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সোভিয়েট সরকার বা পার্টির কারো সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হন।[৪৯] পাকিস্তানী হত্যাযজ্ঞের কঠোর সমালোচনা করে রক্তপাত বন্ধের জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট পোদগর্নি জোরাল আবেদন জানালেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা তখনও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট কোন বিবেচনাযোগ্য রাজনৈতিক ইস্যু নয়। বস্তুত ১৯৭১ সালের মার্চে ভারতে ইন্দিরা গান্ধী এবং তার কিছু পূর্বে শ্রীলঙ্কায় শ্রীমাভো বন্দরনায়েক ও পাকিস্তানে শেখ মুজিব বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হওয়ায় সমগ্র উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের সন্তুষ্ট বোধ করার কারণ ছিল। এই অবস্থায় রক্তাক্ত অভিযান থেকে ইয়াহিয়াকে নিবৃত্ত করে পাকিস্তানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠাই যদি পোদগর্নির ২রা এপ্রিলের বিবৃতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে তাকে অযৌক্তিক মনে করার কারণ নেই।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েট ইউনিয়নসহ বিশ্বের অপরাপর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার এবং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করার দ্ব্যর্থহীন আহ্বান জানান।[৫০] পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মার্কিনী সামরিক জোট-ঘেঁষা বৈদেশিক নীতির জন্য (এবং ষাট দশকের পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ জোট-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করা সত্ত্বেও) আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে

আওয়ামী লীগ সম্পর্কে যে ধারণা বিদ্যমান ছিল তা দূর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ অনেকখানি সহায়ক হয়। বস্তুত আমেরিকা- ঘেঁষা দল হিসাবে আওয়ামী লীগের এই পূর্বতন পরিচিতি এবং বিশেষত আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাদের দক্ষিণপন্থী মনোভাবের দরুন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যে বেশ বেগ পেতে হবে, তা ইতিমধ্যেই তাজউদ্দিন উপলব্ধি করেছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষত মস্কোপন্থী হিসাবে পরিচিত দলগুলির সঙ্গে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজন এক নতুন গুরুত্ব অর্জন করে। কাজেই নীতিগতভাবে স্থির করা হয়, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের নিরাপত্তার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য যদি সোভিয়েট সহযোগিতা ভারত সরকারের কাম্য হয়, তবে সেই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অন্তত মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে সম্মত হতে হবে।

কাজেই মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে আমার দিল্লী যাওয়ার আগে মোটামুটি স্থির হয়, দিল্লীতে আমার করণীয় হবে: (১) মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভারতীয় সমতা পরিমাপ করার চেষ্টা করা; (২) আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে আনার প্রশ্নে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ভারতের উচ্চতর ক্ষমতাসীন মহলকে আভাস- ইঙ্গিত দেওয়া; এবং (৩) সম্ভব হলে, সংশ্লিষ্ট পলিসি ও কর্মসূচী সমন্বয়ের জন্য পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। একমাত্র বেসরকারী পর্যায়েই এই ধরনের নাজুক মূল্যায়ন ও আলাপ- আলোচনা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। এ ছাড়া আরো একটি কারণ ছিল। মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও আওয়ামী লীগের উপদলীয় পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, এই চিন্তার সামান্যতম প্রকাশেও তাজউদ্দিন আরও একটি গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারতেন। তাজউদ্দিন তাই এইভাবে দলীয় ও মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সবার অগোচরে ভারতের ঊর্ধ্বতনমহলে মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে ন'দিন অবস্থানকালে ঠিক সরকারী দায়িত্বে নিযুক্ত নন, অথচ ক্ষমতাসীন মহলে অত্যন্ত প্রভাবশালী এমন কিছু ব্যক্তি থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বিষয়ক নীতি- নির্ধারণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত এমন কিছু উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে আমার এক বা একাধিক বার

আলোচনার সুযোগ হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি. এন. হাকসার, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপক পি. এন. ধর, পররাষ্ট্র সচিব টি. এন. কল, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা হিসাবে পরিগণিত পাকিস্তানস্থ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জি. পার্থসারথি, পরিকল্পনা মন্ত্রী সি. সুব্রামনিয়াম, 'ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্ট্যাডিজ এ্যান্ড এ্যানালাইসিসের' পরিচালক কে. সুব্রামনিয়াম, এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর চীফ- অব- স্টাফের মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল বি. এন. সরকার (যিনি দু’মাস পরেই মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্বে ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের ডিরেক্টর অপারেশনস্ নিযুক্ত হন)। এ ছাড়াও আলোচনা হয় ভারতের জাতীয় সংবাদ দৈনিকের তিনজন সম্পাদক, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকজনের সঙ্গে। এই সমুদয় আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের ক্ষমতাসীন মহলের মনোভাবের কয়েকটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতি সত্ত্বেও এই সংগ্রামকে সাহায্য করার পরিসর ও উপায় নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীনমহলে বিরাট মতপার্থক্য আমি লক্ষ্য করি এবং কেন্দ্রের দক্ষিন ও বামের মধ্যে কোন অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা বেশ দুরূহ বলে আমার মনে হয়। কেন্দ্রের দক্ষিন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সম্ভাবনা ও সামর্থ্য সম্পর্কে অনেক বেশী সন্দিহান, মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বাংলাদেশের নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে স্থানান্তরিত হওয়ার আশঙ্কায় চিন্তিত, পাকিস্তানের সপক্ষে চীন ও আমেরিকার সাহায্যের মুখে ভারতের নিরাপত্তাহীনতায় উদ্বিগ্ন এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার ফলে আমেরিকান প্রভাব বলয় থেকে আরো দূরে সরে গিয়ে রাশিয়ার উপর ভারতের নির্ভরশীল হয়ে পড়ার আশঙ্কায় সবিশেষ ব্রিবত অথবা শঙ্কিত। এমনকি, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা যে ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে নয়, তেমন মতেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই মহলে। এই মত অনুসারে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের নিরাপত্তার প্রতি কোন বিপদ নেই, বিপদ একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই; কাজেই পশ্চিম পাকিস্তান যদি দীর্ঘদিনের জন্য পূর্বাঞ্চলের গৃহযুদ্ধ দমনের কাজে নিজের সামরিক সম্পদকে নিযুক্ত রাখতে বাধ্য হয় তবে সে অবস্থায় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের নিরাপত্তা অপেক্ষাকৃত উন্নত হওয়া সম্ভব। কাজেই ভারতের জাতীয় স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই, বরং অল্পস্বল্প গোপন

সাহায্যের মাধ্যমে এই বিদ্রোহকে প্রলম্বিত করাই তাদের পক্ষে বুদ্ধিসম্মত। পাশাপাশি বহুজাতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও বিশ্বজনমত গঠনের মাধ্যমে আমেরিকান সরকারকে যদি পাকিস্তানের উপর উপযুক্ত চাপ প্রয়োগে সম্মত করানো যায় এবং এর ফলে পাকিস্তান সরকারকে যদি শেখ মুজিবের সাথে 'রাজনৈতিক সমাধানে' পৌঁছুতে বাধ্য করা যায়, তবে ভারত একদিকে যেমন শরণার্থীর অসহ চাপ থেকে মুক্ত হবে, তেমনি অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব- বিক্ষত দুর্বল পাকিস্তানকে মোকাবিলা করা ভারতের পক্ষে সহজ হবে। এই সমস্ত যুক্তির মর্মার্থ ছিল, শরণার্থী সমস্যা থেকে উদ্ধারের চেষ্টার অতিরিক্ত কোন আকাঙ্ক্ষা তথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভারতের জন্য অহেতুক ঝুঁকি, সমস্যা ও বিড়ম্বনা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এদের যুক্তির সবচাইতে বড় দুর্বলতা ছিল, পাকিস্তানী শাসকদের মনোভাব পরিবর্তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদিচ্ছার উপর এদের সার্বিক নির্ভরশীলতা। যেন মার্কিন সরকার ইচ্ছা করলেই পাকিস্তানের কাঠামোগত স্ববিরোধিতা ও রাজনীতির মৌল বিচ্ছেদের সমাধান ঘটে যাবে।

পক্ষান্তরে, ভারতের ক্ষমতাসীনদের মধ্যে কেন্দ্রের বাম হিসাবে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সদিচ্ছার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নাকচ না- করেও শরণার্থী চাপ থেকে ভারতকে মুক্ত করার অন্যান্য বিকল্প পদক্ষেপ বিবেচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন। এবং এই কারণে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থায় বা বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি কোন যুক্তিসঙ্গত পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটেও তবে তা গ্রহণ করতে এই অংশের কোন বড় আপত্তি ছিল না। ফলে ভারতে আগত ক্রমবর্ধমান শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই, সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ চালানো ব্যতীত অন্য উপায় নেই, এই মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের জন্য ভারতের সর্বাত্মক সাহায্য প্রদান ছাড়া অন্য উপায় নেই, ভারতের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের আগে তার নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ভারতের অন্য কোন উপায় নেই - পরিস্থিতির এই গ্রন্থিবদ্ধ যুক্তিতে তাদের সাড়া পাওয়া যায় প্রথম আলাপেই। যেমন, দিল্লীতে পি. এন. হাকসারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু বামপন্থী মার্কিন অর্থনীতিবিদ ডানিয়েল থর্নার আমার যে বৈঠকের আয়োজন করেন, সেখানে পরিস্থিতির এই যুক্তি উত্থাপনের পর আলোচনা চার ঘণ্টারও অধিক সময় স্থায়ী হয় এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপক পি. এন. ধর সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে তাঁদেরকে আমি জানাই যে, আমার ভূমিকা বেসরকারী হলেও (ন্যাপের একজন সাধারণ সদস্য হিসাবেই নিজকে পরিচিত করি) পরিস্থিতির এই মূল্যায়ন ও পলিসি প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং বর্তমান সংগ্রাম যাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' হিসাবে বিবেচিত হতে পারে তজ্জন্য মস্কোপন্থী হিসাবে পরিচিত দুটি দল সমেত স্বাধীনতা সমর্থক সব কটি দলের সমবায়ে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারেও তাঁর পূর্ণ সম্মতি রয়েছে।

সম্ভবত আমার এই সর্বশেষ দাবীর সারবত্তা যাচাইয়ের জন্য আমাকে দু'দিন অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়। দু'দিন পর পুনরায় যখন হাকসারের সঙ্গে মিলিত হই, তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্য গড়ে তোলার বাস্তব নানা দিক ও সম্ভাব্য সময়সূচী নিয়েই বেশীরভাগ সময় আমরা আলাপ করি। বিদায়ের আগে হাকসার জানান, ভারতস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত বা ঐ পর্যায়ের কোন কূটনীতিকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং নিয়মিত রাজনৈতিক মতবিনিময়ের চেষ্টা চালানো প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রশ্নে রাশিয়ার সাথে কোন সমঝোতায় পৌঁছাবার চেষ্টা তাঁরা করবেন কি না, হাকসার সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করলেও, বাংলাদেশের স্বাধীনতা- সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলির মিলিত ফ্রন্ট গঠনে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ শুরু করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে তিনি আমার মনে এই ধারণারই সৃষ্টি করেন যে, আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে আনার পক্ষে আমাদের ফর্মুলা তাঁদের বিবেচনার অযোগ্য নয়। ঠিক সেই মুহূর্তে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছার অসুবিধা তাঁদের থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সম্ভাব্য সকল কিছু করার ব্যাপারে ভারতীয় ক্ষমতাসীনদের কেন্দ্রের বাম অংশের আন্তরিকতার অভাব হবে না বলে আমার ধারণা জন্মে। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের কেন্দ্রের দক্ষিণের আয়তন ও প্রভাব তুলনামূলকভাবে বড় হওয়ায় ভারত সরকারের সামগ্রিক শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে নিয়োজিত হবে কি না সে সম্পর্কে বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি কোলকাতা ফিরে আসি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে একটি কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করি: দক্ষিণ ও বাম, সঙ্কীর্ণ ও উদার- এই নানা উপাদানে গঠিত ভারতের ক্ষমতার যন্ত্র কোন অখণ্ড শিলা নয়; ভারতের ক্ষমতা- যন্ত্রের অভ্যন্তরে দক্ষিণ ও বামের টানাপোড়েন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।

দক্ষিনপন্থীদের এই প্রাধান্য অনুধাবন করা সত্ত্বেও উদ্ভূত সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধান' সম্পর্কে তাদের আশাবাদ যে বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে না সে বিষয়ে আমাদের উভয়েরই কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই ভারতের ক্ষমতার কেন্দ্রে দক্ষিণ ও বামের এই টানাপোড়েনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে সোভিয়েট প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তাজউদ্দিন অনুমোদন করেন। উভয় পক্ষের মতের আদান-প্রদান যাতে অবাধে এগুতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিন আমাকে একা ও অত্যন্ত গোপনে এই যোগাযোগ শুরু করতে বলেন। এই বেসরকারী আলোচনা যে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহের ফলেই সংঘটিত হতে চলেছে সে বিষয়ে সোভিয়েট পরে আস্থা উৎপাদন এবং বৈঠকের ব্যবস্থা সম্ভব হয় 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার প্রকাশক অরুণা আসফ আলীর সহায়তায়।

কোলকাতায় প্রথম দিনের আলোচনায় সোভিয়েট প্রতিনিধি ভি. আই. গুরগিয়ানভ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে এক নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা, বিঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দুর্বলতা, দীর্ঘমেয়াদী সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশের ভিতরে সংগঠন সৃষ্টির উপায় ও নেতৃত্বের সমতা, ভারতের ক্ষমতাসীন শ্রেণী-স্বার্থের সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তি ও মেয়াদ প্রভৃতি সব ক'টি মূল বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই অপ্রত্যাশিত স্পষ্ট ভাষণের ফলে সোভিয়েট দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনুধাবন করা আমার পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়।

উত্তরে যা জানানো হয়, তার সার কথা ছিল: (ক) সূচনায় অধিকাংশ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনেই এমন অস্পষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা থাকে; (খ) যদি বস্তুগত কারণে সৃষ্ট সঙ্কটের নিষ্পত্তি ঘটার সম্ভাবনা না থাকে, তবে ক্রমশ এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিকতর সংকল্পবদ্ধ ও যোগ্য মানুষের সমাবেশ ঘটা এবং তাদের সাংগঠনিক কলা-কুশলতা উন্নত হওয়া এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মাত্র; (গ) বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পাকিস্তানের মৌলিক কাঠামোগত স্ববিরোধিতা ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিকাশেরই অনিবার্য ফল এবং লক্ষ মানুষের মৃত্যুর পর একে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখার নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যেমন বাংলাদেশের কোন নেতারই নেই, তেমনি স্বাধীনতা বা ছ' দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নিয়ে সামরিক শাসকদের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতায় টিকে

থাকার সম্ভাবনা নেই; এবং (ঘ) ভারত যদি মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার মত পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ খুঁজে পায় তবে তার ফলে ১৯৬৯ সাল থেকে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দণিপন্থীদের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার যে ধারা শুরু হয়েছে সম্ভবত তা আরও পরিপুষ্ট হবে; পক্ষান্তরে তথাকথিত 'রাজনৈতিক সমাধানের' আশায় অযথা কালপেণ করলে ক্রমবর্ধিত শরণার্থীর চাপ ইন্দিরা সরকারকে দক্ষিনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পর্যুদস্ত করতে পারে।

প্রথম দিনের এই বৈঠকের পর সোভিয়েট প্রতিনিধির আগ্রহেই এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয় বৈঠকের আয়োজন হয়। তারপর আরো দুটি বৈঠক হয় এবং প্রতিবারই সাত/আট দিনের ব্যবধানে। মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে ছোট বড় অজস্র প্রশ্ন তোলা হয়েছে, উত্তরও দেয়া হয়েছে। তারপর এই রুশ সংলাপকারী কোলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ায় এই আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। এ সব কথাবার্তার কি ফলাফল হয়েছে, তখন তা জানার কোন উপায় ছিল না। তবে দ্বিতীয় বৈঠক থেকে শুরু করে প্রতিবারেই আলোচনান্তে এই ধারণা নিয়ে আমি ফিরে এসেছি, আমাদের কথা সম্ভবত তাদের সংশ্লিষ্ট মহলে কিছু কিছু পৌঁছাতে শুরু করেছে।

অধ্যায়- ৭: জুন - জুলাই

জুন ও বিশেষত জুলাই মাসে বিভিন্নমুখী ঘটনার সমাবেশ ও ঘাত-প্রতিঘাতে উপমহাদেশের পরিস্হিতি গভীরতর সংঘাতের দিকে মোড় নেয়। বাংলাদেশ সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধানের' উদ্দেশ্যে মার্কিন সহায়তা লাভের যে আশাবাদ ভারতের ক্ষমতাসীন দক্ষিণের ছিল, জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে তা হ্রাস পেতে শুরু করে। জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক নীতির পরিবর্তন সহসা এমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যার ফলে ভারতের নিরাপত্তাহীনতাবোধ চরমে পৌঁছে এবং নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্হার অন্বেষণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠে। অন্যদিকে 'পূর্ব পাকিস্তান' পুনর্দখলের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তানী শাসকদের আত্মপ্রসাদ জুন মাসের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে ম্লান হতে শুরু করে। এই এলাকায় তাদের দখল কায়েম রাখার সমস্যা নতুন করে প্রকট হয়ে ওঠে সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত

ছাত্র ও তরুণদের সশস্ত্র তৎপরতার সূচনাতে। একই সময়ে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার ছোটখাট সংঘাতের ফলে এ অঞ্চলে পাকিস্তানীরা তাদের সামরিক অবস্হানকে সীমান্ত বরাবর এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে, যার ফলে তাদের সামরিক শক্তি ক্রমশ খণ্ড- বিখণ্ড হয়ে পড়তে শুরু করে। আর সীমান্তের বাইরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে বিশৃঙ্খলাভাব অনেকটা দূর হয় জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে শিলিগুড়িতে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদেও বৈঠকের পর। এর ফলে অস্হায়ী মন্ত্রিসভা অপেক্ষাকৃত স্হিতিশীল ও সংহত হয়। এ ছাড়া ১০ই জুলাই থেকে সপ্তাহকালব্যাপী বৈঠকের ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক বিন্যাস ও কর্মপদ্ধতিতে কিছু শৃঙ্খলার সূচনা ঘটে।

গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলির অধিকাংশ পত্রপত্রিকা এবং জনপ্রতিনিধিদের উল্লেখযোগ্য অংশ সামরিক চক্রের নীতির বিরুদ্ধে প্রশংসনীয়ভাবে সোচ্চার থাকায় একথা মনে হওয়ার অবকাশ ছিল যে, এই সব দেশের সরকার স্ব স্ব জনমত অনুসারে শীঘ্রই হয়ত সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য পাকিস্তানী জান্তর উপর চাপ প্রয়োগ করবেন। ভারত সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের আশান্বিত হওয়ার কারণ ছিল আরও কিছু বেশী। ২৮শে মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে লিখিত এক চিঠিতে জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া সরকারকে এক রাজনৈতিক সমঝোতায় রাজী করানোর জন্য ‘নীরবে কাজ করে চলেছে’।[৫১] পক্ষকালের মধ্যেই ভারতের বিদেশ মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং আমেরিকা পাড়ি দেন পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করার অনুরোধ নিয়ে। তার সফর শেষে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র শরণার্থী প্রশ্নে ভারতের সংযমের প্রশংসা করে বলেন, পাকিস্তানে রাজনৈতিক পর্যায়ে সমঝোতা স্হাপন ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পরেই শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব।[৫২] তখনও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন বৈদেশিক নীতি ব্যবস্হাপনার প্রশ্নে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর ও ‘হোয়াইট হাউসের’ জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মতের গড়মিল তথা, পররাষ্ট্র সচিব রোজার্স প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী হেনরী কিসিঞ্জারের মধ্যে প্রেক্ষিতবোধের তারতম্য এবং ব্যক্তিগত বিরোধ ও সংশ্লিষ্ট বৈরিতা বাইরে ততটা স্পষ্ট নয়। কাজেই মার্কিন মুখপাত্রের ঘোষণা ভারতের সংশ্লিষ্ট মহলে আরও কিছু আশার সঞ্চার করে।

কিন্তু শরণ সিং দেশে ফিরতে না ফিরতেই 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় ২১ ও ২২শে জুনে প্রকাশিত হয়, নিরস্ত্র মানুষ হত্যার কাজে আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে জেনেও মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে এবং তাদের অনুমতিক্রমে পাকিস্তানী দুটি জাহাজ 'সুন্দরবন' ও 'পদ্মা' সমরাস্ত্রের 'যন্ত্রাংশ' নিয়ে যথাক্রমে ৮ই মে ও ২১শে জুন পাকিস্তানের উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছে। একই সময়ে পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য অব্যাহত রাখার পক্ষেও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনমনীয়তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। বিশ্ব ব্যাংকের ১১-জাতি 'এইড- টু- পাকিস্তান ক্লাব' ঐ সময় 'পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায়' এক বছরের মত উন্নযন সাহায্য স্হগিত রাখার সুপারিশ গ্রহণ করে।[৫৩] কিন্তু ২৮শে জুন তারিখে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ক্লাবের অন্যান্য দেশ সাহায্য বন্ধ করলেও পাকিস্তানকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে মার্কিন কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।[৫৪] তার পর দিন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রেস অফিসার চার্লস ব্রে ঘোষণা করেন, পরবর্তী দুই এক মাসের মধ্যেই মার্কিন সমরাস্ত্র নিয়ে আরও চার অথবা পাঁচটি জাহাজ পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা দেবে।[৫৫]

জুনের সবচাইতে খারাপ খবর আসে ইসলামাবাদ থেকে। ২৮শে জুন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের বেতার ঘোষণায় 'বিশেষজ্ঞ' দ্বারা নতুন সংবিধান তৈরী করে বেসামরিক প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আশ্বাস দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের অথবা আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করার সামান্যতম ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া চরম আশাবাদীর পক্ষেও দুরূহ হয়ে পড়ে।[৫৬] এক মাস আগে পাকিস্তান সরকারকে একটি 'রাজনৈতিক সমঝোতায়' পৌঁছানোর জন্য 'নীরবে কাজ করে যাচ্ছে' বলে নিক্সন যে আশ্বাস দেন তদ্‌মর্মে অগ্রগতির কোন নিদর্শন ইয়াহিয়ার বেতার বক্তৃতায় ছিল না।

অবশ্য 'রাজনৈতিক সমাধানের' জন্য ভারত সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের আশাবাদ চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে হেনরী কিসিঞ্জারের নয়াদিল্লী সফরের দু'সপ্তাহের মধ্যে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে কিসিঞ্জার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যদান থেকে বিরত হওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। পক্ষান্তরে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ শরণার্থীদের দেশে ফেরার পথ সুগম করার জন্য শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছুবার ব্যাপারে পাকিস্তানীদের উপর চাপ দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং

তদুদ্দেশ্যে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য বন্ধ করার দাবী জানান। কিসিঞ্জার মুজিবের মুক্তি এবং সামরিক সাহায্য বন্ধের ব্যাপারে অক্ষমতা ব্যক্ত করলে ইন্দিরা জানান, ভারতের পক্ষেও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাহায্য বৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।[৫৭] এমতাবস্হায় পাকিস্তানের পক্ষে ভারত আক্রমণ করার এবং চীনের তাতে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে কিসিঞ্জার অভিমত প্রকাশ করেন। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে কিসিঞ্জার জানান ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধে আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকলেও চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতকে সহায়তা করার পূর্ববর্তী ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকবে।[৫৮]

কিসিঞ্জার অতঃপর পাকিস্তান যান। কিন্তু সেখান থেকে তিনি চীনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে পিকিং সফরে যান। কিসিঞ্জারের এই অপ্রত্যাশিত সফরে ভারতের সরকারী মহলের সর্বস্তরে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক বিরোধে মার্কিন ভূমিকা সম্পর্কে বিরাট সন্দেহের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন অদূর ভবিষ্যতে চীন সফরে যাবেন, সে সংবাদ সন্দেহের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু সবচাইতে বড় আঘাতের তখনও বাকী। পিকিং থেকে ওয়াশিংটন ফেরার কয়েকদিন পর চীনের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের পূর্বতন প্রতিশ্রুতির সংশোধন করে কিসিঞ্জার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা- কে অবহিত করেন, চীন যদি পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে সে ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে।[৫৯] ফলে ১৯৬২ সালে ভারত- চীন সীমান্ত সংঘাতের পর সম্ভাব্য চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে প্রতিশ্রুতি ভারতকে দিয়েছিল, এমনকি মাত্র দশ দিন আগেও কিসিঞ্জারের মুখে যা অংশত পুনর্ব্যক্ত হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। চীনের সাথে নির্মীয়মাণ সম্পর্কের স্বার্থে তাদের পূর্ববর্তী ভূমিকার এত বড় পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল, না তাঁর চীন সফরের ফলে সৃষ্ট পরিসি'তিকে মূলধন করে মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তা প্রদান থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করাই কিসিঞ্জারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তা ইতিহাস গবেষণার বিষয়বস্তু।

কিসিঞ্জারের নতুন বক্তব্যের আলোকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা বা মধ্যস্হতায় শরণার্থী সমস্যা সমাধানের পক্ষে ভারত সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের আশাবাদ টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ভারতে সকল মহলেই উপলব্ধি ঘটে- পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজশের মুখে ভারত একা, ভারত নিরাপত্তাবিহীন। এই অবস্হায় কিসিঞ্জারের

দাবী অনুসারে বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করে আসন্ন যুদ্ধ হয়ত এড়ানো সম্ভব কিন্তু শরণার্থীদের যে ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়, তা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত অধিকাংশ শরণার্থীর জন্য ন্যূনতম নিরাপত্তাবোধ ফিরে পাওয়া অসম্ভব ছিল। কাজেই মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করা এবং তাদের জয়যুক্ত করার ব্যবস্হা গ্রহণ ভিন্ন শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠানোর যে উপায় নেই, একথা জুলাইয়ের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় নীতিনির্ধারক মহলে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তা প্রদান থেকে ভারতকে বিরত করার জন্য পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের এই আঁতাত পরিস্ফুট হওয়ার পর ভারতও তার নিজের উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েট সহযোগিতা লাভে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এমনিভাবে আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্যে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

অন্যদিকে মে মাসে 'সমস্ত পরিস্হিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার' পর জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ অবধি পাকিস্তানী জান্তা তুলনামূলকভাবে নিরুপদ্রবেই ছিল। মার্চ-এপ্রিলের সামরিক নৃশংসতা এবং উপদ্রুত মানুষের অবিরাম দেশত্যাগের ফলে বহির্বিশ্বের বিরূপ প্রচার ও বিরুদ্ধ জনমত মোটামুটি তাদের ধাতস্হ হয়ে এসেছে। কিন্তু জুনের চতুর্থ সপ্তাহে প্যারিস বৈঠকে পাশ্চাত্য সাহায্যদাতা দেশগুলি বাৎসরিক সাহায্য বরাদ্দের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেওয়ায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এই সপ্তাহ থেকে তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যখন দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে, তখন তার নিরাপত্তা পরিস্হিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

জুন মাস অবধি দেশের ভিতরে টাঙ্গাইল ও আরো দু-একটি এলাকায় মূলত স্হানীয় সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি বিদ্রোহী বাহিনী প্রশংসনীয় দক্ষতার সাথে দখলদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছিল। জুন মাসের শেষ দিকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দু'হাজারের কিছু বেশী ছাত্র ও তরুণ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে দেশের অন্যান্য অংশেও সশস্ত্র লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। এদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল নিতান্ত সামান্য। তবু এদের অসীম মনোবল ও দুঃসাহসিক অভিযানে বড় বড় সেতু ধ্বংস হয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে থাকে, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথসহ বিভিন্ন স'ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে, রফতানী হ্রাস পায় এবং পাকিস্তানী সামরিক, আধাসামরিক বাহিনী ও বিশেষত তাদের অসামরিক তাঁবেদারদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে

থাকে।[৬০] এপ্রিল মাসে বিদ্রোহী সশস্ত্রবাহিনী ও রাজনৈতিক কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ থেমে যাওয়ার প্রায় আড়াই মাস পরে স্বেচ্ছাসংগ্রামী এই তরুণদের অকুতোভয় সশস্ত্র লড়াইয়ের ফলে নতুন প্রাণ- সঞ্চার ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রামের।

এর জবাবে পাকিস্তানী বাহিনী নৃশংসতার মাত্রা তোলে বাড়িয়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার সামান্যতম নিদর্শনেও সংশ্লিষ্ট এলাকা ও আশেপাশের বসতির উপর ঢালাও আক্রমণ চালিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে, তরুণদের পাইকারীভাবে আটক ও হত্যা করে সন্ত্রাসের রাজত্বকে আরো বেশী চাঙ্গা করে তোলে। ফলে সৃষ্টি হয় আরও দুঃখ- দুর্দশা, আরও বাস্তুহারা, আরও ক্রোধ এবং ঘৃণা।[৬১] দখলকৃত এলাকায় 'স্বাভাবিক অবস্হা' বিরাজ করছে এ কথা প্রমাণ করার জন্য মে মাসের শেষ দিকে কিছু সংখ্যক বিদেশী সাংবাদিকদের অধিকৃত এলাকায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপসি'তিতেই সশস্ত্র তরুণদের তৎপরতা শুরু হওয়ায় স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশে ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবার কথা সারা বিশ্বে প্রচারিত হতে থাকে, যেমন প্রকাশিত হতে থাকে দখলদার সৈন্য বাহিনীর অমানুষিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের কাহিনী।

একই সময়ে দেশের অভ্যন্তরে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্ত পারাপারকে সহজ করে তোলার জন্য সীমান্ত এলাকাতেও কিছু সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করা হয়। জুনের শেষ দিকে এবং বিশেষত জুলাই মাসে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্ত ঘাঁটি (BOP) নিয়মিতভাবে ধ্বংস করার কাজে নিযুক্ত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলকে বাংলাদেশের যুদ্ধ- অনভিজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াতের পথকে সুগম (porous) করে তোলে।[৬২] সমগ্র দখলকৃত এলাকায় পাকিস্তানী গোলন্দাজ রেজিমেন্টের সংখ্যা ছিল পাঁচের অনধিক। দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে ভারতীয় গোলন্দাজ আক্রমণের জবাব দেবার ক্ষমতাও তাদের ছির সীমিত। ভারতের ১০/১২টি ফিল্ডগানের আক্রমণের জবাব পাকিস্তানীরা দিতে পারত মাত্র ২/৩টি ফিল্ডগানের সাহায্যে। ফলে যে সব অঞ্চল দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যাওয়া- আসার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেই সব অঞ্চলের পাকিস্তানী সীমান্ত ঘাঁটির পতন ঘটতে থাকে একের পর এক। জুলাইয়ের শেষে পাকিস্তানী সীমান্ত ঘাঁটির শতকরা প্রায় পঞ্চাশভাগ অকেজো হয়ে পড়ে এবং পর্যাপ্ত সৈন্যবলের অভাবে তার অধিকাংশই শেষ অবধি তেমনি অবস্হাতেই পড়ে থাকে।[৬৩]

ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর এই সীমিত তৎপরতার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাকিস্তানী জান্তা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়। একই সঙ্গে দেশের ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং সীমান্তে ভারতীয় গোলন্দাজ আক্রমণের ফলে তাদের সন্দেহ হয় পূর্ব পাকিস্তানের অংশ বিশেষ দখল করে নেয়াই এই তৎপরতার লক্ষ্য। সম্ভবত তাদের এই সন্দেহ আরও জোরদার হয়ে ওঠে ১২ই জুলাই লন্ডনের ‘টাইমস্’ পত্রিকায় বাংলাদেশ শরণার্থী সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্ট্যাডিজ এ্যান্ড এ্যানালাইসিস’-এর ডিরেক্টর কে. সুব্রামনিয়ামের অভিমত প্রকাশিত হবার পর। সুব্রামনিয়ামের মতে, শরণার্থী সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য ভারতের উচিত পূর্ব বাংলার কোন একটি অংশ মুক্ত করে শরণার্থীদের সেখানে স্হানান্তরিত করা, যেখানে বাংলাদেশের অস্হায়ী সরকারকেও সার্বভৌমত্বের মর্যাদাসহ প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এই অভিমতের পক্ষে ভারতের DMO লে. জেনারেল কে. কে. সিং- এর সমর্থনের কথা জানা গেলেও, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিমান প্রতিরক্ষা এবং ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ সামর্থ্য অর্জন করার পূর্বে এরূপ কোন মুক্তাঞ্চলকে পাকিস্তানী প্রতি- আক্রমণ থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। একা বাংলাদেশের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে এ জাতীয় সামর্থ্য অর্জন করার সুযোগ ছিল না। আর ভারত যদি এ ব্যাপারে নিজেরাই দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হত, তবে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণাও অনিবার্য হয়ে দাঁড়াত। ১৯শে জুলাই ইয়াহিয়ার ঘোষণাতেও স্পষ্ট করে বলা হয়, ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানের কোন অংশ দখলের চেষ্টা করে তবে পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু করবে।[৬৪]

জুন- জুলাইয়ে বাংলাদেশ সামরিক মহলেও মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার পক্ষে কিছু চিন্তাভাবনা চলছিল।[৬৫] জুলাই মাসে ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্তের পিছনে মুক্তাঞ্চল গঠনের বিবেচনাও যে সক্রিয়, তা কিছুটা প্রকাশ্যেই আলোচনা হয়েছে। ফলে জুলাই মাসেই পাকিস্তানী শাসকদের মনে এমন ধারণা প্রবল হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল যে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় সহায়তায় সীমান্তের কাছে এক বা একাধিক মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলতে পারে। এর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করে ইয়াহিয়াচক্র তাদের সেনাবাহিনীর জন্য এক নতুন নির্দেশ জারী করে। এই নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের এক ইঞ্চি ভূমিও যাতে শত্রু কবলিত না হয়, তজ্জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সীমান্ত এলাকার পাহারা জোরদার করতে বলা হয়। এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে দখলদার বাহিনী সীমান্ত

বরাবর ছড়িয়ে পড়ে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে।[৬৬] এর ফল দাঁড়ায় মূলত দুটো।

প্রথমত, দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য লড়াই চালানো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। যদিও রাজাকার বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে পাকিস্তানীরা সৈন্য ঘাটতিজনিত সমস্যার আংশিক সুরাহা করে, তবু তাদের প্রধান বাহিনী সীমান্তের দিকে সরিয়ে না নিয়ে গেলে দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী সৈন্য ও রাজাকারদের মিলিত শক্তি মোকাবিলা করা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দুঃসাধ্যের হত।

দ্বিতীয়ত, চৌদ্দশ' মাইল দীর্ঘ এ সীমান্ত বরাবর ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ার ফলে পাকিস্তানী বাহিনীর একীভূত শক্তি সেই অনুপাতেই খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে এবং বড়, এমনকি মাঝারি আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা সবিশেষ হ্রাস পায়। দেশের সীমান্তে মুক্তাঞ্চল গঠিত হবার আশঙ্কাবোধ থেকে পাকিস্তানী বাহিনী যেভাবে দখলকৃত এলাকায় নিজেদের অবস্হানের পুনর্বিন্যাস সাধন করে, তাতে তাদের সম্ভাব্য পরাজয়ের পথ প্রস্তুত হতে শুরু করে।

জুলাই মাসে স্বেচ্ছাসংগ্রামী ছাত্র ও তরুণদের সশস্ত্র তৎপরতা শুরু হবার অল্প সময়ের মধ্যে দখলকৃত এলাকায় মে-জুনের তথাকথিত স্হিতিশীলতার অবসান ঘটে, আভ্যন্তরীণ শক্তির ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত বরাবর সৈন্যবাহিনী বিস্তৃত হওয়ার ফলে একযোগে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গেরিলা বিরোধী যুদ্ধ এবং সীমান্তে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ চালাবার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করে। অন্যদিকে এই জুলাই মাসেই ভারতের ক্ষমতাসীন দক্ষিণকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তান ও চীন উভয়ের সঙ্গে এমনভাবে নিজকে যুক্ত করে যে, ভারতের নিরাপত্তাহীনতাবোধ তার ফলে চরমে পৌঁছায় এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তিতে পৌঁছানো সম্পূর্ণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভারত সরকারের উপর মার্কিন প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করায় এবং এর পাশাপাশি, ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্হা সুদৃঢ় করার উদ্যোগ গৃহীত হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের জন্য ভারতের বৃহত্তর সাহায্যের পথ সুপ্রশস্ত হয়।

অধ্যায় ৮: জুলাই - নভেম্বর

সীমান্ত অতিক্রমের পর থেকে জুন অবধি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনৈক্য ও উপদলীয় কলহ সামান্যই প্রশমিত হয়েছে। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে বেড়েছে হতাশা আর ক্ষোভ। ইতিমধ্যে নতুন সরকারকে সংগঠিত করার জন্য প্রশাসনিক, যুব প্রশিক্ষণ ও আঞ্চলিক কমিটি গঠনের যে সব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার ফল সঞ্চারে তখনও বাকী। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র ও যুবকদের প্রথম দলকে স্বদেশে পাঠানোর তোড়জোড় চলছে মাত্র। মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সম্প্রসারিত করার স্বার্থে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর শক্তি সমাবেশের জন্য ভারত সরকার এবং সোভিয়েট প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আমাদের কথাবার্তা সবে শুরু হয়েছে এবং এসবের ফলাফল তখনও অজ্ঞাত। এই সমুদয় বিষয়ে কিছু অগ্রগতি সাধিত হবার পর, বিশেষত দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ পুনরুজ্জীবিত করার পর, দলীয় শৃঙ্খলা বিধানের কাজে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাদের উদ্বুদ্ধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হত।

কিন্তু তার পূর্বেই ২০শে জুন কোলকাতায় ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের যুগ্ম সচিব অশোক রায় যথাশীঘ্র বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেও বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য তাজউদ্দিনকে অনুরোধ করেন এবং আপত্তি না হলে ২৯শে জুন নাগাদ মেঘালয় রাজ্যের তুরায় এই অধিবেশনের আয়োজন করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। ভারত সরকারের কোন বিশেষ অংশের আগ্রহে বা কোন নির্দিষ্ট বিবেচনা থেকে এই জরুরী অধিবেশন তলবের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে ভারতের ক্ষমতাসীনদের দক্ষিণপন্থী অংশ যে তাজউদ্দিন সম্পর্কে উষ্ণভাব পোষণ করতেন না, তার আভাস ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। এ সম্পর্কে কোন জল্পনা- কল্পনা নিরর্থক জেনে এবং যদি কারো সংশয় দেখা দিয়ে থাকে তা নিরসনের জন্য তাজউদ্দিন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেও বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন। সময়ের স্বল্পতা ও যোগাযোগের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এই অধিবেশন ৫ই ও ৬ই জুলাই শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠানের কথা স্হির হয়। দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্হাদির

ফললাভের আগেই নানা কারণে সন্দিহান, বিভক্ত ও বিক্ষুব্ধ প্রতিনিধিদের সম্মুখীন হওয়া তাজউদ্দিন তথা মন্ত্রিসভার জন্য খুব সহজ ছিল না।

তার প্রমাণও পাওয়া গেল শিলিগুড়িতে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং দলীয় নেতৃবৃন্দ সমবেত হওয়ার পর। পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত প্রায় তিন শত প্রতিনিধির এই সমাবেশে (অবশিষ্ট ১৫০ জনের মত নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল পাকিস্তানিদের হেফাজতেই) অভিযোগ ও অপপ্রচারের স্রোতই ছিল অধিক প্রবল। প্রবাসী সরকারের সম্পদ ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাই এদের অনেক অভিযোগের উৎস। আবার সরকারী ব্যবস্হাপনার কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও নিঃসন্দেহে ছিল সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু এইসব অভাব-অভিযোগ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অবলম্বন করে কয়েকটি গ্রুপ উপদলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা, বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর অপসারণের দাবীতে ছিল নিরতিশয় ব্যস্ত।

আওয়ামী লীগের ভিতরে একটি গ্রুপের পক্ষ থেকে তাজউদ্দিনের যোগ্যতা এবং তার ক্ষমতা গ্রহণের বৈধতা নিয়ে নানা বিরুদ্ধ প্রচারণা চলতে থাকে। কর্নেল ওসমানীর বিরুদ্ধেও এই মর্মে প্রচারণা চলতে থাকে যে, মুক্তিযুদ্ধ ব্যবস্হাপনায় তাঁর অক্ষমতার জন্যই মুক্তিসংগ্রাম দিনের পর দিন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা ছিল, মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ব্যাপারে তাদের মৌলিক অনীহার কারণেই খুব নগণ্য পরিমাণ অস্ত্র তাদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রশ্ন তারা নানা অজুহাতে এড়িয়ে চলেছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত তাদের সমর্থন লাভ করবে কিনা, তাও সন্দেহজনক। এই সব প্রচার অভিযানে ভারতের উদ্দেশ্য ও তাজউদ্দিনের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাপারে তৎপর ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ। মন্ত্রিসভার বাইরে মিজান চৌধুরীও প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় একই সন্দেহ প্রকাশ করে দলীয় সম্পাদকের পদ থেকে তাজউদ্দিনের ইস্তফা দাবী করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের এক নৈরাশ্যজনক চিত্র উপস্হিত করে বলেন এর চাইতে বরং দেশে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ অথবা আপোস করা ভালো। কিন্তু এর কোন একটি চিন্তা বাস্তবে কার্যকর করার কোন উপায় তাঁর জানা আছে কিনা এমন কোন আভাস তাঁর বক্তৃতায় ছিল না।

এই সব অভিযোগ, সমালোচনা, অনাস্হা, অপপ্রচার ও নৈরাশ্য সৃষ্টির প্রয়াসের পরেও আওয়ামী লীগের অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি

স্বাধীনতার প্রশ্নে অবিচল থাকেন। বিভিন্ন প্রচারণার জবাবে অস্হায়ী রাষ্ট্রপতি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং- এর জন্য যে সব ব্যবস্হা গৃহীত হয়েছে তার ফল সঞ্চারের জন্য ৩/৪ মাস সময় প্রয়োজন, এর জন্য অধৈর্য হয়ে পড়লে চলবে না। তাজউদ্দিন ঘোষণা করেন, বিজয়ের জন্য যে দীর্ঘ সংগ্রাম ও অশেষ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, তা সকল প্রতিনিধির পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, ফলে যোগ্যতার নেতৃত্বের উদ্ভব সেখানে ঘটবেই; তিনি নিজেও যদি সক্ষম না হন, তবে যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে; কিন্তু বিজয় বাংলাদেশের অনিবার্য। তুমুল করতালিতে তাজউদ্দিন অভিনন্দিত হন। পরদিন ৬ই জুলাই আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় সংগঠনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্হির হয় সাবেক নিখিল পাকিস্তান কার্যকরী কমিটি নয়, বরং সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটিকেই অতঃপর দলের বৈধ নেতৃত্ব হিসাবে গণ্য করা হবে। বিভ্রান্তি ও অনৈক্য সৃষ্টির নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে এবং মন্ত্রিসভার পক্ষে সর্বসম্মত আস্হা জ্ঞাপনই ছিল শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত পরিষদ সদস্যদের সম্মেলনের প্রধান অবদান। অন্য কোন বিষয়ে শিলিগুড়ি সম্মেলন যে বিশেষ কোন অবদান রেখেছিল- কি মুক্তিযুদ্ধ ব্যবস্হাপনায় কার্যকর পথ- নির্দেশের ক্ষেত্রে, কি দেশের অভ্যন্তরে কোন সাংগঠনিক কর্মসূচী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে- এ কথা বলা কঠিন।

সপ্তাহকালের মধ্যেই কোলকাতায় প্রবাসী সরকারের সদর দফতর ৮ থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের যে বৈঠক শুরু হয় (১০- ১৫ই জুলাই), তারও ফলাফল বহুলাংশে ইতিবাচক, যদিও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের তুলনায় তা ছিল অসম্পূর্ণ। মার্চ- এপ্রিলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং বিশেষ করে রাইফেলস (ইপিআর)- এর বিদ্রোহী সেনাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ হলেও পরবর্তী মাসগুলিতে এদের তুলনামূলক নিষ্ক্রিয়তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য তাদের এই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার কারণ ছিল একাধিক।

তাজউদ্দিনের ১১ই এপ্রিলের বক্তৃতায় বিভিন্ন সীমান্তবর্তী রণাঙ্গনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট হওয়ার পর ১৯শে মে বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্রবাহিনীর সমন্বয়ের মাধ্যমে সেগুলি অংশত পুনর্গঠন করা হয়। কিন্তু এই সকল সেক্টরকে সবল করে তোলার মত সমরাস্ত্র ও সম্পদ

পর্যাপ্তভাবে সরবরাহ করা যেমন সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তেমনি গৃহীত হয়নি কোন নির্দিষ্ট সমর পরিকল্পনা এবং কার্যকর কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে এই সব সেক্টরকে সংগঠিত ও সক্রিয় করার পদক্ষেপ। জুন মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন সীমান্তকে মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচলের পক্ষে সুগম করার জন্য এবং অংশত বাংলাদেশ বিদ্রোহকে বহির্বিশ্বের কাছে জীবিত রাখার জন্য পাকিস্তানী বিওপি ধ্বংসের মত সীমিত সংঘাত শুরু করে, তখন তারা স্হানীয় ভিত্তিতে কোন কোন বাংলাদেশ সেক্টর বাহিনীর সহযোগিতা নেয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমান্ডের কোন সুস্পষ্ট ভূমিকা না থাকায়, ভারতীয় কমান্ডারদের দেওয়া দায়িত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ সেক্টর ইউনিটের বিভিন্ন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ছিল। সম্ভবত এই সময় থেকেই একটি বিদ্রোহী বাহিনীর জটিল মানসিকতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভারতের অফিসারদের অক্ষমতা প্রকাশ পেতে শুরু করে। তা ছাড়া ভারতে আসা মাত্রই এখানে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়া যাবে, এমন আশা নিয়েই বিদ্রোহী বাহিনী পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে ভারতে প্রবেশ করে। কিন্তু পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ যে ভারতের জন্য একটি জটিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং পূর্বোল্লিখিত এত সব আন্তর্জাতিক বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের মত অধিকাংশ সেক্টর অধিনায়কদের উপলব্ধির বাইরে ছিল। কাজেই আলোচ্য তিন মাসে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের নগণ্য সরবরাহ এবং কূটনৈতিক স্বীকৃতি জ্ঞাপনে ভারতের গড়িমসিদৃষ্টে সেক্টর ইউনিটগুলির পক্ষে মনোবল বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সব কারণে দীর্ঘ সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্হানরত অধিকাংশ সেক্টর বাহিনী হতোদ্যম ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।

এই পরিস্হিতিতে জুলাইয়ে সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলনের প্রাক্কালে ‘মুক্তিযুদ্ধের অধোগতি রোধ’ এবং ‘কমান্ড ব্যবস্হার উন্নতি সাধনের’ উদ্দেশ্যে এক ‘যুদ্ধ কাউন্সিল’ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেক্টর অধিনায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সাথে আলাপ- আলোচনার ভিত্তিতে এবং তাদের সমবায়ে ‘যুদ্ধ কাউন্সিল’ গঠনের এই উদ্যোগের পিছনে মেজর জিয়াউর রহমান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রধান সেনাপতি ওসমানীকে দেশরক্ষা মন্ত্রী পদে ‘উন্নীত’ করে সাতজন তরুণ অধিনায়কের সমবায়ে গঠিতব্য এক কাউন্সিলের হাতে মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র ব্যবস্হাপনার দায়িত্ব অর্পণই ছিল আলোচ্য প্রস্তাবের সার কথা। কিন্তু প্রস্তাবের মূলমর্ম ওসমানীর নেতৃত্বের প্রতি অনাস্হাব্যঞ্জক হওয়ায় কর্নেল ওসমানী ১০ই জুলাই সম্মেলনের প্রথম দিনেই প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব

থেকে পদত্যাগ করেন। সেক্টর অধিনায়কদের মধ্যে খালেদ মোশাররফ উত্থাপিত 'যুদ্ধ কাউন্সিল' প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাজউদ্দিনের চেষ্টায় ওসমানীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার হতে কেটে যায় একদিনেরও বেশী সময়। সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলনের এই অপ্রীতিকর সূচনা সত্ত্বেও তারপর কয়েকদিনের আলোচনায় বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা পুনঃনির্ধারণ, মুক্তিবাহিনীর শ্রেণীকরণ ও দায়িত্ব অর্পণ, সশস্ত্র তৎপরতার লক্ষ্য ও পরিসীমা নির্ধারণ, দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটি নির্মাণ, প্রতিপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরে অনিয়মিত যুদ্ধে (irregular war) নিযুক্ত ছাত্র ও তরুণদের বাহিনীর নামকরণ হয় 'গণবাহিনী', যদিও 'মুক্তিযোদ্ধা' (Freedom Fighter of FF) নামেই তারা অধিক পরিচিতি লাভ করে। দেশের সীমান্ত এলাকায় সম্মুখ অথবা গোপন আক্রমণে শত্রুসেনাকে ঘায়েল করার জন্য 'ইবিআর', 'ইপিআর' এবং ক্ষেত্রবিশেষে আনসার, পুলিশ ও নতুন রিক্রুটের সমবায়ে গঠিত হয় 'নিয়মিত বাহিনী', 'মুক্তিফৌজ' বা MF নামেই যার অধিক পরিচিতি ঘটে। এই নিয়মিত বাহিনীর মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় কিছু 'মুক্তাঞ্চল'(lodgement area) গঠনের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে নিয়মিত বাহিনীকে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেক্টর কমান্ডারদের সপ্তাহব্যাপী বৈঠকের পর দেখা যায়, সংগঠন ও আক্রমণ ধারার ব্যাপারে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও দু'টি অত্যন্ত মূল বিষয়ে তথা, কেন্দ্রীয় কমান্ড গঠন এবং পূর্ণাঙ্গ রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথোচিত দৃষ্টি না দেওয়ায় উভয় বিষয়েই মারাত্মক দুর্বলতা রয়ে গেছে। প্রায় চৌদ্দশ' মাইল সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত এবং কোন কোন অংশে দুর্গম এই রণাঙ্গনকে স্বল্প সম্পদ ও সীমিত সহায়তার উপর নির্ভর করে কোলকাতা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যে কোন কমান্ডের পক্ষেই সাধ্যাতীত ছিল। বিশেষত সেক্টরগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্হাপনের কোন উপায় না থাকায় কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে সেক্টর নিয়ন্ত্রণের চিন্তা ছিল অবাস্তব। সেক্টরের পক্ষেও ঊর্ধ্বতন কমান্ডের সময়োপযোগী নির্দেশের বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সুযোগের অভাবে নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। সম্ভবত কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে দুই বা তিনটি আঞ্চলিক কমান্ড স্হাপন করে এবং আঞ্চলিক কমান্ডের হাতে সেক্টর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করে কমান্ড ব্যবস্হার মৌলিক দুর্বলতা বহুলাংশে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হত।

কিন্তু ওসমানীর পদত্যাগ প্রচেষ্টার পর এহেন নাজুক বিষয় তাঁর কাছে উত্থাপন করা রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে। সেই পর্যায়ে ওসমানীর সম্ভাব্য পদত্যাগের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বিবেচনা করেই আঞ্চলিক কমান্ড গঠনের প্রশ্নটি স্হগিত থাকে। কেন্দ্রীয় কমান্ড ও সেক্টর অধিনায়কদের মধ্যে বিশাল দূরত্ব পূরণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বাহিনীর নিজস্ব টেলিযোগাযোগ বা অন্য কোন উপায় না থাকায় প্রাত্যহিক যোগাযোগের জন্য তাদের পক্ষে ভারতীয় সিগনালের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এর ফলে বাংলাদেশ বাহিনীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা ও একান্ত নিজস্ব বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমান্ড ও সেক্টরের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ ছিল অনেকটা সঙ্কুচিত। তা ছাড়া প্রধান সেনাপতির নিজস্ব কর্মতালিকায় বিভিন্ন সেক্টরে নিয়মিত পরিদর্শন বিশেষ কোন অগ্রাধিকার পেত না। কমান্ড ব্যবস্হার এই সব অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতার ফলে সেক্টর অধিনায়কদের অনেকেই এক ধরনের স্বাধীন ক্ষমতার উৎস হিসাবে বিরাজ করতে থাকেন। ক্রমে এই স্বাধীন ক্ষমতা কোন কোন অধিনায়কের মধ্যে আত্মপরিপোষণের অভিপ্রায় ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে উদ্দীপ্ত করে।

কমান্ড গঠনে এই দুর্বলতা অপেক্ষাও আরও বড় দুর্বলতা ধরা পড়ে বাংলাদেশের নিজস্ব রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানী হামলা শুরু হবার সাড়ে তিন মাস পর জুলাইয়ে সেক্টর অধিনায়কদের এই প্রথম সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেও দেখা গেল, সংগঠন ও আক্রমণ ধারার ব্যাপারে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিকই, কিন্তু দখলদার বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করার মত কোন রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নির্দিষ্ট সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়নি। সম্মেলন নিয়মিত বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য 'আক্রমণ ধারার নির্দেশ' (Operations instruction), তৎপরতার কৌশল ও লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে কিছু সাধারণ আলোকপাত করতে সক্ষম হলেও তাকে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সামগ্রিক বিজয় লাভের উপযোগী পরিকল্পনা হিসাবে গণ্য করা যায় না।

রীতিগত (Conventional) যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিজয়োপযোগী রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অসুবিধা ছিল দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যের তুলনায় বাংলাদেশের

সেনাদলের সংখ্যা, সমরাস্ত্রের মান, সামরিক অবকাঠামো ও সাংগঠনিক দৈন্যতা। পক্ষান্তরে গেরিলা যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রধান অসুবিধা ছিল, দেশের ভিতরে রাজনৈতিক অবকাঠামোর অভাব তথা মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণের উপযোগী ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপস্হিতি। তা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে গেরিলা যুদ্ধে দখলদার সৈন্যদের কেবলমাত্র পরিশ্রান্ত ও দুর্বলই করা সম্ভব; তাই গেরিলা যুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায়ে পরিশ্রান্ত শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করার জন্য প্রয়োজন পড়ে বিরাট ও একত্রীভূত বাহিনীর চূড়ান্ত আঘাত- যেমন চীনের ছিল 4th Route Army অথবা দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েত- কং গেরিলা তৎপরতার সর্বশেষ পর্যায়ে ছিল উত্তর ভিয়েতনামের নিয়মিত বাহিনীর সাহায্য।

প্রত্যেক জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং কিছু সমস্যা থাকে। এগুলির বাস্তব সদ্ব্যবহার ও সমাধানের উপরেই নির্ভর করে সেই বিশেষ জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য ও ব্যর্থতা। রীতিগত ও গেরিলা- এই উভয়বিধ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের উপরোল্লিখিত সীমাবদ্ধতার দরুন এবং অন্যদিকে তাদের আপৎকালীন আশ্রয়দাতা ভারতের পক্ষে অনির্দিষ্টকাল যাবত শরণার্থীসৃষ্ট দুঃসহ চাপ মেনে চলার অক্ষমতা ও অসম্মতির ফলে বাংলাদেশকে মুক্ত করার একমাত্র বাস্তব উপায় ছিল: দেশের অভ্যন্তরে অনিয়মিত যুদ্ধে এবং সীমান্ত বরাবর ছোট ও মাঝারি সংঘর্ষে পাকিস্তানী সেনাদের যুদ্ধ- পরিশ্রান্ত করে তোলার পর ভারতীয় বিমান, নৌ ও স্হল বাহিনীর সহযোগিতায় চূড়ান্ত আঘাতের ব্যবস্হা করা। মে, জুন ও জুলাই মাসে তাজউদ্দিনের সঙ্গে এবং তাজউদ্দিনের পক্ষে বিভিন্ন বৈদেশিক মহলের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা চালাবার কালে আমার মনে কখনও এমন সংশয় দেখা দেয়নি যে তাজউদ্দিন এই রণনীতির বিকল্প অন্য কিছু সম্ভব বলে মনে করতেন। বস্তুত ভারত যাতে অপ্রতিহতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পারে এবং চূড়ান্ত লড়াইয়ের স্তরে, ভারতের সামরিক শক্তি যাতে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যকে ভারতের অনুকূলে আনা আলোচ্য সময়ে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ও করণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বহুলাংশেই ভিন্ন। মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং এবং বিশেষত নিয়মিত বাহিনীর দ্রুত

সংখ্যাবৃদ্ধি ও অস্ত্রসজ্জার জন্য ভারত সরকারের উপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিরলস। জুলাই মাসে তিনটি ব্যাটালিয়ানের সমবায়ে একটি ব্রিগেড গঠন এবং সেপ্টেম্বরে তিনটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাটালিয়ান গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় সম্পদ ও সহায়তা লাভের জন্য বাংলাদেশ মন্ত্রিসভাকে তিনি তৎপর রাখেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভারতীয় সহায়তার পরিধি সম্পর্কে দ্বিধান্বিত মনোভাব ওসমানীর রণনৈতিক পরিকল্পনা- সংক্রান্ত চিন্তাকে অস্বচ্ছ ও অসম্পূর্ণ করে রাখে। মে মাসে মন্ত্রিসভার সঙ্গে তিনি যখন দিল্লীতে আলাপ- আলোচনার জন্য যান, তখন সম্ভবত এই উপলব্ধিতে তিনি পৌঁছান যে, বাংলাদেশকে মুক্ত করার ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সম্ভাবনা অনুপস্হিত অথবা খুবই অনিশ্চিত।[৬৭] যদিও মে মাস থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শক্তি- সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং- এর জন্য ভারতীয় সহায়তা কিছু কিছু শুরু হয়, তবু জুন- জুলাইয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবস্হাপনায় বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসংগ্রামীদের মুক্তিযুদ্ধে নিয়োগের (Induction) ঘটনায় ওসমানী চিন্তিত বোধ করতে শুরু করেন। তা ছাড়া আলোচ্য সময়ে, ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের দুই নেতা লে. জেনারেল অরোরা এবং মেজর জেনারেল জ্যেকবের সঙ্গে কর্নেল ওসমানীর যোগাযোগ বাহ্যত সৌজন্যমূলক হলেও তা যে সব সময় সহজ ও পারস্পরিক আস্হাবর্ধনে সহায়ক হত, একথা বলার উপায় নেই। পরিস্হিতি বিশেষণে দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা এবং সমস্যা সমাধানে সাধারণ মতপার্থক্য ছাড়াও অপর পক্ষের প্রচ্ছন্ন পদমর্যাদা- সচেতন আচরণ ওসমানীর জন্য সম্ভবত পীড়াদায়ক হত। যতদূর জানা যায়, ভারতীয় বিএসএফ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ জাতীয় কোন সমস্যা তাঁর কখনো ঘটেনি। কিন্তু মে মাস থেকে বাংলাদেশের ব্যাপারে বিএসএফ- এর ভূমিকা দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে।

এই সব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা আত্মমর্যাদা- সচেতন ওসমানীকে কতখানি প্রভাবিত করে বলা কঠিন, তবে তাঁর সমর পরিকল্পনা- সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের ‘গেরিলা যুদ্ধ’ এবং সীমান্ত অঞ্চলে বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর সাহায্যে ‘মুক্ত অঞ্চল’ গড়ে তোলার লক্ষ্যকে অবলম্বন করে। কিন্তু নিয়মিত বাহিনী যেখানেই মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করুক, বিমান প্রতিরক্ষা, ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর অভাবে তার সুরক্ষা দুঃসাধ্য ছিল। অবশ্য অক্টোবরের শুরুতে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা ওসমানী নিজেই বাতিল করে দিয়ে

নিয়মিত বাহিনীর এক উল্লেখযোগ্য অংশকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা কৌশলে লড়াই করার জন্য নিয়োগ করতে শুরু করেন।[৬৮] এই গোপন তৎপরতা দেশের ভিতরে দখলদার বাহিনীকে যতই নাজেহাল করুক, কেবলমাত্র এই পন্থায়, বিশেষত রাজনৈতিক অবকাঠামো এবং সুসংগঠিত নেতৃত্ব-কাঠামোর অভাবে, দখলদার বাহিনীকে বৎসরকালের মধ্যে সম্পূর্ণ উৎখাতের চিন্তা ছিল অবাস্তবধর্মী। বাংলাদেশের সামরিক শক্তির এই মৌলিক অক্ষমতার ফলে দেশকে শত্রুমুক্ত করার বিঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে যে শূন্যতা (gap) বিরাজমান ছিল, তা পূরণ করার জন্য ভারতীয় সামরিক সহায়তাকে কোন নির্দিষ্ট রূপে, মাত্রায় ও সময়ে গ্রহণ করা দরকার তা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের সামরিক নেতৃত্বের।

রণনৈতিক পরিকল্পনায় এই মৌলিক অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতা ছাড়াও সীমান্তবর্তী নিয়মিত বাহিনী যখন অনেক কারণেই নিষ্ক্রিয়, সেই সময় অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট মাসে, ভারত সরকার ক্রমশ এই উপলব্ধিতে পৌঁছান যে, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সেনাদের সমূলে উৎখাত না করা পর্যন্ত শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য কোন বাস্তব উপায় নেই। কিন্তু মূলত নিজের প্রয়োজনেই তারা যখন বাংলাদেশের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রায় সম্মত, তখন সেই সুযোগ সদ্ব্যবহারের জন্য কোন পরিকল্পনা বা উদ্যোগ বাংলাদেশ সামরিক নেতৃত্বের পক্ষে গৃহীত হয় নাই।

জুলাই থেকেই ভারতের ঊর্ধ্বতন সামরিক নেতৃত্ব যখন সীমান্ত সংঘর্ষে (মূলত গোলন্দাজ আক্রমণে পাকিস্তানী বিওপি'র ধ্বংস সাধন অথবা মুক্তিফৌজ কর্তৃক বিওপি দখলে) ফল লাভের জন্য তাদের সীমান্তবর্তী বাহিনী, Formation Command-এর উপর চাপ বৃদ্ধি করতে শুরু করে, তখন ভারতীয় ফরমেশন কমান্ডারগণ বাংলাদেশ সেক্টর ইউনিটগুলিকেও সক্রিয় করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন। কার্যক্ষেত্রে এই ব্যগ্রতা সর্বদা ফলদায়ক হয়নি। বরং সেক্টরের করণীয় সম্পর্কে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমান্ডের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় স্বল্প অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেক্টর বাহিনী, বিশেষত তাদের অধিনায়কদের কারো কারো মনে এ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবত তারা 'কামানের খোরাক' হিসাবে ব্যবহৃত হতে চলছে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় সৈন্যের অধিনায়কদের মধ্যে ক্রমশ এই ধারণা গড়ে উঠতে থাকে যে, বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনী নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধিতেই অধিক আগ্রহী, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তাদের জন্য

অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্হায় আগস্ট- সেপ্টেম্বরে ভারত যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বতোভাবে জড়িত হয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে প্রবল বলে গণ্য করে, তখন বাংলাদেশের ভিতরে সশস্ত্র তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক হারে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণ করার উপর সকল গুরুত্ব আরোপ করলেও নিয়মিত বাহিনীর সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। ফলে ক্রমবর্ধমান সীমান্ত লড়াই ও চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মুখ্যত নিজেদের শক্তি ও সম্পদই ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের পরিবর্তনমান সমর পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। এমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধের মূল সামরিক পরিকল্পনা ও পরিচালনা বাংলাদেশ কমান্ডের হাত থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে শুরু করে।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও ভিন্নতর প্রত্যাশা অবাস্তব ছিল। যদিও ২৫শে মার্চে পাকিস্তানী আক্রমণের জবাবে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্ত গণযুদ্ধের ব্যাপকতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তবু সেই সংগ্রামকে পরিচালনার মত না ছিল সেখানে কোন সুশৃঙ্খল বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন, না ছিল মাও, টিটো বা গিয়াপের মত কোন বিপ্লবী রাজনৈতিক- সামরিক প্রতিভার উপস্হিতি। অন্যদিকে ভারতের ক্ষমতাশীল ধনিক গোষ্ঠী ও দক্ষিণপন্থীমহল অনন্যোপায় হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করায় সম্মত হলেও, তারা এই সংগ্রামের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ছিল সজাগ ও সচেষ্ট। এই অবস্হায় তবুও চলে, তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বামপন্থী (এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র) অংশ উদ্ভূত বৈপ্লবিক পরিস্হিতি এবং তার ভূরাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক পরিমাণে সক্ষম হন। বাংলাদেশের সামরিক নেতৃত্বের উদ্যোগ ও আচরণে এ জাতীয় রাজনৈতিক উপলব্ধির কোন নিদর্শন পাওয়া দুষ্কর ছিল। বরং বলতে হয়, নিয়মিত বাহিনীর অধিকাংশ সেক্টর কমান্ডার পেশাদার বাহিনীর মাঝারি ও কনিষ্ঠ অফিসারসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা নিয়ে এক বিদ্রোহজনিত পরিস্হিতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন অথবা পরে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। এদের সংগঠনের ধরনধারণ, যুদ্ধের কলাকৌশল, মনস্তাত্বিক গঠন- প্রায় সবই ছিল রীতিগত যুদ্ধের (Conventional war) উপযোগী। কাজেই এত স্বল্প সময়ের মধ্যে রীতিবহির্ভূত যুদ্ধ (Unconventional war) পরিচালনার মত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কলাকৌশল আয়ত্ত করা যেমন এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি রীতিগত যুদ্ধে এদের চাইতে কয়েকগুণ বেশী শক্তিশালী, কয়েকগুণ বেশী সমরাস্ত্র সজ্জিত এবং

কয়েকগুণ বেশী সুনিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এদের কাছ থেকে চূড়ান্ত সাফল্য প্রত্যাশা করাও সংগত হত না।

তদুপরি ছিল এদের অজস্র সমস্যা। কমান্ড, যোগাযোগ ও সরবরাহের পূর্বোল্লিখিত সমস্যাবলী বাদেও অফিসারের স্বল্পতাজনিত সমস্যা ছিল খুবই তীব্র। বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ, দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ এবং তাদের সাথে ন্যূনতম যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজন তাদের সমস্যার কলেবর বৃদ্ধি করে। এর পরেও তাদের উপর দায়িত্ব পড়ে নিয়মিত বাহিনীর আয়তন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি করার। জুলাই মাসে মেঘালয়ের তুরা অঞ্চলে ১-ইবি, ৩-ইবি এবং ৮-ইবি-এই তিন ব্যাটালিয়ানের সমবায়ে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে যে ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়, তার মূল পরিকল্পনা ছিল কর্নেল ওসমানীর। শুরুতে সব কটি ব্যাটালিয়ানের লোকবল ছিল কম। ত্রিপুরা রাজ্যে দুটি পৃথক সেক্টরের একটিতে মেজর শফিউল্লাহ ছিলেন ২-ইবির দায়িত্বে এবং খালেদ মোশাররফ ৪-ইবির দায়িত্বে। এই তিনজনের কারোরই একক দায়িত্বে ব্যাটালিয়ান পরিচালনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। এই পাঁচটি ব্যাটালিয়ানের প্রতিটিরই সৈন্য সংখ্যা প্রয়োজনীয় লোকবলের (৯১৫ জন) তুলনায় ছিল অনেক কম, কোন কোন ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশেরও কম। ফলে পুরাতন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে ইপিআর আনসার এবং কিছু নতুন রিক্রুট যোগ করে এই ব্যাটালিয়ানগুলির সৈন্যবল বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

লোকবল ছাড়াও এই পাঁচটির সব কটি ব্যাটালিয়ানেই অফিসারের স্বল্পতা ছিল প্রকট সমস্যা। একটি ব্যাটালিয়ান পরিচালনার জন্য যেখানে ১৫/১৬ জন অফিসার প্রয়োজন সেখানে বাস্তবক্ষেত্রে অফিসার ছিলেন অর্ধেকেরও কম। এই অফিসার-ঘাটতি পূরণের জন্য জুলাই মাস থেকে তিন মাস দীর্ঘ এক সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন ৬০ জন অফিসার তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবস্হার উন্নতি ঘটে সামান্যই। কেননা 'তুরা ব্রিগেড' গঠনের পর পরই ত্রিপুরার অপর দুই সেক্টর থেকে 'জেড-ফোর্সের' অনুরূপ দুটি ব্রিগেড তথা 'কে-ফোর্স' এবং 'এস-ফোর্স' গঠনের জন্য তীব্র চাপ সৃষ্টি হয়। ঊর্ধ্বতন কমান্ড এই দাবী অনুযায়ী তিনটি নতুন ব্যাটালিয়ান গঠন এবং তিনটি আর্টিলারী ব্যাটারী গঠনের আবশ্যকতা জোরেশোরেই ব্যক্ত করেন। এই সব দাবীর প্রেক্ষিতে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার এই সব

নতুন সংযোজনের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিতকরণে সহায়তা লাভের জন্য পুনরায় ভারত সরকারের দ্বারস্থ হন।

সাধারণ অবস্থার একটি নতুন ব্যাটালিয়ানের রিক্রুটিং- এ প্রায় ছ'মাসের মত সময় লাগে এবং ট্রেনিং- এ সময় লাগে আরও প্রায় এক বছর। সেখানে মাত্র দু'মাসের মধ্যে নতুন তিনটি ব্যাটালিয়ান রিক্রুট ও যুদ্ধোপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা অত্যন্ত অবাস্তব ছিল। ফলে নভেম্বরের মাঝামাঝি যখন এই তিন ব্যাটালিয়ানকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার কথা, তখন বাস্তবক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করতে দেখা যায়। খালেদ মোশাররফের উপর দায়িত্ব ছিল ১০- ইবি এবং ১১- ইবি গঠনের। ১৫ই নভেম্বর নাগাদ ১০- ইবির জন্য প্রায় ৭০০ এবং ১১- ইবির জন্য ৭০০ জনের কিছু বেশী সৈন্য হাজির করা হয়। ৯- ইবি গঠনের দায়িত্ব ছিল সফিউল্লাহর উপর কিন্তু ১৫ই নভেম্বরে পাওয়া গেল সম্ভবত ৩০০ জনের মত সৈন্য। সিলেট জেলা থেকে বাকীদের সংগ্রহ করে আনার প্রতিশ্রুতি ওসমানী স্বয়ং দিয়েছিলেন। সিলেটের শত্রু অধিকৃত এলাকা থেকে বাকীদের হাজির করা হলো ২০শে নভেম্বরের দিকে, কিন্তু দেখা গেল তাদের বেশীরভাগই প্রায় আনাড়ি। এই তিনটি ব্যাটালিয়ান গঠন করার ফলে মুক্তিযুদ্ধ সবিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে এমন দাবী করার উপায় নেই। বরং একের পর এক এই সব অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অধিকাংশ সেক্টর অধিনায়কেরই যতটুকু বা লড়াইয়ের ক্ষমতা ছিল, তা নিঃশেষিত হতে থাকে।

দেশকে শত্রুমুক্ত করার কোন সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নয়, অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আক্রমণ ধারাকে উন্নত করে মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, বরং প্রতীয়মান হয় প্রধানত নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির তাগিদেই নিয়মিত বাহিনীর আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তুরায় প্রথম ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্ত কতখানি যুক্তিসংগত ছিল তা পর্যালোচনা করলে অবস্থাটা আরও কিছু পরিষ্কার হয়। জুলাই মাসে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে এই ব্রিগেড গঠনের পিছনে তিন ধরনের চিন্তা পাশাপাশি বিরাজমান ছিল। ওসমানীর পরিকল্পনা ছিল এই ব্রিগেডের সাহায্যে সীমান্তের নিকটবর্তী কোন বড় এলাকা শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি নিরাপদ 'অবস্থান অঞ্চল' (lodgement area) গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে আংশিক বা পুরোপুরিভাবে শত্রুমুক্ত করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা যদি সত্যই

পাওয়া যায়, তবে সে আক্রমণের পুরোভাগে বাংলাদেশের অন্যূন একটি নিয়মিত ব্রিগেড রাখা আবশ্যক বলে বাংলাদেশের নেতৃত্বের অনেকেই মনে করতেন। তৃতীয় চিন্তা ছিল, স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে সম্প্রসারিত করার। প্রত্যেকটি চিন্তা অবশ্যই ছিল বিতর্কমূলক। প্রথমটি তো বটেই। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রধান সেনাপতি ওসমানী নিজেই তাঁর 'Ops plan'-এ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান: "যে কাজের জন্য ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিল, তা অর্জনের ক্ষেত্রে এ যাবত ব্রিগেডকে ব্যবহার করা যায়নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও করা যাবে বলে মনে হয় না।" পরিবর্তিত পরিকল্পনায় ওসমানী তাই স্থির করেন: "বর্তমানে যেহেতু ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়ানের উপযোগিতা অতি নগণ্য, সেহেতু নিয়মিত বাহিনীকে বরং কোম্পানী/প্লেটুন গ্রুপে বিভক্ত করে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতার জন্য নিয়োগ করা উচিত।"[৬৯] অথচ এর মাত্র দু'সপ্তাহ আগে আরো দুটি বিগ্রেড গঠনের জন্য সম্পূর্ণ নতুন তিনটি ব্যাটালিয়ান গঠন ও প্রস্তুত করার কাজ তাঁর জোরাল সমর্থনের ফলেই শুরু হয়ে গেছে। কাজেই এ কথা বলার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীর সম্প্রসারণ মুক্তিযুদ্ধের কোন সুচিন্তিত রণনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সম্পন্ন হয়েছিল। যে কারণেই এই সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকুক, তাকে কার্যকর করতে গিয়ে অন্তত কয়েকটি অঞ্চলের সেক্টর অধিনায়কদের লড়াইয়ের ক্ষমতা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায়।

কেবল ভরসা ছিল এই যে, আলোচ্য সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সশস্ত্র ছাত্র ও তরুণদের বিকাশ ঘটতে থাকে আশাব্যঞ্জকভাবে। গোপন আক্রমণের নিত্য নতুন কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ পাকিস্তানী সেনাদের গর্বিত মনোবল ও শৌর্যের দম্ভকে ক্রমাগত আঘাত করে যেতে থাকে। পাকিস্তানের সমরোন্মত্ত সৈনিকেরা সীমান্তে ও অভ্যন্তরে ক্রমশ শ্রান্ত ও হতোদ্যম হয়ে উঠতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের অদৃশ্য আঘাতে আঘাতে।

কিন্তু ব্যাপক সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিতকরণ যে সব রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক শক্তি সমাবেশের ফলে সম্ভব হয়েছিল, পুনরায় সে আলোচনায় ফিরে যাওয়া যায়।

অধ্যায়- ৯: জুলাই - আগষ্ট

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে কিসিঞ্জারের ভারত সফর এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে ইসলামাবাদ হয়ে তাঁর গোপন চীন পরিক্রমার সংবাদ ১৫/১৬ই জুলাই প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পর এই সব ঘটনার সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ- আলোচনার উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিন আমাকে দিল্লী যেতে বলেন। ছয় সপ্তাহের ব্যবধানে দিল্লীর আবহাওয়া বহুলাংশে পরিবর্তিত। কিসিঞ্জারের গোপন পিকিং সফর এবং ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফর- সংক্রান্ত ঘোষণার পর উপমহাদেশের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করে, দক্ষিণ ও বাম নির্বিশেষে দিল্লীর ক্ষমতার অলিন্দ তখন ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, চিন্তিত, সন্দিহান অথবা উত্তেজিত। এক অপ্রত্যাশিত ভালো সংবাদ পাওয়া গেল ১৯শে জুলাই সন্ধ্যায়। পি. এন. হাকসার আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে যথাশীঘ্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং এই প্রসঙ্গে জানান, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে শীঘ্রই তাদের 'এক বড় রকমের সমঝোতা' আশা করা যায়।

পরদিন ২০শে জুলাই কোলকাতা ফিরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে সংবাদটি দেওয়ার পর এ বিষয়ে আলোচনাকালে আমরা উভয়েই পরিস্থিতির এক গুণগত উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে একমত হই। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ব্যাপারে ভারতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক সামরিক ভারসাম্যকে ভারতের অনুকূলে আনা এবং তদুদ্দেশ্যে ভারত- সোভিয়েট সমঝোতা প্রতিষ্ঠাই ছিল পূর্ববর্তী দুই মাসে আমাদের গোপন দেন- দরবারের মূল লক্ষ্য। অব্যাহত শরণার্থী স্রোত, উদ্ভূত সঙ্কটের রাজনৈতিক মীমাংসার প্রশ্নে পাকিস্তানী অনমনীয়তা, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় কিসিঞ্জারের চীন সফর এবং সম্ভাব্য চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের সীমান্ত রক্ষায় পূর্বতন মার্কিন প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার হওয়ার ফলে আমাদের সেই প্রচেষ্টা অসামান্যভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যাসন্ন ভারত- সোভিয়েট সমঝোতার বিষয়বস্তু ও পরিধি এবং বিশেষত এর ফলে পাক- চীন আক্রমণ আশঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের নিরাপত্তাবোধই কেবল উন্নত হবে, না বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক অর্থে তা ব্যবহার করা সম্ভব হবে তদ্‌মর্মে

নির্দিষ্ট তথ্যাদি তখনও অজানা। তবু ২০শে জুলাইয়ের বৈঠকে আমরা উভয়ে একমত হই যে, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের জন্য তখন থেকেই সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা যেতে পারে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত শিলিগুড়ি সম্মেলনে মন্ত্রিসভার অনুসৃত নীতি সম্পর্কে গণপ্রতিনিধিদের সর্বসম্মত আস্থা অর্জনের দরুন তাজউদ্দিন স্বাভাবতই মনে করেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার কোন বাধা নেই। তবে প্রত্যাশিত ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সরকারীভাবে জ্ঞাত হওয়ার পরেই এ বিষয়ে মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যের মনোভাব আলাদা আলাদাভাবে পর্যালোচনা করে দু'জনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি কমবেশী উদ্বেগ প্রকাশ করেন- কম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এবং বেশী পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ সম্পর্কে।

সাধারণভাবেই এরূপ মোর্চা গঠনের প্রস্তাব আওয়ামী লীগের অনেকের কাছে তখনও যথেষ্ট অপ্রিয়। তদুপরি সৈয়দ নজরুলের আত্মজ 'মুজিব বাহিনীর' একজন উৎসাহী সদস্য হওয়ায় এবং বামপন্থী দলসমূহ ও তাজউদ্দিন সম্পর্কে 'মুজিব বাহিনীর' বিরুদ্ধতা অতিশয় সুস্পষ্ট থাকায়, ঐক্যফ্রন্ট গঠন বিষয়ে?সৈয়দ নজরুলের আপত্তি নিতান্ত কম ছিল না। অন্যদিকে খোন্দকার মোশতাকের সম্ভাব্য আপত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল বলে অনুমান করা হয় এ কারণেই যে, আওয়ামী লীগের মধ্যে দক্ষিণপন্থী হিসাবে তাঁর ভূমিকা বরাবরই সুস্পষ্ট। তৎসত্ত্বেও ক্ষীণ একটি আশার আলো আমরা দেখতে পাই। তাজউদ্দিনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হিসাবে, এবং বিশেষত প্রধানমন্ত্রিত্বের পদকে কেন্দ্র করে তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে বৈরিতাবোধ খোন্দকার মোশতাকের প্রবাসের জীবনকে বহুলাংশে কর্মভারাক্রান্ত করে রাখত। সে কারণে এবং অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল প্রয়োজনীয় সোপান অতিক্রম করার বাস্তব বুদ্ধি তাঁর সহজাত ছিল বলে ভারত সরকারের আস্থা উদ্রেকের স্বার্থে বামপন্থীদের সাথে মোর্চা গঠনের মত অশাস্ত্রীয় কাজও তিনি সমর্থন করে ফেলতে পারেন বলে আমাদের মনে হয়। বস্তুত খোন্দকার মোশতাকের এই বাস্তবতাবোধের নির্ভুল সদ্ব্যবহারের উপর জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের গঠন ছিল নাজুকভাবে নির্ভরশীল। তাঁকে যদি ঐক্যফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্তে শামিল না করা যায়, তবে ফ্রন্ট গঠন দূরের কথা, মুজিব বাহিনী, আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মীদের দলীয়মন্যতা এবং বিভিন্ন উপদলীয় স্বার্থের মিলিত আবর্তে

খোদ আওয়ামী লীগের জন্যই এক বিরাট সাংগঠনিক সঙ্কটের সৃষ্টি অসম্ভব ছিল না। এই যুক্তিতে এবং তাঁদের উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তাজউদ্দিন আমার ওপর এই অস্বস্তিকর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন, বস্তুত আমার সম্মতির অপেক্ষা না- করেই।

এদিকে ঠিক একই সময়ে, অর্থাৎ জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উপমহাদেশীয় নীতি নানাবিধ স্তরে উন্মোচিত হতে শুরু করে, যেগুলি কার্যকর হলে বাংলাদেশের সদ্যপ্রসূত স্বাধীনতা সম্ভবত সূতিকাগৃহেই নিশ্চিহ্ন হত। বস্তুত পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে দেখা যায়, পূর্ব বাংলার মানুষের নির্বাচনী রায় সামরিক পন্থায় নস্যাৎ করার জন্য জানুয়ারী থেকে পাকিস্তানী জান্তা যে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল, সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র অনেক কিছুই অবহিত ছিল এবং এ ব্যাপারে আপত্তি না করে পরোক্ষভাবে জান্তাকে সমর্থন করে যাওয়াই তাদের সরকারী নীতি ছিল।[৭০] মার্চে শেখ মুজিবের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কয়েক- দফা বৈঠকের ঘটনা থেকেও অনুমান করা যায় যে, এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল না। মার্চ- এপ্রিলের অনুসৃত মার্কিন নীতির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করার ফলে নিজেদের ঢাকাস্থ কনসাল জেনারেল আর্চার বাডকে এপ্রিল মাসে রাতারাতি বদলী করে মার্কিন সরকার জান্তার অভিযানের প্রতি তাঁদের গোপন সমর্থনের কথা প্রকাশ করেন। জুনে তাদের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয় পাকিস্তান জান্তার জন্য 'যুদ্ধাস্ত্রের যন্ত্রাংশ' সরবরাহ করে। এরপর জুনের শেষে ও জুলাইয়ের প্রথমার্ধে মাত্র ৩/৪ হাজার ছাত্র- যুবক ন্যূনতম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে সেখানে আভ্যন্তরীণ শক্তির ভারসাম্য যখন দ্রুত দখলদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত হতে শুরু করে তখন মার্কিন পর্যবেক্ষকদের জন্য তার তাৎপর্য খাটো করে দেকার অবকাশ ছিল না।[৭১]

জুলাইয়ের শেষার্ধে ও আগস্টের প্রথম দিকে মার্কিন সরকারের বাংলাদেশ বিরুদ্ধতার কার্যক্রম মোটামুটি চারটি স্তরে অনুসৃত হতে দেখা যায়: (১) গণহত্যার শুরু থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর জন্য মার্কিন যুদ্ধাস্ত্র, গোলাবারুদ ও যন্ত্রাংশের যে সরবরাহ শুরু হয়, মার্কিনী পররাষ্ট্র দফতরের অস্বীকৃতি এবং মার্কিনী জনপ্রতিনিধি ও জনমতের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এক অদ্ভুত যুক্তিতে তা অব্যাহত থাকে।[৭২] (২) মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য প্রদান থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে ভারতের উপর যে বহুমাত্রিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তারই অংশ হিসাবে ১৭ই জুলাই কিসিঞ্জার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে চীনের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপের মুখে ভারতকে রক্ষা করার

অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। (৩) মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্ত পারাপার এবং দেশের অভ্যন্তরে তাদের গতিবিধি ও তৎপরতার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও আমেরিকার উৎসাহের কোন ঘাটতি ছিল না। পূর্ব বাংলার সীমান্তে 'সাহায্য ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ' হিসাবে ১৫৬ জন 'পর্যবেক্ষক' মোতায়েন করার ব্যাপারে জাতিসংঘকে সম্মত করানোর কাজ আমেরিকার 'আগ্রহ ও ব্যয়ভার গ্রহণে সম্মতির' ফলেই সম্ভব হয়।[৭৩] এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা রোধ করার জন্য এমন কিছু কিছু উদ্যোগের আভাস পাওয়া যায়, যাতে আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের সূচনাপর্বের স্মৃতি জাগ্রত হয়। পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্য আনা- নেয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন সহায়তা চলছিল এক রকম প্রকাশ্যেই।[৭৪] কিন্তু তাদের গোপন সহায়তার উদ্যোগ ছিল আরও মারাত্মক। যেমন সিনেটর কেনেডী প্রকাশ করেন, ভিয়েতনাম ও ব্রাজিলে গেরিলাবিরোধী তৎপরতায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মার্কিনী 'পুলিশ- বিশেষজ্ঞ' রবার্ট জ্যাকসনকে 'প্রয়োজনীয় পুলিশ টিম'সহ ঢাকাস্থ টঝঅওউ নিয়োগ করতে চলেছে।[৭৫] (৪) প্রবাসী সরকারের একাংশের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভিতর থেকে বিভক্ত ও লক্ষ্যচ্যুত করার মার্কিনী কার্যক্রম সম্ভবত এ সময় অথবা এর কিছু আগে থেকে শুরু।[৭৬] কিসিঞ্জার তাঁর স্মৃতিগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার তারিখ যদিও ৩০শে জুলাই বলে উল্লেখ করেছেন,[৭৭] তবু কথিত যোগাযোগকারীর নাম, যোগাযোগের সময় ইত্যাদি যথারীতি প্রকৃত যোগাযোগ ও কার্যকলাপ গোপন করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। যথাস্থানে এই প্রসঙ্গে ফিরে আসার সুযোগ উন্মুক্ত রেখে আপাতত এটুকুই বলা যায়, প্রবাসী সরকারের দক্ষিণপন্থী অংশের সহযোগিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল ও দ্বিখণ্ডিত করে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ সম্ভবত তখনই জোরদার করা হয়েছিল, যখন জুলাইয়ে কিসিঞ্জারের চীন সফরের পর ভারতের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আমেরিকার প্রভাব- প্রতিপত্তি সবিশেষ হ্রাস পায় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহায়তা বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই অন্তর্ঘাতী প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হয় ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর।

এমনিভাবে নিক্সন প্রশাসন ইয়াহিয়া- জান্তার পক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠার পর এবং বিশেষ করে, চৌ- কিসিঞ্জার আলোচনাকালে পাকিস্তানকে সমর্থন করার ব্যাপারে উভয় পক্ষের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর,[৭৮]

দখলকৃত এলাকার উপর পাকিস্তান নগ্ন ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত করার আয়োজন শুরু হয়। ইয়াহিয়া নিযুক্ত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' প্রস্তাবিত নতুন শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষার জন্য আরবী হরফ ব্যবহার করার, পূর্ব পাকিস্তানকে দুই থেকে চারটি নতুন 'প্রদেশে' বিভক্ত করে পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের সর্ববহৎ প্রদেশের মর্যাদা দেবার এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করার সুপারিশ করে।[৭৯] এ অঞ্চলের ওপর সাংস্কৃতিক দখলকে চূড়ান্ত করার জন্য প্রশাসনিক পর্যায়ে ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাস প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ইতিহাস বিজড়িত ঢাকার অনেক পথ- ঘাটের নামের 'ইসলামীকরণ' সম্পন্ন হয়।[৮০] জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত যথাক্রমে ৭৯ ও ১৯৪ জন আওয়ামী লীগ সদস্যদের নাম অন্যায়ভাবে বাতিল করে শুরু হয় গণধিকৃত দলগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টির উদ্যোগ। পূর্বাঞ্চলের এই নগ্ন ঔপনিবেশিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সামপ্রদায়িক দলগুলির কর্মীদের সমবায়ে গঠিত 'রাজাকার বাহিনী' সন্ত্রাস ও নিপীড়নের মূলযন্ত্রে পরিণত হয়। জুলাইয়ে সশস্ত্র রাজাকারের সংখ্যা দাঁড়ায় বাইশ হাজার,[৮১] দেশে ফেরৎ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা যখন চার হাজারের মত।

সশস্ত্র রাজাকারের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে এর গুরুতর তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের প্রথম সজাগ করে তোলে আমাদের ঢাকাস্থ তথ্য গ্রুপ। মার্চে পাকিস্তানী হামলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কিছু রাজনীতি- সচেতন ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ সহায়তার কাজে সংঘবদ্ধ হন। এরূপ গোপন সহায়তার উদাহরণ দেশে আরো অনেক থাকলেও, একটি কারণে ঢাকা তথ্য গ্রুপের অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ঢাকা থেকে এই গ্রুপ নির্ভরযোগ্য নানা তথ্য দক্ষতার সাথে সংগ্রহ করে গড়ে তিন সপ্তাহে একবার আমার কাছে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন। মোখলেসুর রহমান, তাঁর স্ত্রী রোজ'বু, জিয়াউল হক, আনোয়ারুল আলম, আতাউস সামাদ, জহিরুল ইসলাম, রহমত উল্লাহ এবং আরো কয়েকজন এই গ্রুপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং প্রশংসনীয় নির্ভুলতার কারণে তাদের পাঠানো তথ্যাদি ও সমীক্ষা প্রধানমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাদির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজাকার বাহিনীর দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে জামাতে ইসলাম প্রভৃতি দলগুলির 'আদর্শগত উদ্দীপনা' ছাড়াও, নিয়মিত ভাতা, রেশন, স্থানীয় ক্ষমতার ব্যবহার এবং সর্বোপরি হিন্দু সমপ্রদায় ও আওয়ামী লীগ

সদস্যদের ঘরবাড়ী ও বিষয়- সম্পত্তি অবাধে লুটপাট ও ভোগদখল করার সুযোগ ছিল যোগদানকারীদের জন্য বিরাট আকর্ষণ। রাজাকার বাহিনীর তুলনামূলক সংখ্যাধিক্য, অস্ত্রশস্ত্রের সুবিধা এবং দ্রুত চলাচল ক্ষমতার দরুন এদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সীমিত অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশ বেশ বেকায়দায় পড়ে। 'শান্তি কমিটির' গোপন চর ও রাজাকারদের দৌরাত্ম্য [৮২] এবং পাকিস্তানী বাহিনীর নির্বিচার প্রতি- আক্রমণের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের চমকপ্রদ তৎপরতা মাত্র ৫/৬ সপ্তাহের মধ্যেই হ্রাস পেতে শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধের এই অধোগতি রোধ করার জন্য আগস্টের প্রথম দিকে তাই কয়েকটি বিষয়ের পুনর্বিবেচনা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। প্রথমত, মে মাসে নিয়মিত বাহিনী বাদে সর্বমোট যে কুড়ি হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দানের সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, তা বাস্তব প্রয়োজনের আলোকে দ্রুত বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের অস্ত্রসজ্জার মান উন্নত করার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানী চরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং রাজাকার বাহিনীর প্রতি- আক্রমণ এড়িয়ে সশস্ত্র তৎপরতা চালাবার জন্য ব্যাপক সংখ্যায় শরণার্থী রাজনৈতিক কর্মীদের ফেরৎ পাঠানো এবং তাদের সহায়তায় দেশের ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ ঘাঁটি গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। তৃতীয়ত, রিক্রুটের নীতি দলীয় আনুগত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে যোদ্ধা তরুণদের সংগ্রামী যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত গুণাগুণের ভিত্তিতে অনুসরণ করার প্রয়োজন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ ব্যবস্থাপনার এই সব জরুরী প্রয়োজন কিভাবে বা কত তাড়াতাড়ি মেটানো যাবে, সে সম্পর্কে অবশ্য কোন পরিষ্কার ধারণা গঠন আগস্টের প্রথম অবধি আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আলোচ্য সময়ে পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের নব প্রাণ সঞ্চার এবং সীমান্তে মুক্তাঞ্চল গঠিত হওয়ার আশঙ্কায় পাকিস্তান একদিকে যেমন ছিল উদ্বিগ্ন, তেমনি অপরদিকে ছিল চীন- মার্কিন আঁতাতের সম্ভাব্য কার্যকারিতায় আশান্বিত। এই দুই বিপরীতমুখী সম্ভাবনার মাঝে পাকিস্তানী জান্তা জুলাইয়ে সম্ভবত এমন সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌঁছায় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে উত্তরোত্তর বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার পরিবর্তে বরং আরেক- দফা পাক- ভারত যুদ্ধ শুরু করা অধিক যুক্তিযুক্ত।[৮৩] জুলাইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে কিসিঞ্জার ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে পাকিস্তান কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা এবং সেই যুদ্ধে চীনের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক

করে দেওয়ার পর, ১৯শে জুলাই, ৩০শে জুলাই এবং ৪ঠা আগস্ট মোট তিন- দফায় ভারতের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার যুদ্ধংদেহী ঘোষণা যেমন শূন্যগর্ভ ছিল না, তেমনি আসন্ন যুদ্ধে ‘পাকিস্তান একা থাকবে না’[৮৪] এই মর্মে তার সতর্কবাণীও তাৎপর্যহীন ছিল না। যুদ্ধোপযোগী ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ সাপেক্ষে শরৎকাল ছিল পাকিস্তানের যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রকৃষ্ট সময়। এর কারণ- প্রথমত, বাংলাদেশে সফল অভিযান চালাবার মত সামরিক অবকাঠামো নির্মাণ অথবা সৈন্য সমাবেশ তখনও ভারত সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি; দ্বিতীয়ত, শরৎকালে অসংখ্য খাল- বিল- নদীনালা পরিকীর্ণ পূর্ব বাংলা প্রতিরক্ষা যুদ্ধের পক্ষে আদর্শ স্থানীয় বলে এ সময়ে ভারতের পক্ষে দ্রুত ও চূড়ান্ত সামরিক বিজয় সাধন ছিল প্রায় অসম্ভব; এবং তৃতীয়ত, ভারত- তিব্বত সীমান্তের সকল গিরিপথ বরফমুক্ত থাকায় পাকিস্তানের মিত্ররাষ্ট্র চীনের ভারতবিরোধী অভিযানের পথে কোন বড় অন্তরায় ছিল না। শরৎকালীন যুদ্ধে বিপর্যয়ের ঝুঁকি নগণ্য বিধায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতাকে এক বৃহত্তর পাক- ভারত যুদ্ধে নিমজ্জিত করা, আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ‘পূর্ব পাকিস্তানের’ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাকিস্তানী প্রবণতা আগস্টের প্রথম সপ্তাহ অবধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু শরৎকালীন যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানের এই প্রবণতা বিঘ্নিত হয় সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁন্দ্রে গ্রোমিকোর আকস্মিক দিল্লী সফর এবং ৯ই আগস্টে ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে।

অধ্যায়- ১০: আগষ্ট

পরবর্তীকালে কিসিঞ্জার নিজে ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তির সংবাদকে 'bombshell' হিসাবে অভিহিত করেছেন।[৮৫] সেই চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা কেবল যে বহির্বিশ্বের কাছেই অভাবনীয় ছিল তা নয়, এমনকি ভারতের খোদ ক্ষমতাসীন মহলেও এ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা যাদের ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। ভারতের মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্যরাও (রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির গুটিকয় সদস্য বাদে) এই চুক্তির বিষয় জানতে পারেন চুক্তি স্বাক্ষরের দিন সকালে। জুলাইয়ে পাকিস্তানের সহায়তায় চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের নিরাপত্তাহীনতাবোধ যখন চরমে পৌঁছে তখন ভারতীয় মন্ত্রিসভার ‘রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি’ দু’বছরের পুরাতন এক খসড়াকে

ভিত্তি করে ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৮৬] ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে উসুরী নদী বরাবর চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতসহ কয়েকটি এশীয় দেশের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়। এই উদ্দেশ্যে মস্কোতে এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহে দু'বার, বুধ ও শনিবারে, ভারত ও সোভিয়েট প্রতিনিধিদের নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হত।[৮৭] কিন্তু ঐ আলোচনার সময়ে ইয়াহিয়া সরকার পেশোয়ারের অদূরে বাদবেরে মার্কিন ঘাঁটির চুক্তি নবায়ন না করায় সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে কিছু সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহে সম্মত হয়। অংশত এর ফলে প্রস্তাবিত মৈত্রীচুক্তি সম্পর্কে ভারতের আগ্রহ হ্রাস পায় এবং আলোচনায় ছেদ পড়ে। ১৯৬৯ সালের আলোচনায় ভারতের পক্ষে অংশগ্রহণকারী ছিলেন তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডি. পি. ধর। কাজেই 'রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির' সিদ্ধান্তের পর তিনিই পুনরায় নিযুক্ত হন মৈত্রীচুক্তির সেই পুরাতন খসড়াকে পরিবর্তিত প্রয়োজনের আলোকে চূড়ান্ত করার দায়িত্বে।

স্বাক্ষরিত মৈত্রীচুক্তির সমূহ গুরুত্ব ছিল এর নবম ধারায়। এই ধারা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ দুই দেশের কারো বিরুদ্ধে যদি বহিঃআক্রমণের বিপদ দেখা দেয়, তবে এই বিপদ অপসারণের জন্য উভয় দেশ অবিলম্বে 'পারস্পরিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে' এবং তাদের 'শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে'। পাকিস্তান ও চীন উভয়ের জন্যই এই ঘোষণার মর্ম ছিল অতিশয় প্রাঞ্জল এবং সম্ভাব্য শরৎকালীন অভিযানের পথে প্রতিবন্ধক।[৮৮] পাকিস্তান ও চীনের আসন্ন আক্রমণ সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এই চুক্তির উপযোগিতা অসামান্য হলেও এর পিছনে ভারতের পক্ষে সম্ভবত আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা সক্রিয় ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করার কোন এক পর্বে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল না এবং এই আশঙ্কাবোধ থেকে ভারত নিশ্চিত হতে চেয়েছে যাতে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রারম্ভে বা মাঝপথে সোভিয়েট সামরিক সরবরাহ মন্থর বা বন্ধ না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যদি পূর্বতন স্থিতাবস্থা বজায়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করতে উদ্যত হয়, তবে সেখানেও যাতে সোভিয়েট ভূমিকা ভারতের পক্ষে নিশ্চিতভাবেই সহায়ক থাকে। মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর এই সব প্রতিরক্ষামূলক চিন্তাভাবনা ছাড়াও ভারতের নীতি-নির্ধারকদের মনে ক্রমশ এই আস্থার সঞ্চার ঘটে যে, নিজেদের সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন

করার পর- এবং শীতকালে উত্তরের গিরিপথগুলি তুষারাবৃত হওয়ার ফলে চীনা তৎপরতার আশঙ্কা সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ার পর - সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানী দখলের অবসান ঘটিয়ে শরণার্থীদের সেখানে ফেরৎ পাঠানো সম্ভব।

কিন্তু আগস্টে ভারতের এ জাতীয় প্রত্যাশার প্রতি রাশিয়ার যে সম্মতি ছির তা বলার উপায় নেই। বরং বিশ্ব শক্তি হিসাবে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি মৈত্রীচুক্তি সম্পর্কে কিছুটা আলাদা থাকাই ছিল স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ক্ষমতায় আসার পর ১৯৬৯ সাল থেকে বৃহৎশক্তি পর্যায়ে উত্তেজনা হ্রাস প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এবং বিশেষত 'SALT – 1' মারণাস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনায় উভয় পক্ষের স্বার্থ অসামান্যভাবে জড়িত থাকায় সোভিয়েট মার্কিন পারস্পরিক সম্পর্ককে মূলত একটি আঞ্চলিক ইস্যুতে পুনরায় উত্তেজনাময় করে তোলার ইচ্ছা সম্ভবত কোন পক্ষেরই ছিল না। তা ছাড়া আঞ্চলিক পর্যায়ে তাসখন্দ চুক্তির মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসাবে রাশিয়া, পাকিস্তানী জান্তার গণহত্যার নীতিকে জোরাল ভাষায় নিন্দা করা সত্ত্বেও, তদন্তেই পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের মত যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে, এ প্রত্যাশা বাস্তবধর্মী ছিল না। তবু জুলাই মাসে কিসিঞ্জারের চীন সফরের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে রাজনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্যের একটি অবাঞ্ছিত পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করা রাশিয়ার পক্ষে ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। তাদের নিজেদের জন্য চীন- মার্কিন আঁতাতে সৃষ্ট বিড়ম্বনা অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ব্যাপার হলেও তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতের নিরাপত্তার জন্য এই আঁতাত ছিল তাৎক্ষণিক হুমকিস্বরূপ। সম্ভাব্য চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে পূর্ব- প্রদত্ত মার্কিন প্রতিশ্রুতি নাকচ করার সমূহ তাৎপর্য এবং যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানের উপর্যুপরি হুমকি থেকে ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কে রাশিয়ার চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই দুশ্চিন্তাই ছিল সম্ভবত মৈত্রীচুক্তির নবম ধারায় সম্মত হওয়ার পিছনে তাদের অন্যতম মুখ্য বিবেচনা। কিন্তু পাক- চীন হুমকির মুখে নিজেদের নিরাপত্তা জোরদার করা ছাড়াও ভারতের প্রয়োজন ছিল শরণার্থী সমস্যার বাস্তব সমাধানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে জয়যুক্ত করা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের জন্য ভারতের ক্রমবর্ধমান সহায়ক ভূমিকা সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট জড়তা অতিক্রম করাই তাই ভারতের চুক্তি - পরবর্তী কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের এই প্রচেষ্টাকে সফল করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐক্য তখনও একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

কাজেই আমাদের পূর্ববর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর দিন অর্থাৎ ১০ই আগস্ট বিকেল চারটায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাকের সঙ্গে আমি দেখা করি দুটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে। সূচনাতেই তিনি মৈত্রীচুক্তির ফলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম লাভবান হবে এই মর্মে কিছু মন্তব্য করেন। ফলে কোন ভূমিকা ব্যতিরেকেই আমার বলা সহজ হয় যে, এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে ভারত ও রাশিয়ার উষ্ণভাব বজায় থাকতে থাকতেই আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের দুটি জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। আভ্যন্তরীণ উদ্যোগের ক্ষেত্রে মস্কোপন্থী নামে পরিচিত দুটি দলসহ স্বাধীনতা সমর্থক সব ক'টি দলের সমবায়ে একটি ফ্রন্ট গঠন করা সম্ভব হলে, তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' গঠনের পদক্ষেপ হিসাবে রাশিয়ার কাছে তা আদৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই খোন্দকার মোশতাক নিজে এই ফ্রন্ট গঠনের কাজে উদ্যোগী হলে, এর ভিত্তিতে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সম্ভাব্য সহযোগিতায় তাঁর মস্কো যাওয়ার পথ সুপ্রশস্ত হতে পারে। বেসরকারীভাবে হলেও মস্কোর সঙ্গে যদি তাঁর তথা বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং ভারতের উপর সার্বিক নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার পথে তা সহায়ক হতে পারে। সে দিনের মত এই সব চিন্তাভাবনা তাঁর কাছে রেখে আমি ফিরে আসি।

পরদিন দুপুর সাড়ে তিনটায় আবার খোন্দকার মোশতাকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সে দিন মস্কো ছাড়াও আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনকালে নিউইয়র্ক গিয়ে বাংলাদেশের বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এ ব্যাপারে দিল্লীতে পি. এন. হাকসারের সমর্থন সংগ্রহ করা সম্ভব কি না, তা জানতে চান। ১৪ ও ১৬ই আগস্ট আরো দু' দফা আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয় পরিষ্কার করা সম্ভব হয়, তিনি যে অবস্থানে রয়েছেন সেখান থেকে নিউইয়র্ক পৌঁছুতে হলে তাঁকে অতিক্রম করতে হবে দিল্লী ও মস্কোর পথ এবং এই দুই অন্তর্বর্তী গন্তব্যস্থল সুগম হতে পারে, যদি জাতীয় মোর্চা গঠনে তাঁর সক্রিয় সমর্থন থাকে। তবু এই সব আলোচনার শেষে আমার ধারণা জন্মায়, নিউইয়র্ক অবধি নিজের যাত্রাপথ সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় মোর্চা গঠনের প্রতি তাঁর মৌখিক সমর্থন থাকলেও মন্ত্রিসভার অন্য কোন সদস্য যদি এই প্রস্তাবকে ভণ্ডুল করেন, তবে তিনি অখুশী হবেন না; পক্ষান্তরে, তাঁর যাত্রার ব্যবস্থা যদি পাকাপাকি রূপ নেয়,

তবে তিনি মোর্চা গঠনকেও হয়ত সমর্থন দিতে পারেন। যেভাবেই হোক মস্কো হয়ে তাঁর নিউইয়র্ক যাবার কথা সেই সময় এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার আকারেই আলোচিত হতে থাকে। ওদিকে তাজউদ্দিনও অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে মোর্চার ব্যাপারে সম্মত করার ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হন। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে প্রিয়ভাজন থাকার প্রচেষ্টাই সৈয়দ নজরুলের দোদুল্যমানতার মূল কারণ বলে অনুমান করা হয়।

এ দিকে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর দিল্লী থেকে অন্তত দুবার ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে অগ্রগতির কথা জানতে চাওয়া হয়েছে। কাজেই তাজউদ্দিন স্থির করেন, মন্ত্রিসভার ফ্রন্ট প্রসঙ্গে এই অনিশ্চিত সমর্থন সম্পর্কে বরং দিল্লীকে আভাস দেওয়া ভাল; যদি তাঁরা এ ক্ষেত্রে কোন সাহায্য করতে নাও পারেন তবু অন্তত কোন অবাস্তব অনুমানের উপর নির্ভর করে পদক্ষেপ গ্রহণের বিড়ম্বনা থেকে তাঁরা মুক্ত থাকবেন। ১৯শে আগস্ট পি. এন. হাকসারকে সংক্ষেপে পরিস্থিতি জানিয়ে আমি উল্লেখ করি, জাতীয় মোর্চার পক্ষে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা যদিও বর্তমান, তবু এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলার সময় এখনও আসেনি। ২২শে আগস্ট দিল্লী থেকে হাকসার আমাকে সংবাদ পাঠান যে, ২৯শে আগস্ট ভারতের প্রাক্তন মস্কোস্থ রাষ্ট্রদূত ডি. পি. ধর কোলকাতা আসবেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জাতীয় মোর্চা গঠনের বিষয়েও তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ করবেন। ইতিপূর্বে মৈত্রীচুক্তির স্বাক্ষরের ৫/৬ দিন বাদে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদ যখন আলাপ-আলোচনার জন্য দিল্লী আমন্ত্রিত হন, তখন ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের জানান যে, এরপর থেকে তাঁর ‘সবিশেষ আস্থাভাজন প্রতিনিধি’ হিসাবে ডি. পি. ধর ভারতের বাংলাদেশ বিষয়ক নীতি ও কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধনে নিয়োজিত থাকবেন।

আগস্ট মাসে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন এবং সেই চুক্তিকে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা ছাড়াও এই সময়ের অন্তত আর একটি ঘটনা-বিকাশ উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগস্টে দিল্লী সফরকালে তাজউদ্দিন প্রথমবারের মত RAW-এর সাহায্যপুষ্ট ‘মুজিব বাহিনীর’ ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলা ও সরকারবিরোধী দৌরাত্ম্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে পি. এন. হাকসার ও RAW-প্রধান রামনাথ কাও-এর সহযোগিতা কামনা করেন। আগস্টের প্রথম দিকে কয়েকটি সেক্টর থেকে খবর

পৌঁছাতে শুরু করে যে, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, 'মুজিব বাহিনী' (সূচনায় যার নাম ছিল 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স', সংক্ষেপে BLF) বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের আনুগত্য পরিবর্তন করে তাদের বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য নিরন্তর চাপ প্রয়োগ করছে, কোথাও কোথাও অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে এবং এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু কিছু সংঘর্ষও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অবশ্য গোড়া থেকেই 'মুজিব বাহিনী' বাংলাদেশ সরকার গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচারণা চালিয়ে এসেছে যে, তারা এ সরকারকে স্বীকার করে না। বস্তুত এই বাহিনীর সদস্যভুক্তির জন্য সর্বাধিনায়ক হিসাবে শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে শেখ ফজলুল হক মণির প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেই শপথনামা পাঠ করা হত।

সূচনায় অবশ্য বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নিয়েই এই বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এপ্রিলের প্রথমার্ধে সীমান্ত অতিক্রমকারী ছাত্র ও যুবকের সংখ্যা ছিল অল্প। কাজেই মুক্তিবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮ই এপ্রিল নবগঠিত বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা দেশের ভিতর থেকে ছাত্র ও যুবকর্মী সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব অর্পণ করেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ ও আবদুর রাজ্জাকের উপর। এক অজ্ঞাত কারণে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এই তরুণ নেতাদের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করে রিক্রুটিং- এর দায়িত্ব ছাড়াও সশস্ত্রবাহিনী গঠন ও পরিচালনার অধিকার প্রদান করেন। এই অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানের প্রশ্নে তাজউদ্দিনের সম্মতি ছিল না, বস্তুত মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে এদের তীব্র বিরোধিতা তিনি অতিক্রম করতে চলেছেন মাত্র। বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে দিয়ে তৎপরিবর্তে এই তরুণ নেতাদের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট' গঠনের দাবী তখনও অব্যাহত। এদের নিয়ন্ত্রণে একটি বিশেষ সশস্ত্রবাহিনী 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' গড়ে তোলার প্রচেষ্টার খবরও তাজউদ্দিনের কানে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু দলের মধ্যে তাঁর অতিশয় নাজুক অবস্থার দরুন এই তরুণ নেতাদের ক্ষমতা সমপ্রসারণের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ওসমানী নিজেও সৈয়দ নজরুল প্রদত্ত এঁদের এই সম্প্রসারিত ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয়মুক্ত ছিলেন না।

মে মাসে এক রকম প্রকাশ্যেই আলোচিত হতে থাকে যে, RAW- এর এক বিশেষ উপসংস্থার অধীনে শীঘ্রই দেরাদুনের অদূরে চাক্‌রাতায় এদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং শুরু হতে চলেছে। জুন থেকে

এদের ট্রেনিং শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে নভেম্বরের প্রথম দিক অবধি তা অব্যাহত থাকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এদের প্রথম দল আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্পষ্ট হয় যে এই বাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কর্নেল ওসমানী তথা বাংলাদেশ সরকারের কোন এখতিয়ার নেই। ফলে তাজউদ্দিন ও ওসমানী উভয়েরই সন্দেহ ঘনীভূত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে মন্ত্রিসভার অপরাপর সদস্যের ভূমিকা ছিল দোদুল্যমান। অনেক সময় 'মুজিব বাহিনীর' ক্ষমতা সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও প্রত্যেকেই তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে 'মুজিব বাহিনীর' নেতাদের সাথে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে ছিলেন আগ্রহী। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরও দুর্বলতা এ ব্যাপারে ছিল যথেষ্ট। ফলে মন্ত্রিসভা এই বাহিনীকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। এমনিভাবে দু'মাস আগে যাদেরকে কেবল ছাত্র ও যুবকর্মী সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সম্পূর্ণ বাইরে তারাই হয়ে ওঠে এক সশস্ত্রবাহিনীর স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত অধিনায়কবৃন্দ।

মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করা 'মুজিব বাহিনীর' লক্ষ্য বলে প্রচার করা হলেও এই সংগ্রামে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা, কার্যক্রম ও কৌশল কি, কোন্ এলাকায় এরা নিযুক্ত হবে, মুক্তি বাহিনীর অপরাপর ইউনিটের সাথে এদের তৎপরতার কিভাবে সমন্বয় ঘটবে, কি পরিমাণে বা কোন শর্তে এদের অস্ত্র ও রসদের যোগান ঘটছে, কোন্ প্রশাসনের এরা নিয়ন্ত্রণাধীন, কার শক্তিতে বা কোন্ উদ্দেশ্যে এরা অস্থায়ী সরকারের বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে, এ সমুদয় তথ্যই বাংলাদেশ সরকারের জন্য রহস্যাবৃত থেকে যায়। ক্রমে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পায়, 'মুজিব বাহিনীর' কেবল প্রশিক্ষণ নয়, অস্ত্রশস্ত্র ও যাবতীয় রসদের যোগান আসে RAW- এর এক বিশেষ উপসংস্থা থেকে এবং এই উপসংস্থার প্রধান মেজর জেনারেল উবান গেরিলা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হিসাবে 'মুজিব বাহিনী' গড়ে তোলার দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন।[৮৯] এ সব কিছুই হয়ত মেনে নেওয়া সম্ভব হত, যদি এই বাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হত।

প্রথম দিকে 'মুজিব বাহিনীর' স্বতন্ত্র অস্তিত্বের তিনটি সম্ভাব্য কারণ অনুমান করা হয়: (১) শেখ মণির দাবী অনুযায়ী, সত্যই কেবল মাত্র তাঁরাই সশস্ত্রবাহিনী গঠনের ব্যাপারে শেখ মুজিব কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি এবং এই সম্পর্কে ভারত সরকারের ঊর্ধ্বতনমহল কেবল

অবহিতই নন, অধিকন্তু এদেরও সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; (২) যদি কোন কারণে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতারা নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হন, তবে সেই অবস্থার বিকল্প নেতৃত্ব হিসাবে এদেরকে সংগঠিত রাখা; এবং (৩) বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম কোন কারণে দীর্ঘায়িত হলে বামপন্থী প্রভাব যদি বৃদ্ধি পায়, তবে তার পাল্টাশক্তি হিসাবে এদের প্রস্তুত করে তোলা। কিন্তু কেবল শেষোক্ত এই দুই আশঙ্কা থেকেই প্রথম দিকে যদি 'মুজিব বাহিনীকে' স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে, তবে বলা যায় আগস্ট নাগাদ দুটো আশঙ্কাই প্রায় অমূলক হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে 'মুজিব বাহিনী' কর্তৃক ক্ষেত্রবিশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া, তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে কেবল যে মুক্তিযুদ্ধকেই ভিতর থেকে দুর্বল করে ফেলা হচ্ছিল তা নয়, অধিকন্তু আশ্রয়দাতা সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এক সন্দেহের আবহাওয়াকে উৎসাহিত করে তোলা হচ্ছিল।

তাজউদ্দিন আগস্টের মাঝামাঝি দিল্লীতে এই অবস্থার সত্বর প্রতিবিধানের দাবী তোলেন, কিন্তু হাকসার এবং কাও দু'জনই নীরব থাকেন। ক্ষুব্ধ তাজউদ্দিন কোলকাতা ফিরে 'মুজিব বাহিনীকে' বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এই অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপকে খর্ব করার জন্য আমাকে আলোচনাধীন বিকল্প পদক্ষেপ জরুরীভিত্তিতে চূড়ান্ত করতে বলেন। এ সম্ভাবনা তখন স্পষ্ট যে, যদি অবিলম্বে তাদের নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে স্বাধীনতার যুদ্ধ অচিরেই এক রক্তাক্ত আত্মঘাতী লড়াইয়ে পরিণত হতে পারে। তা ছাড়া জাতীয় মোর্চা গঠনের প্রশ্নে 'মুজিব বাহিনী' আওয়ামী লীগের ভিতরের বিরুদ্ধ-শক্তিকে যদি প্ররোচিত করে তোলে, তবে তার ফলে জাতীয় মোর্চার গঠনই কেবল দুঃসাধ্য হবে তাই নয়, এর ফলে মুক্তিযুদ্ধকে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' হিসাবে উপস্থিত করে সোভিয়েট সহযোগিতা অর্জনের প্রচেষ্টাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী কর্নেল ওসমানী এই সব রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা ছাড়াই 'উচ্ছৃঙ্খল ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের জন্য' রিক্রুটিং-এর ব্যাপারে এপ্রিল মাসে যে অধিকারপত্র তিনি শেখ মণি ও তার সহকর্মীদের দিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করেন এবং 'মুজিব বাহিনীকে' শীঘ্রই তাঁর কমান্ডের অধীনে না আনা হলে পদত্যাগ করবেন বলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে জানিয়ে দেন।

এদিকে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর মুক্তিযুদ্ধের এক নতুন ও আশাব্যঞ্জক অধ্যায় শুরু হয়। এতদিন অবধি মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও চীনের যৌথ প্রতিক্রিয়ার কথা ভারতকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হত। সেই ঝুঁকিকে এড়িয়ে চলার জন্য ট্রেনিং ও অস্ত্র সরবরাহে ভারত সীমিতভাবে সহযোগিতা করে এসেছে মূলত বাংলাদেশ ইস্যুকে 'রাজনৈতিকভাবে জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে'। মৈত্রীচুক্তির ফলে এই ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ায় ভারতের সহযোগিতা দ্রুত সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারের কাছাকাছি। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থির করা হয়, সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে কুড়ি হাজার করে মোট আরও ষাট হাজার মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর জন্য গঠন করা হবে আরো নতুন তিনটি ব্যাটালিয়ান। এতদিন যাবত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা বিরাজমান ছির, তারও দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে আগস্টের শেষ দিক থেকে। এমনকি, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষও হাল্কা অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে ভারতের অসুবিধাদৃষ্টে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দখল করা জার্মান ও পশ্চিম ইউরোপীয় পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র-মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে ব্যবহৃত হবে তা জেনেই-জুলাই-আগস্টে ভাতের হাতে তুলে দেন।[৯০]

ট্রেনিং ও অস্ত্রসরবরাহ বৃদ্ধি ছাড়াও ভারতীয় 'ইস্টার্ন কমান্ড' আগস্টের শেষ দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের অপারেশনস পরিকল্পনায়, বিশেষত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে তৎপরতার লক্ষ্য (Ops target) নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সহযোগিতা শুরু করায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দুর্বলতা অংশত দূর হয়। ঐ সময় বাংলাদেশ সামরিক সদর দফতরে নিযুক্ত অফিসারের নিদারুণ সংখ্যাল্পতা এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক সার্ভিসের অশেষ দৈন্যের জন্য 'Ops target'-এর সুযোগ ছিল সামান্য। এই সব বিষয়ে অভাব পূরণ ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে-বিশেষত টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল ও নোয়াখালীতে-যে সব স্বতন্ত্র গেরিলা গ্রুপ প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তাদের কাছে অস্ত্র পৌঁছুনোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনিং ও অস্ত্রের এই সব বর্ধিত সহায়তার ফল সঞ্চার অক্টোবরের আগে ঘটে ওঠেনি।

ইতিমধ্যে আগস্ট থেকে মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা পূর্ববর্ণিত কারণে ক্রমশই নিম্নাভিমুখী। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যথাসম্ভব প্রচার সত্ত্বেও দেশের ভিতরে সাধারণ মানুষের মনোবলও ক্রমাগত নীচের দিকে

ধাবিত। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের এই অধোগতি কিয়দংশে ঢাকা পড়ে ১৫ই আগস্ট থেকে বাংলাদেশ নৌকমান্ডো বাহিনীর দুনিয়াকে চমক লাগানো নৌবিধ্বংসী তৎপরতায়। ভারতীয় নৌবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের মাত্র ৩০০ জন ছাত্র ও যুবককে ঐতিহাসিক পলাশীর অদূরে ভাগীরথী নদীতে নৌবিধ্বংসী ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই নৌকমান্ডোরা ১৫ই আগস্ট থেকে নভেম্বরের ,মধ্যে সর্বমোট ৫০,৮০০ টন জাহাজ নিমজ্জিত করে, ৬৬,০৪০ টন জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং বেশ কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী নৌযান দখল করে নেয়। ফলে বিশ্বের বাণিজ্যিক বহরে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং চট্টগ্রাম ও চালনায় বাহিত পণ্যের ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম কুড়ি গুণ বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও সঠিক রিক্রুটমেন্ট, উপযুক্ত ট্রেনিং, পর্যাপ্ত অস্ত্র, সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং নির্ভুল পরিকল্পনা কি বিরাট সাফল্য ঘটাতে পারে- এ তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি জোরদার করার পক্ষে ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তির প্রভাব অত্যন্ত ইতিবাচক হলেও চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় সাথে সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী অংশ ভারতের দক্ষিণপন্থী মুখপাত্রদের সঙ্গে সমস্বরে প্রচারণা চালাতে শুরু করে যে, এই চুক্তির মাধ্যমে মস্কো বাংলাদেশের প্রতি কূটনৈতিক স্বীকৃতি জ্ঞাপন থেকে নয়াদিল্লীকে নিবৃত্ত করেছে এবং এর পরে ভারত কখনই আর বাংলাদেশের পক্ষে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে না।[৯১] মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের দিন দিল্লীতে এক উল্লসিত জনসমুদ্রের কাছে 'বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এবং ৭০ লক্ষ শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারত সকল কিছু করতে প্রস্তুত' এই মর্মে ইন্দিরা গান্ধীর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা সত্ত্বেও মৈত্রীচুক্তির বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য এক জোর প্রচারণা শুরু হয়। এই প্রচারণার অন্যতম মূল উৎস ছিল 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় পরিবেশিত এক 'সংবাদ'। এই 'সংবাদ' অনুসারে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA এক 'গোপন' সমীক্ষায় নিক্সনকে অবহিত করেছে যে ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করবে।[৯২] ভারতে এবং বিশেষত ভারতে অবস্থানকারী বাংলাদেশ রাজনৈতিক মহলে এই উদ্দেশ্যমূলক অসত্য প্রচার (disinformation campaign) যখন পূর্ণমাত্রায় চলছিল, তখন অন্তরালে যুক্তরাষ্ট্রের খোদ প্রেসিডেন্ট সঠিক পরিস্থিতি জানিয়েই ইয়াহিয়া খানকে নমনীয় হবার পরামর্শ দেন।[৯৩]

বিগত চার সপ্তাহের যুদ্ধ হুঙ্কার বন্ধ করে ইয়াহিয়াচক্রও হঠাৎ খোল পাল্টানোর কৌতুককর মহড়ায় অবতীর্ণ হয়। এমনিভাবে ১৪ই আগস্টে 'দেশ সেবার জন্য' জেনারেল টিক্কা খানকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ খেতাব দিয়েও মাত্র সতের দিনের মধ্যে তাকে গভর্নর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া, তদস্থলে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য' বাঙালী গভর্নর হিসাবে আবদুল মালেককে নিয়োগ করা, নির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত নয় এমন সব 'দুষ্কৃতিকারীর' জন্য 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করা, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক শরণার্থীদের জন্য 'অভ্যর্থনা শিবির' স্থাপন করা, 'দেশদ্রোহের অপরাধে' অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বনির্ধারিত বিচার ১১ই আগস্ট একদিনের জন্য শুরু করেও[৯৪] সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান অনুসন্ধানের জন্য' তা পিছিয়ে দেওয়া[৯৫] ইয়াহিয়ার ইত্যাকার নমনীয়তা ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই ঘটতে শুরু করে এবং নিক্সনের চিঠির পর তা আরও ত্বরান্বিত হয়। এই সব বাহ্যিক পরিবর্তনের অন্তরালে ইসলামাবাদের ক্ষমতার কেন্দ্রে কি ঘটছিল তা জানার কোন উপায় তখন আমাদের ছিল না।[৯৬] তবে পাকিস্তান আসন্ন বিপর্যয়কে এড়াবার জন্য পূর্বাঞ্চলে তার বাহ্যিক ভূমিকা পরিবর্তন করলেও বৃহত্তর পাক- ভারত যুদ্ধে বাংলার মুক্তিসংগ্রামকে নিমজ্জিত করার অন্যান্য প্রস্তুতি অব্যাহত রাখে।[৯৭]

অধ্যায়- ১১: আগষ্ট - সেপ্টেম্বর

ভারতের বাংলাদেশ বিষয়ক কর্মসূচীর প্রধান নিয়ন্ত্রকের পদে পরিবর্তনের সংবাদ আমাদের জন্য খুব একটা স্বস্তিদায়ক ছিল না। ভারতের ক্ষমতাযন্ত্রে বাম ও দক্ষিণের নেপথ্য টানাপোড়েন তখনও আমাদের সম্যক উপলব্ধির অন্তর্গত নয়। তা ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'মুজিব বাহিনীকে' বাংলাদেশ কমান্ডের অধীনস্থ করার প্রশ্নে ভারতীয় প্রশাসনের এক শক্তিশালী অংশের অসহযোগিতা এই সংশয়ের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। এতদিন অবধি বাংলাদেশ- সংক্রান্ত ভারতের নীতি ও কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করতেন প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি. এন. হাকসার। তাঁর সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার নৈকট্য প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে মাত্র। কিন্তু সমস্যার কলেবর উত্তরোত্তর বিশাল ও জটিল হয়ে ওঠায় এবং বিশেষত হাকসারের অবসর গ্রহণের মেয়াদ নিকটবর্তী হওয়ায় ভারত

সরকার তাদের বাংলাদেশ বিষয়ক সমস্যার সামগ্রিক ও সার্বক্ষণিক দায়িত্বে ডি. পি. ধরকে নিযুক্ত করেন। এ জন্য ইতিমধ্যেই ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদাসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘পলিসি প্লানিং কমিটি’র চেয়ারম্যান পদে তাঁর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ই সেপ্টেম্বর সামগ্রিক দায়িত্বভার গ্রহণের আগে আলোচনাধীন নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে মতবিনিময় ছাড়াও বাংলাদেশের প্রবাসী নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশ আন্দোলনের রাজনৈতিক উপাদান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা গঠন করার উদ্দেশ্যে ডি. পি. ধর ২৯শে আগস্ট সকালে কোলকাতা আসেন। কিন্তু অন্তত কয়েকটি বিষয়ে তাঁর উদ্যোগের গতি ও ধরন থেকে আমাদের মনে হয়, ভারত সরকার অবশেষে একটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সমগ্র ঘটনাধারাকে পরিচালিত করার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ। অধিকৃত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের পরিসর ও তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য যুব শিবিরের সম্প্রসারন থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সহায়তা ক্রমশ এক সুসমন্বিত সম্প্রসারণের রূপ ধারণ করতে শুরু করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশেষত স্বাধীনতা- সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি ফোরামে একত্রিত করার ব্যাপারে ডি. পি. ধরের ব্যগ্রতা আমাদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যায়। এ ক’দিনের আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে আমার নোটের উদ্ধৃতিই সম্ভবত পরিস্থিতির অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা:

২৯শে আগস্ট

‘Missed the appointment a 10:30 am with DP... and arrived Hotel Hindustan at 11:45 am when he was already in session with the Acting President and the PM... I met DP at past 12:30. He wanted an overall political appreciation of the current situation. As the political leadership was still suffering from lack of cohesion and frittering its energy on matters of secondary interest, the sector war was progressively faltering and FFs facing enormous political pressure inside the country, I suggested the need/possibility of a fresh bold move to inject some efficiency in the insurgency management by inducting middle level politicos belonging to AL and non-Al streams including some civil servants, without disturbing the formal structure of the Government. This middle level task force could work under the PM and its operational structure could be the proposed national united front. But the front itself was

still facing covert opposition from within the cabinet and would require GOI's (Government or India's) strong support to overcome the opposition.

'DP's reply appeared to be well-formulated: (1) cabinet's functioning must be improved and unity strengthened and he wanted to find out its modalities; (2) multi-party alliance was a must also for the external reasons and he was keen to know the details of actual progress made so far....

'I briefed him about the situation... DP wanted a second meeting with me in the evening after his scheduled meeting with the cabinet later in the afternoon.

'In the evening DP told me that the proposal for the united front was supported by all the members of the cabinet except Tajuddin who remained silent. DP was puzzled, unhappy. I assured him once again about Tajuddin's view about unity and suggested that two of them should have an exclusive meeting next day. Went to brief Tajuddin about both the sessions.'

৩০শে আগস্ট

'Met DP briefly during the evening. He was apparently happy after having a discussion with Tajuddin but seemed a little worried about his ability to understand Bengali politicians' mind....

৩১শে আগস্ট

'DP met the cabinet again and requested for a specific date, modality etc. for the formation of a united forum, when they (the ministers) persisted in being vague about every thing on the ground that it would take time to remould the views of the party leaders since the move itself was unpopular with (the rank and file of) the AL. DP was nearly blunt in telling them that as the GOI was rendering all possible help to the BD Govt. since the crackdown without expecting anything in return and as India was facing a massive threat to its security

due to BD problem, the time has come when the GOI must request BD Govt. to form a broad national alliance so that GOI can persuade the friendly powers to support the BD cause, even if tacitly and (make them) agree to resolve India's security problem. Otherwise the whole episode was fast becoming untenable for India, he mentioned.

'I met Taj and DP separately during the evening. Taj said that finally it was going to work.

১লা সেপ্টেম্বর

'Met DP at 3:45pm at his hotel and pressed for lifting the restriction against the left elements from being recruited and trained as FF. DP saw no difficulty in removing such restrictions from GOI's side after the formation of the multi-party alliance, but it would require endorsement from the BD Govt. atleast from its PM, before such recruitment was (actually) started.

'As I mentioned the need for putting 'Mujib Bahini' under BD command, after narrating the instances of their-disruptive activities, he agreed that these should be effectively stopped and hinted the difficulties of 'bringing it out' of the control of the Indian agency. He suggested that Taj should sent an emissary with relevant facts to Kao and, after having this ground work done, the problem could be taken up 'at the highest level', if required.

'In the absence of unity in outlook and common approach within in the cabinet, (DP said), he had made it known that (from then onwards) GOI would entertain only those requests which would atleast be agreed jointly be the PM and the President; and Mr. Abdus Samad Azad had been entrusted with the special responsibility for developing Taj-Nazrul relationship....

'He said that he was impressed by the clarity of thought and sincerity of Tajuddin but hinted that he (Tajuddin) should try to resolve his political isolation fast.'

কোলকাতায় চারদিন অবস্থানকালে বাংলাদেশের প্রবাসী মন্ত্রিসভা, রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে ডি. পি. ধরের আলোচনা কয়েকটি ফলদায়ক সিদ্ধান্ত ছাড়াও সামগ্রিকভাবে এমন ধারণার সৃষ্টি করে যে, অবশেষে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি ত্বরান্বিত করার কাজে এক গতিশীল সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণে উদ্যোগী। এধান যে দু'টি রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকতে দেখা যায়, তার একটি বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে এবং অপরটি বাংলাদেশের স্বাধীনতাসমর্থক সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একটি জাতীয় ফোরামে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে। মুক্তিযুদ্ধের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এবং রাজনৈতিক কাজকর্মে মন্ত্রিসভাকে অপেক্ষাকৃত ঐক্যবদ্ধ করার উপায় অন্বেষণের সদিচ্ছা নিয়ে শুরু করলেও ডি. পি. ধরের আলোচনা শেষ পর্যন্ত কেবল দুই সরকারের মধ্যে যোগাযোগের পদ্ধতি নিরূপণেই সক্ষম হয়। অতঃপর যে সমস্ত বিষয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী একত্রে সাব্যস্ত করবেন, ভারত সরকারের পক্ষে কেবল সে সব বিষয়েই যথাসম্ভব সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে তিনি জানান।

এ যাবত অধিকার ও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্য নিজকে প্রধানমন্ত্রী সমকক্ষ হিসাবে জ্ঞান করায় - কি ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় (মূলত সহায়তা সংগ্রহের) প্রশ্নে, কি তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে - শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের প্রশ্নকে তাঁরা অনেক সময় উপেক্ষা করতেন। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রশ্ন ছাড়াও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং মুক্তিযুদ্ধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যও ছিল বিশাল। সমস্যা যদি কেবল এইটুকুই থাকতো তবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর যুগ্ম সিদ্ধান্তের পদ্ধতি গৃহীত হবার পর মন্ত্রিসভাকে ক্রমশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলা সম্ভব হত। কিন্তু বাস্তবে তখন উপদলীয় পরিস্থিতি গোপন বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে ছিল অত্যন্ত জটিল ও বিস্ফোরণোম্মুখ।

ডি. পি. ধরের সফরের দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বামপন্থী দলসমূহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল শক্তি আওয়ামী লীগের সঙ্গে এমনভাবে গ্রথিত করা, যাতে এই সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রূপ লাভ করে এবং যার ফলে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তিকে কেবলমাত্র নিরাপত্তার বর্ম হিসাবে ব্যবহার না করে

বাংলাদেশে পাকিস্তানী দখল বিলুপ্তির অন্যতম প্রধান সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এই রণনৈতিক বিবেচনা থেকে বৃহত্তর ঐক্য সাধনের জন্য ডি. পি. ধর অত্যন্ত স্বল্প সময়সীমার মাঝে (অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের শেষে ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফর শুরু হবার আগে) বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার অনিচ্ছুক অংশকে ঐক্যজোট প্রস্তাবে যে পদ্ধতিতে সম্মত করান, তা সংশ্লিষ্ট নেতাদের বিরাগ উৎপাদন করে। তদুপরি দিল্লীর সাথে মন্ত্রীদের সরাসরি সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে নতুন বিধিনিষেধজনিত ক্ষোভও সম্ভবত এর সাথে যুক্ত হয়।

অন্যদিকে ডি. পি. ধর এই চারদিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং এর রাজনৈতিক উপাদান সম্পর্কে যে ধারণা গঠন করেন,[৯৮] তা পরবর্তী চার মাসের ঘটনাধারার বিকাশকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর পরই বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত জাতীয় মোর্চার নির্দিষ্ট কাঠামো ও ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু এদের কোন কোন সদস্যের অভিমতকে প্রতিধ্বনিত করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের জন্য ভারত সরকারের 'চাপ' এ 'হস্তক্ষেপের' বিরুদ্ধে ক্ষোভের গুঞ্জন শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভা জাতীয় ঐক্যজোট গঠন করেন ঠিকই, তবে এই জোটকে কোন কার্যকরী সংগঠনের রূপ না দিয়ে নিছক এক উপদেষ্টা সংস্থার মর্যাদা দান করেন এবং এর অধিকার সীমিত করেন মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে 'পরামর্শ' দানের মধ্যে। কিন্তু এই পরামর্শ দান প্রক্রিয়া কিভাবে বা কত নিয়মিত সংঘটিত হবে, সে বিষয়টিও সর্বাংশে অস্পষ্ট থাকে। অন্য কথায়, বৃহত্তর রণনৈতিক বিবেচনা থেকে জাতীয় মোর্চা গঠনের জন্য ভারতের জোরাল অভিমতের কথা বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি' গঠনে সম্মত হলেও সাংগঠনিক অর্থে এই মোর্চা একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে।

কিন্তু বাংলাদেশের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বিশেষ সময়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের মূল প্রয়োজনই ছিল রাজনৈতিক। ইতিপূর্বে মে- জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ভারতীয় সহায়তার মাত্রা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং এই সহায়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্তরায়স্বরূপ পাক- চীন মিলিত আক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে, ভারত- সোভিয়েট সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হয় এবং এই লক্ষ্যে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের বিষয়

উত্থাপন করা হয়। তবু মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির সাথে সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরো কিছু অতিরিক্ত বিবেচনা ফ্রন্ট গঠনের চিন্তার সাথে ক্রমশ যুক্ত হতে থাকে। যেমন জুলাইয়ের শেষ দিকে 'শান্তি কমিটি' ও রাজাকারদের ক্রমবর্ধিত দৌরাত্ম্যের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় রাখার জন্য দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক কর্মীদের ফেরৎ পাঠিয়ে গোপন সহায়ক সংগঠন নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে পরিষদ সদস্যদের সমবায়ে গঠিত বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিল এবং আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার উন্নতি ঘটে সামান্যই। তারও আগে অর্থাৎ মে- জুন মাসে 'মুজিব বাহিনী' দেশের ভিতরে গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী রাজনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হবে[৯৯] বলে অনুমান করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। দেশের ভিতরে এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করার উদ্দেশ্যে- বিশেষত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও সংশ্লিষ্ট ন্যাপের কর্মীদের আগ্রহ ও মনোভাব বিবেচনা করে এক বহুদলীয় কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করার চেষ্টা তাজউদ্দিন যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।

'শান্তি কমিটি' ও রাজাকারদের দৌরাত্ম্য মোকাবিলা করার প্রশ্ন ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় ও সংহত করে তোলার নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা ছিল। জুন- জুলাই থেকে তরুণ যুদ্ধ- অনভিজ্ঞ যোদ্ধাদের ছোট ছোট দল অতি স্বল্প পরিমাণ বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং নামমাত্র পাথেয় সম্বল করে সীমান্ত অতিক্রম করা মাত্র প্রায়শই যে বিপদ- সঙ্কুল বা অসংগঠিত অবস্থার মাঝে নিক্ষিপ্ত হত, সেই অবস্থার মাঝে অনেক যোদ্ধাকেই নিছক উপস্থিত বুদ্ধির জোরে টিকে থাকতে হয়েছে এবং অনেকে এর ফলে লক্ষ্য- বিচ্যুতও হয়েছে। এ ছাড়া ভ্রান্ত রিক্রুটিং পদ্ধতির জন্য কিছু স্বার্থবুদ্ধিপ্রবণ তরুণেরও সমাবেশ ঘটে। তখন থেকেই দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয় - কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্যেই নয়, তাদের সমন্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করার স্বার্থেও। আগস্ট- সেপ্টেম্বরে বিভিন্ন আঞ্চলিক কাউন্সিল থেকেও প্রায় একই মর্মে কিছু রিপোর্ট আসতে শুরু করে।[১০০]

কিন্তু এ জন্য যে ধরনের কার্যকরী ক্ষমতা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের হাতে ন্যস্ত করার প্রয়োজন ছিল মন্ত্রিসভা তা না করায় ফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ব্যবস্থাপনা উন্নত করার সুযোগ নষ্ট হয়। এই অবস্থার

শেষ চেষ্টা হিসাবে তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অমান্য না করেও প্রস্তাবিত 'উপদেষ্টা কমিটি'কে অপেক্ষাকৃত সক্রিয় সংগঠনে রূপান্তরিত করার সুযোগ উন্মুক্ত রাখার জন্য এর প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করে একটি সেক্রেটারীয়েট স্থাপনে সচেষ্ট হন, যাতে অন্তত শুরু থেকেই স্বাধীনতা সমর্থক দলগুলির যোগাযোগ একটি নিয়মিত ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে। মন্ত্রিসভার গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব তাঁর পক্ষে উত্থাপন করা অসুবিধাজনক বলে তিনি প্রস্তাবটি পেশ করার জন্য ৭ই সেপ্টেম্বর ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের কাছে অনুরোধ করে পাঠান এবং তাঁকে দেখা করতে বলেন।

পরদিন ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি' গঠনের জন্য পাঁচ দলের নেতৃবৃন্দ কোলকাতায় মিলিত হন। মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিরা ছাড়াও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিংহ, ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও বাংলাদেশ কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর এই বৈঠকে যোগদান করেন। একই উদ্দেশ্যে দেরাদুন থেকে এসে পৌঁছান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।[১০১] সংক্ষিপ্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ- আলোচনার পর তাঁরা জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। মন্ত্রিসভার দু'জন সদস্য, তাজউদ্দিন ও খোন্দকার মোশতাক ছাড়াও আওয়ামী লীগ থেকে আরও দু'জন প্রতিনিধি এবং অন্য চারটি দল থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ। আগের দিন তাজউদ্দিনের অনুরোধ সত্ত্বেও অজ্ঞাত ব্যস্ততার দরুন মোজাফ্ফর প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে উঠতে পারেননি এবং পরদিন তিনি উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করেন। এরপর 'এই ক্ষুদ্র কমিটির জন্য' সর্বসম্মতিক্রমে তাজউদ্দিন আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। অতঃপর পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল আস্থা জ্ঞাপন, শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী, ভারত সরকারের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বাংলাদেশ সরকারের নীতির প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে উপদেষ্টা কমিটির সভা শেষ হয়।[১০২] এমনিভাবে জাতীয় ঐক্যজোটকে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করার যে সামান্য সম্ভাবনা ছিল তা নিঃশেষিত হয়। তবে এই ঐক্যজোট যত দুর্বলই হোক, তা বৃহত্তর রণনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক শক্তি- সম্পর্ককে বাংলাদেশের অনুকূলে আনার পক্ষে সহায়ক হয়।

প্রস্তাবিত ঐক্যফ্রন্টকে দুর্বল ‘উপদেষ্টা কমিটিতে’ পরিণত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা ছিল খোন্দকার মোশতাকের। আওয়ামী লীগের ‘নিরঙ্কুশ অধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়ে’ বহুদলীয় কমিটি গঠন করার ফলে আওয়ামী লীগের যে অংশ ক্ষুব্ধ হয়, তাদেরকে তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত করার ক্ষেত্রেও মোশতাক সক্রিয় ছিলেন। অথচ নিজের নিউইয়র্ক যাওয়া যাতে সম্ভব হয়, এ জন্য সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মহলের জন্য তাঁর বাহ্যিক ভূমিকা ছিল অন্য রকম। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার পাঁচদিন আগে, যখন এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন প্রবাসী নেতৃত্ব গোপনীয়তা বজায়ের চেষ্টা করছিলেন, এমনকি ভারতীয় পত্রপত্রিকাও দৃশ্যত যখন এ বিষয়ের কোন হদিশ পায়নি, তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই লন্ডনের ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকার সংবাদদাতার কাছে ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই ‘ঐক্যবদ্ধ মুক্তিফ্রন্ট’ গঠিত হতে চলেছে এবং ‘এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাশিয়ার সমর্থন লাভ সম্ভব হতে পারে।’[১০৩] ৫ই সেপ্টেম্বরে পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীকে তিনি দিল্লী পাঠান মুখ্যত তাঁর প্রত্যাশিত বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে ভারতের সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে।[১০৪] পরবর্তীকালে প্রকাশিত এক তথ্য অনুসারে, যে দিন ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় রাশিয়ার সমর্থনের সম্ভাবনা সম্পর্কে মোশতাকের আশাবাদ প্রকাশিত হয়, ঠিক সে দিনই অর্থাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রস্তাব করেন, কোলকাতায় বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তারা জানিয়ে রাখতে চান যে, ইয়াহিয়া মোশতাকের সঙ্গে গোপনে আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়েছেন। ফারল্যান্ডের এই প্রস্তাবে ইয়াহিয়া রাজী হন।[১০৫] কিসিঞ্জারের স্মৃতিকথা প্রকাশের আগে অবধি এই ঘটনার কথা অবিদিত থাকলেও, এই ধরনের কর্মকাণ্ড যে ভিতরে ভিতরে চলছিল তা সেই সময়ের আর একটি সূত্র থেকে প্রকাশ পায়।

১৯৬০ সালে কঙ্গোয় পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ ‘পর্যবেক্ষক’ বাহিনীর আবরণকে যেভাবে ব্যবহার করেছিল, ১৯৭১ সালের জুলাই- আগস্টে অধিকৃত এলাকায় জাতিসংঘের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা কর্মসূচী অনেকটা তেমনিভাবে ব্যবহার করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে USAID - কে উত্তরোত্তর মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। কাজেই আগস্টের শেষ

দিকে এ বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ৫ই সেপ্টেম্বরের বেতার ভাষণে তাজউদ্দিন স্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যে সাহায্য দিয়েছে পাকিস্তানের মাধ্যমে তা দখলকৃত এলাকায় বিলি করার ব্যবস্থা সঙ্গত মনে করেছে জাতিসংঘ। বিগত ঘূর্ণিঝড়ের পরে রিলিফের জন্য যে সব হেলিকপ্টার, জলযান ও অন্যান্য যানবাহন এসেছিল, বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধেই পাকিস্তান সরকার নির্বিকারচিত্তে সে সব ব্যবহার করেছে। দুর্গত মানুষের জন্য নির্দিষ্ট বহু সামগ্রী দখলদার সৈন্যদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতিসংঘের সেবাদলে এখন একদল যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এসেছেন উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে। এতে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর রণকৌশলে সাহায্য হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এই অবস্থায়, ত্রাণকার্যের মানবতাবাদী উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হবার ঘোরতর আশঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল যদি পৃথিবীর এই অংশে বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে চান তাহলে তাঁকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ত্রাণকার্যের নামে নিষ্ঠুর প্রহসন অনুষ্ঠিত না হয়।'

এই বেতার ভাষণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের আন্ডার সেক্রেটারী জন আরউইন, ডেপুটি এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী ভ্যান হোলেন এবং USAID- এর মরিস উইলিয়ামস্ ভারতের রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝার কাছে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় ত্রাণ সহায়তার কাজে নিযুক্ত অফিসারদের নিরাপত্তা বিধানের অনুরোধ করেন। উত্তরে ঝা বলেন, যেহেতু ঐ এলাকার উপর ভারতের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সেহেতু ত্রাণকার্যে নিযুক্ত লোকজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে সরাসরি আলাপ করা। জন আরউইন তখন জানান, কোলকাতায় ‘যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট সদস্যরা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করছেন’ এবং তাঁরা বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ‘আলাপ- আলোচনার সম্ভাবনা অন্বেষণ করে দেখছেন।’[১০৬] ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের যুগ্ম সচিব এ. কে. রায় রাষ্ট্রদূত ঝা’র এই রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ পরিষদ সদস্যদের একাংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদেরকে অখণ্ড পাকিস্তানের অধীনে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাবার ব্যাপারে উৎসাহিত করে চলেছেন বলে তাঁর কাছেও সংবাদ রয়েছে। ২০শে

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এ. কে. রায়কে জানান তাঁর জানা মতে দু'জন জাতীয় পরিষদ সদস্য মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেলের অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেছেন।

দু'দিন আগে অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীকে প্রেরিত এক সংক্ষিপ্ত নোটে রায় জানান কোলকাতায় মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেলের অফিস অধিকৃত এলাকায় আন্তর্জাতিক ত্রাণ কর্মীদের নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছেন বলে ভারত সরকার অবগত হয়েছেন এবং তাদের মতে এ-সংক্রান্ত তথ্যাদির বিনিময় সম্ভব হলে ভারত ও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সমন্বিত ভূমিকা ফলপ্রসূ হত। ২২শে সেপ্টেম্বরে লিখিত সংক্ষিপ্ততর জবাবে চাষী জানান, 'কোন ব্যাপারেই মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কখনো যোগাযোগ হয়নি।' এই উত্তর পাঠাবার আগে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী, সচিব বা অন্য কেউই অন্তত প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে কোন পরামর্শ চাননি, এমনকি এহেন নাজুক বিষয়ে আশ্রয়দাতা সরকারের সঙ্গে নোট বিনিময় চলেছে তার উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। আন্ডার সেক্রেটারী জন আরউইন পরিবেশিত তথ্যের পটভূমিতে মাহবুব আলমের এই প্রাঞ্জল অস্বীকৃতি ভারতের কেবল সন্দেহ বৃদ্ধিতেই সহায়ক হয়। ফলে তাঁদের গতিবিধি, যোগাযোগ ইত্যাদি ভারতীয় পর্যবেক্ষণের অধীন হয় এবং অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, খোন্দকার মোশতাক, মাহবুব আলম এবং তাঁর আরো তিন/চারজন সহযোগী মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন।[১০৭]

খোন্দকার মোশতাকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের আন্তর্জাতিক প্রেরণা, বিঘোষিত স্বাধীনতার প্রতি তাঁর আনুগত্যের মান[১০৮] প্রভৃতি বিষয় অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কোন বিশেষ রাজনৈতিক পরিকল্পনা অথবা কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তাঁর এই আমেরিকা যাওয়ার ব্যগ্রতা তা প্রথম দিকে অস্পষ্ট ছিল। কেননা, আমেরিকায় পৌঁছে তিনি যদি পাকিস্তানের পক্ষে তাঁর আনুগত্য পরিবর্তন করতেন, তবে কিছু সময়ের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করলেও অচিরেই তিনি যে ক্ষমতাহীন ব্যক্তি হিসাবে পরিত্যক্ত হতেন তা উপলব্ধি করার বুদ্ধিমত্তা তাঁর ছিল। এমনকি আমেরিকা পৌঁছানোর পর অবিভক্ত পাকিস্তানের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের কোন আপোস ফর্মুলা নিয়ে তিনি যদি কোন নতুন

ফ্রন্টও খুলতেন তবু স্বাধীনতা আন্দোলনের যে তাতে সমূহ ক্ষতি হত এমন নয়। অবশ্য সর্বজনগ্রাহ্য কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি অথবা বিরাট ভাবাবেগ- সঞ্চারী নতুন কোন ইস্যুকে এই আপোস প্রস্তাবের সমর্থনে হাজির করা হলে তার ফলাফল কি দাঁড়াত বলা মুশকিল ছিল। এই শেষোক্ত আশঙ্কা থেকে সেপ্টেম্বরে খোন্দকার মোশতাক যখন আওয়ামী লীগের কোন কোন মহলে 'হয় স্বাধীনতা, নয় শেখ মুজিবের মুক্তি, কিন্তু দুটোই এক সাথে অর্জন করা সম্ভব নয়' বলে প্রচারণা শুরু করেন,[১০৯] তখন তাঁর আমেরিকা সফরের একটি নতুন অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। ভারতে আসার পর থেকে জুলাই এবং সম্ভবত আগস্ট অবধি কোন সময়েই স্বাধীনতার বিকল্প হিসাবে শেখ মুজিবের মুক্তির প্রস্তাব খোন্দকার মোশতাক বা অন্য কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। আগস্ট- সেপ্টেম্বরে মার্কিন প্রতিনিধিদের সাথে গোপন যোগাযোগের সময়ে মোশতাক স্বাধীনতা অথবা শেখ মুজিব এই নতুন প্রচারে অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁর প্রস্তাবিত আমেরিকা সফর এক নিগূঢ় সম্ভাবনায় তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

প্রায় চার সপ্তাহ মুলতবি থাকার পর ৭ই সেপ্টেম্বর লায়ালপুরে এক গোপন সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের 'বিচার' পুনরায় শুরু হয়। ইতিপূর্বে এই তথাকথিত 'বিচার' শুরু হওয়ার আগে ৫ই আগস্টে ইয়াহিয়া নিজে শেখ মুজিবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' জন্য শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার করায়[১১০] এই 'বিচারের' রায় পূর্বনির্ধারিত বিষয় হিসাবেই পরিগণিত হয় এবং শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষা নিয়ে সারা বিশ্বে উদ্বেগের সঞ্চার ঘটে। আওয়ামী লীগের সকল স্তরে এই প্রশ্ন ছিল নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও ভাবাবেগের ইস্যু। কাজেই, স্বাধীনতা না বঙ্গবন্ধুর প্রাণরক্ষা- এই সুচতুর প্রচারণার মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থনকে নতুন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখে হাজির করে স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক আপোস ফর্মুলাকে শেখ মুজিবের মুক্তির সঙ্গে জড়িত করে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যদি মার্কিন কর্তৃপক্ষ মোশতাককে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকে, তবে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না।[১১১]

তাজউদ্দিন নিজেও আগস্টের প্রথমার্ধে- বিশেষত ১০ই আগস্টে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থানটের উৎকণ্ঠিত বিবৃতির পর- শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে সবিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে মার্কিন সরকার

পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য যেভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন[১১২] এবং সমগ্র ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রণে যেভাবে তাদের ভূমিকার সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে, তার পরোক্ষ ফলস্বরূপ পাকিস্তানীদের সম্ভাব্য প্রতিহিংসা- হত্যার আশঙ্কা হ্রাস পায়। শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা উন্নত করার উপযোগী একটি কার্যকর নীতি অন্বেষণকালে আমরা লক্ষ্য করি এই প্রশ্নে জনমত জোরদারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বৃদ্ধিই অধিকতর কার্যকর পন্থা। কেননা মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে প্রবাসী নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই প্রতিপক্ষের আক্রোশ কেন্দ্রীভূত হওয়া স্বাভাবিক; অন্তত আমেরিকানদের চোখে শেখ মুজিব ক্রমশই অধিকতর মধ্যপন্থী (moderate) হিসাবে পরিগণিত হয়ে উঠতে পারেন; এমনকি কোন এক পর্যায়ে উদ্ভূত সঙ্কট নিরসনে তাঁকে আমেরিকা একটি সংযোগসূত্র (linkage) হিসাবে বিবেচনা করতে আগ্রহান্বিত হতে পারে।[১১৩] শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধির নামে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে মোশতাকের যুক্তি কার্যত সম্পূর্ণ বিপরীত ফল উৎপাদন করতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা জন্মে।

খোন্দকার মোশতাক ছাড়াও বিপদের আশঙ্কা ঐ সময় দেখা দেয় আরো কয়েকটি দিক থেকে। সেপ্টেম্বরে একদিকে তাজউদ্দিন যেমন মুক্তি সংগ্রামের মূল রণনৈতিক উপাদানগুলি একত্রিত করার দুরূহ কাজে, তথা, বাংলাদেশের অনুকূলে ভারত- সোভিয়েট সমঝোতার সম্প্রসারণ, দখলদার সৈন্যদের রণক্লান্ত করে তোলার জন্যে অনিয়মিত যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং চূড়ান্তপর্বে ভারত- বাংলাদেশ মিলিত অভিযান সম্ভব করে তোলার কাজে ব্যস্ত, তখন এই প্রচেষ্টাকে দলের ভিতর থেকে পর্যুদস্ত করার মত প্রচণ্ডতা নিয়েই আওয়ামী লীগের সকল উপদলীয় তৎপরতা, যেন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই, একের পর এক আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। খোন্দকার মোশতাক এবং শেখ মণির 'মুজিব বাহিনী' ছাড়াও ৯- নম্বর আঞ্চলিক প্রশাসনিক এলাকার (খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও অংশত ফরিদপুরের) ৪০ জন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা ঘোষণা করেন। এই গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মণির নিকটাত্মীয় আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং শেখ আবদুল আজিজ। ৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত ৯- নম্বর আঞ্চলিক কমিটি অফিসে তাঁরা যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন তন্মধ্যে জুলাই মাসে মন্ত্রিসভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 'জোনাল কাউন্সিল অর্ডার' (GA/810 (345), dated 27th July, 1971)- এর প্রত্যাহার, কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ সদস্যদের সাহায্যে 'জাতীয় মুক্তি পরিষদ' গঠন, প্রত্যেক

প্রশাসনিক দফতর পরিচালনার জন্য পরিষদ সদস্যদের সমবায়ে 'পার্লামেন্টারী কমিটি' গঠন এবং 'অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র' ঘোষণার দাবী জানানো হয় এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়, এপ্রিলে মন্ত্রিসভা গঠনকালে গুরুতর অনিয়ম করা হয়েছে। 'জোনাল প্রশাসনিক কাউন্সিল' ছিল স্বাধীন সরকারের নির্মীয়মাণ প্রশাসনের অন্যতম মূল কাঠামো, কাজেই একে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা কেবল অরাজকতা বৃদ্ধিতেই সহায়ক হত। তেমনি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ সদস্যদের সমবায়ে 'জাতীয় মুক্তি পরিষদ' গঠনের দাবী ছিল মূলত বহুদলীয় মোর্চা গঠনের উদ্যোগকে বন্ধ করার জন্যেই, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের রণনৈতিক প্রয়োজন তথা আন্তর্জাতিক শক্তি সমাবেশের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব ছিল সম্পূর্ণ অর্থহীন। অন্য দাবীগুলি দৃশ্যত গণতান্ত্রিক; কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধউপদ্রুত, নির্বাসিত অবস্থায় সেগুলি কতখানি উপযোগী ছিল, অনুমান করা কষ্টকর নয়।

তথাপি এই সব দাবীর ভিত্তিতে ১১ই সেপ্টেম্বরে জাতীয় পরিষদ সদস্য এনায়েত হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত গ্রুপের মুলতবি সভায় তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অবিলম্বে 'পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডকে' আহ্বান করা হয়।[১১৪] অপর এক প্রস্তাব অনুসারে এই গ্রুপ অন্যান্য আঞ্চলিক কমিটিকে এই অনাস্থা প্রস্তাবের পিছনে সংঘবদ্ধ করার জন্য প্রচারণা চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অক্টোবরে যখন তাদের সার্কুলার প্রচারিত হয়,[১১৫] তখন মোশতাক গ্রুপের সাথে তাদের লক্ষ্য ও বক্তব্যের অভিন্নতা স্পষ্টতর হয়। অবশ্য তার পূর্বেই তাদের মেলামেশা ও কাজকর্ম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খোন্দকার মোশতাক ও শেখ মণি উভয়ের স্বার্থই এই গ্রুপে প্রায় সমভাবে বিরাজমান। খোন্দকার মোশতাকের তুলনায় শেখ মণির রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক, আকাঙ্ক্ষা ও বক্তব্য বহুলাংশে স্বতন্ত্র হলেও তাজউদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ ও আয়োজন ছিল অভিন্ন। আশ্রয় প্রদানকারী রাষ্ট্রের শক্তিশালী নিরাপত্তা সংস্থার সর্ববিধ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক অনুগত সশস্ত্র তরুণের অধিনায়ক হিসাবে শেখ মণি ছিলেন তুলনামূলকভাবে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী এবং সেই অর্থে সর্ববৃহৎ উপদলীয় বিপদের উৎস। একই সময়ে উপরোক্ত তিনটি গ্রুপ ছাড়াও কামরুজ্জামানের উদ্যোগে আওয়ামী লীগের ভিতরের ও বাইরের শক্তিকে নিয়ে এমন এক স্বতন্ত্র বিরোধিতার উদ্ভব ঘটতে থাকে, যা মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের জন্য ছিল সমভাবেই অবাস্তব ও ক্ষতিকর।[১১৬]

সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক যন্ত্র। কাজেই সেই যন্ত্রকে বিভক্ত ও নিষ্ক্রিয় করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমূহ ক্ষতিসাধনের জন্য পাকিস্তানের প্রবল ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষকের পক্ষে এক অন্তর্ঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তখনকার দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনা ও চরিত্র সমাবেশের মাঝে, নানা ধরনের স্বার্থ ও সম্পর্কের ভাঙ্গা-গড়ার ফলে এই সমস্ত উপদলীয় ধারার সঠিক শ্রেণীকরণ সর্বদা সম্ভব হত না। তা সত্ত্বেও এ কথা বুঝে উঠতে কষ্ট হয়নি, যে প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন বহিঃশক্তি পাকিস্তানের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সর্ব উপায়ে তৎপর এবং যারা অন্তত একটি উপদলের সহায়তায় আওয়ামী লীগের একাংশকে স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট, সেই শক্তিই আওয়ামী লীগকে বিভক্ত ও নিষ্ক্রিয় করার সমূহ উপায় অবলম্বন করতে পারে। আওয়ামী লীগের উপদলীয় সংঘাতের প্রতিক্রিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের উপর কি দাঁড়াবে এবং ফলত দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানকে দুর্বল করে দ্রুত সামরিক বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্য কতদূর ব্যাহত হবে, এই প্রশ্নই তখন মুখ্য হয়ে ওঠে।

ঠিক এই আশঙ্কার পটভূমিতে স্বাধীনতাযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপৎকালীন শক্তি হিসাবে ন্যাপ-সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়ন থেকে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করার একটি প্রস্তাবকে তাজউদ্দিন দ্রুত সিদ্ধান্তে পরিণত করেন। এই সব সংগঠনের কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধে নিয়োগ করার ব্যাপারে তাঁর নীতিগত সম্মতি বরাবরই ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের অবশিষ্ট নেতৃত্বের সম্মিলিত আপত্তির দরুণ-জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পরেও-এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হত কিনা বলা শক্ত। ইতিপূর্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ন্যাপ ও সিপিবির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিস্তর দেনদরবার করা হয়। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে সিপিআই-এর প্রভাবশালী লবি বিশেষ করে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তির পর বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় প্রশাসনের কেন্দ্রের বাম, অন্ততপক্ষে ডি. পি. ধর, যিনি ভারত-সোভিয়েট চুক্তির জন্য সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী, ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন মস্কো সফরের আগে ন্যাপ-সিপিবির কর্মীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে রিক্রুট ও ট্রেনিং দানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সম্মতির অপেক্ষায় ছিলেন। অন্যদিকে আগস্টে মুজিব বাহিনীর ক্রমবর্ধমান দৌরাত্ম্য প্রতিবিধানের জন্য ভারতীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করে তাজউদ্দিন যখন ব্যর্থ হয়েছিলেন, তারপর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে রাজনৈতিক

ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য বামপন্থী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করার এক প্রস্তাব তিনি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছিলেন। সেপ্টেম্বরে আওয়ামী লীগের উপদলীয় সংঘাতের সঙ্গে মার্কিন ইন্ধন যুক্ত হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধ যখন ভিতর থেকে বিপন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়, তখন উপরোক্ত প্রস্তাবকে তাজউদ্দিন সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করতে আর বিলম্ব করেননি। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে অপ্রিয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার গুরুতর পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে, তাজউদ্দিন সে সম্পর্কে পূর্ণরূপেই সচেতন ছিলেন।

অধ্যায়- ১৩: সেপ্টেম্বর - অক্টোবর

আওয়ামী লীগের ক্রমাবনত উপদলীয় পরিস্থিতির মাঝে শেখ মণির প্রভাব ও ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও ত্রাস সৃষ্টি থেকে তাঁকে বিরত করার বিভিন্ন চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে পুনরায় দিল্লীর সংশ্লিষ্ট দফতরের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে ডি. পি. ধরের পরামর্শ অনুযায়ী ১২ই সেপ্টেম্বরে তাজউদ্দিন আমাকে দিল্লী পাঠান। ডি. পি. ধর পরদিন বিকেল চারটায় নয়াদিল্লীর প্রধান সচিবালয় 'সাউথ ব্লকে' RAW- এর প্রধান রামনাথ কাও- এর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সাম্প্রতিক কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার আলোকে যথাশীঘ্র 'মুজিব বাহিনীকে' বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার পক্ষে আমার বক্তব্য কাও ভাবলেশহীন মৌনতায় শ্রবণ করেন এবং আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর বিদায় জ্ঞাপনকালে ক্ষণিকের জন্য সে মৌনতা ছিন্ন করেন। চার সপ্তাহ আগে কাও তাজউদ্দিনের বক্তব্যের জবাবে যে নীরবতা প্রদর্শন করেন, তদপেক্ষা কোন উন্নত সৌজন্য আমার প্রাপ্য ছিল না।

পরদিন সকালে ডি. পি. ধরকে আমি জানাই যে, পূর্ববর্তী অপরাহ্নের সাক্ষাৎকারের পরেও পরিস্থিতির কোন উন্নতির সম্ভাবনা যেহেতু দৃষ্টিগোচর নয়, সেহেতু প্রতিশ্রুত 'সর্বোচ্চ মহলের' হস্তক্ষেপে মুক্তিযুদ্ধের এই দ্বৈত কমান্ডের অবসান একান্ত অপরিহার্য। উত্তরে তিনি আমাকে অধ্যাপক পি. এন. ধরের (তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সচিব) সঙ্গে অপরাহ্নে সাক্ষাৎ করে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অবহিত করার পরামর্শ দেন। যথাসময়ে তা আমি সম্পন্ন করি বটে, কিন্তু ক্রমশ এই ধারণা

আমার মনে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে: ‘মুজিব বাহিনীর’ স্বতন্ত্র কমান্ড বজায় রাখার পক্ষে ভারত সরকারের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত এমনই জোরাল যে এর পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজে আমি হয়ত ব্যবহৃত হয়ে চলেছি। সন্ধ্যায় ডি. পি. ধরের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বৈঠকে প্রসঙ্গটি পুনরায় উত্থাপিত হয়; কিন্তু কোন সিদ্ধান্তের আভাস তাঁর বক্তব্যে ছিল না। বরং দু’দিন বাদে কোলকাতা যাওয়ার পর ন্যাপ-সিপিবি কর্মীদের মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হবেন, এই মর্মে তিনি একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রাখেন। ‘মুজিব বাহিনী’ প্রশ্নে ভারসাম্য বিধানের জন্য বামপন্থীদের মুক্তিবাহিনীতে নেওয়ার পক্ষে আমাদের অনুক্ত যুক্তি যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি ভারতীয় প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রতিকূল বিভিন্ন ধারা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁর সহযোগিতার প্রয়াস আমাদের অগোচরে থাকেনি।[১১৭]

আমি দিল্লী থেকে ফিরে আসার একদিন পরে অর্থাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বরে ডি. পি. ধর তিন দিনের জন্য কোলকাতা আসেন। তাঁর প্রধান আলোচনাই ছিল তাজউদ্দিনের সঙ্গে। বাংলাদেশের সর্বাত্মক মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারত অদূর ভবিষ্যতে কোন সহযোগিতা চুক্তিতে পৌঁছাতে পারে কি না, সেই সম্ভাবনার অন্বেষণ ছিল এই আলোচনার মূল বিষয়। ভারতের অনুসৃত নীতি তখন পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্প্রসারিত ভিত্তিতে সাহায্য করার অতিরিক্ত কিছু নয়। সামরিক পর্যায়ে, ‘অবস্থান অঞ্চল’ গঠনের জন্য লে. জেনারেল কে. কে. সিং-এর পূর্ববর্তী পরিকল্পনা যদিও ম্লান ও পর্যালোচনার অধীন, তবু সরকারীভাবে তখনও তা পরিত্যক্ত নয়। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্য তখনও ভারতের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুপযোগী। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি ভারতকে পাক-চীন যুগ্ম আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করলেও এবং তার ফলে ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা বাড়ানো সম্ভব হলেও, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক তা সম্ভবত সোভিয়েট ইউনিয়নের কাম্য ছিল না। ভারত যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত সামরিক বিজয় লাভে সক্ষম তাও ছিল প্রমাণ সাপেক্ষ। ফলে একদিকে আমেরিকা বা জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে উপমহাদেশে যুদ্ধবিরতি ও স্থিতাবস্থা ঘোষণা এবং অপরদিকে এই ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনিবার্য কূটনৈতিক সংঘাতের মাধ্যমে দাঁতাত প্রক্রিয়া ও নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার ক্ষতিসাধন - এই দুই আশঙ্কাবোধ থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি পাক-ভারত যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তখনও সচেষ্ট থেকে

থাকে, তবে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। তা ছাড়া, আমেরিকার মাধ্যমে পাকিস্তানী জান্তাকে শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য চাপ সৃষ্টির সুযোগ যে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত, সম্ভবত সে উপলব্ধিতে পৌঁছুতে সোভিয়েট ইউনিয়নের তখনও বাকী।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই মধ্যপন্থী ভূমিকার তুলনায় ভারতের প্রত্যাশা ছিল বেশী। সোভিয়েট নীতিনির্ধারকদের রাজনৈতিক যুক্তিবিন্যাস সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা থাকার ফলে ডি. পি. ধরের পক্ষে সোভিয়েট অবস্থান আরও কিছু নিকটতর করার সম্ভাবনা আঁচ করা হয়ত সম্ভব ছিল। পাকিস্তানী হামলায় মাত্র পাঁচ মাসে শরণার্থীর সংখ্যা ৮০ লক্ষ অতিক্রম করার পর[১১৮] এবং বিশেষত পাক বাহিনীর 'কাফের নিধন' কর্মসূচীর বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত হওয়ায় পাকিস্তানী সৈন্যের পূর্ণ অপসারণ ব্যতীত অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অক্ষমতা পরিদৃষ্ট হওয়ার পর বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া ভারতের কোন সত্যিকার বিকল্প ছিল না। কাজেই সোভিয়েট মনোভাবকে এই প্রশ্নে অনুকূল করার জন্য সর্ব উপায়ে সচেষ্ট হওয়া তাঁদের জন্য অত্যন্ত সংগত ছিল।

কোলকাতায় ডি. পি. ধরের বহুমুখী ব্যস্ততা ও আলাপ-আলোচনার মাঝে যে সীমিত বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয় সে বিষয়ে রক্ষিত নোটের উদ্ধৃতি সে সময়ের অবস্থা উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হতে পারে:

১৭ই সেপ্টেম্বর

"Met DP at 8:30 am. Now that a consultative committee has been formed, restrictions against recruiting NAP-CPB workers as FF can be waived, if the PM (Bangladesh) gives the clearance, said DP. As I mentioned that such clearance would be readily available, DP wanted to know how many of left workers could be mobilised for recruitment and how fast. Secondly, he wanted the clearance should be communicated to him by Tajuddin himself and if possible by tomorrow before he left Calcutta, so that necessary orders could be issued speedily. With regard to the first point, I said that the total number could... reach between 20,000 and 25,000, and the mobilisation could be made at a rate of 5,000 per week.

“Met Tajuddin at 3:30 pm and told him about the clearance required by DP.... He asked for Group Captain Khondkar’s opinion, since the C-in-C was out of station. Khondkar supported the move. He offered his transport for its use for contacting NAP camps on western sectors. On my way back to DP, I went to NAP and CPB offices, handed over the jeep and gave necessary advice. Met DP at 5 pm as scheduled... DP said that the recruitment and training would begin immediately, usual 3 weeks training and induction under BD command; but he remained silent about the actual size to be recruited[১১৯] He proposed another meeting with me next day to discuss other matters.”

১৮ই সেপ্টেম্বর

"Met Tajuddin at 8 am, and briefed him about the development since previous afternoon. He wanted me to keep the pressure on DP about bringing Mujib Bahini under BD commnad....

“Met DP at 5 pm. He showed anxiety at the decline of FF activity... I explained the difficulty of repoliticising the occupied areas and its consequence on FF activity. He emphasised the need for better co-ordination in selecting the targets for FF ops and wanted to know if there was any insurmountable difficulty in inducting base workers in a few pre-selected areas for ops. He sounded so ad hoc....

“On Mujib Bahini, he felt that his PM’s intervention would be required as it seemed to be a tricky matter....”

আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই নতুন রিক্রুটমেন্ট যথাসম্ভব গোপনে চালিয়ে যাওয়া স্থির হয়। এই সিদ্ধান্তের আর একটি দিক ছিল সবিশেষ লক্ষণীয়। মাত্র সতের দিন আগে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের যুগ্ম সিদ্ধান্তের পদ্ধতি ডি. পি. ধর নিজেই যেখানে প্রবর্তন করেছিলেন, সেখানে বামপন্থীদের মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার মত

অত্যন্ত বিতর্কমূলক প্রশ্নে কেবল তাজউদ্দিনের একক সিদ্ধান্তকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। এই ঘটনা থেকে তাজউদ্দিনের উপর তাঁদের ক্রমবর্ধমান আস্থা সঞ্চার ছাড়াও[১২০] আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ জটিলতা সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও ডি. পি. ধর পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্তকে 'মুজিব বাহিনীর' প্রভাব খর্ব করার প্রচেষ্টা হিসাবে বর্ণনা করেন, তবু তাঁদের আসন্ন মস্কো সফরের আগে মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার কোন সুবিবেচনা প্রয়োজন থেকেই তাজউদ্দিনের একক সিদ্ধান্তকে তাঁরা হয়ত নিরাপদ মনে করে থাকতে পারেন।

মুক্তিবাহিনীতে বামপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কেবল আওয়ামী লীগের একাংশের নয়, ভারতের দক্ষিণপন্থী মহলের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা কোন অংশে কম ছিল না। 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি' গঠন প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমত থেকেও প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা আঁচ করা চলে। তাজউদ্দিন ও ডি. পি. ধরের সম্মতির ফলে যেদিন বামপন্থীদের রিক্রুট করার সিদ্ধান্ত হয় ঠিক সেদিনই অর্থাৎ ১৭ই সেপ্টেম্বরে দিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্য এবং 'বাংলাদেশের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির' আহ্বায়ক অধ্যাপক সমর গুহ 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি' গঠনের জন্য ডি. পি. ধর এবং ভারতের পররাষ্ট্র সচিব টি. এন. কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, সোভিয়েট সাহায্য ও সমর্থন লাভের নামে জোর করে এই দুই ভারতীয় কর্মকর্তা বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।[১২১] সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বহুদলীয় 'উপদেষ্টা কমিটি' গঠন এবং তৃতীয় সপ্তাহে ন্যাপ-সিপিবি কর্মীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সংগ্রামের নেতৃত্বে কোন মৌল পরিবর্তন না ঘটলেও পরিবর্তনের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তা সমভাবেই আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী এবং ভারতের দক্ষিণপন্থীদের কাছে আপত্তিকর ছিল। কিন্তু ২৩শে সেপ্টেম্বরে ডি. পি. ধরের মস্কো যাত্রাকালে কূটনৈতিক পাথেয় হিসাবে এর মূল্য সম্ভবত কম ছিল না। এর চারদিন বাদে ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করার জন্য মস্কো যান।

ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো যাত্রার আয়োজন চলাকালে তাজউদ্দিন বাদে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ নেতৃত্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল প্রেরণের বিষয়কে কেন্দ্র করে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খোন্দকার মোশতাকের ধারণা ছিল

তিনিই এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করতে চলেছেন।[১২২] স্টেট ডিপার্টমেন্টের জন আরউইন ভারতের রাষ্ট্রদূতকে প্রবাসী সরকারের একাংশের সঙ্গে গোপন মার্কিন যোগাযোগের বিষয় জানানোর পর, খোন্দকার মোশতাকের আমেরিকা সফরের বিষয়ে যখন নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়, তখন ৮-সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল ২১শে সেপ্টম্বরে নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আরও তিনজন প্রতিনিধি এদের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এঁদের নেতৃত্ব দান করেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও আমেরিকার প্রচেষ্টার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বন্ধের জন্য জাতিসংঘকে পুনরায় যে ভূমিকায় দাঁড়া করানোর চেষ্টা করা হয়,[১২৩] তা নেপথ্য সোভিয়েট প্রচেষ্টায় ব্যাহত হয়।[১২৪] সাধারণ পরিষদের নব-নির্বাচিত সভাপতি আদম মালিক পাকিস্তান ও ভারতকে দ্বিপাক্ষীয় আলোচনা শুরু করায় সম্মত করানোর প্রয়োজন উল্লেখ করে বলেন, সাধারণ পরিষদে এই বিতর্ক ফলপ্রসূ না হওয়াই সম্ভব।[১২৫] পাকিস্তানের পক্ষে মাহমুদ আলীর অভিযোগ এবং ভারতের সমর সেনের জবাব ও পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ বিষয়ক বিতর্ক শেষ হয়।

এই সময়ে বাংলাদেশ প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয় মস্কোতে এবং তার ফলে পরিস্থিতির মৌলিক উন্নতি ঘটে। ২৮-২৯শে সেপ্টেম্বরে ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা এবং শীর্ষ বৈঠকের শেষে প্রকাশিত যুক্তইশতেহার থেকে বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েট ভূমিকার স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যুক্তইশতেহারে মূল অংশে বলা হয়, উপমহাদেশে 'শান্তি সংরক্ষণের স্বার্থে উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার মানুষের বাসনা, অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও আইনানুগ স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এবং শরণার্থীদের দ্রুতগতিতে ও নিরাপদে, সম্মান ও মর্যাদার পরিবেশে স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।[১২৬] যুক্তইশতেহারে আরও বলা হয় যে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠায় ভারত ও সোভিয়েট উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে 'যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখবে।' এই শেষোক্ত ঘোষণা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তিতে বর্ণিত যোগাযোগ ও মতবিনিময়-সংক্রান্ত ধারা কার্যকর হবার মত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে বলে উভয় পক্ষ মনে করে।

বাংলাদেশের প্রশ্নে সোভিয়েট ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে ২৮শে সেপ্টেম্বরে মস্কো শীর্ষ বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তিন সোভিয়েট নেতা ব্রেজনেভ, পোদগর্নি এবং কোসিগিনের ছ'ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার ফলে। এই শীর্ষ বৈঠকের দেড় বৎসর পর[১২৭] বৈঠকের পঞ্চম অংশগ্রহণকারী ডি. পি. ধর আমাকে যে বিবরণ দান করেন, তদ্রূপ বিবরণ সম্ভবত আজও অন্যত্র প্রকাশিত নয়। এর ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বিবেচনা করে এই বিবরণের লিপিবদ্ধ সংক্ষিপ্তসার হুবহু উদ্ধৃত করা হলো:

"Till now the Soviet side was pre-occupied with the need for avoiding war in the subcontinent. In a long, remarkable presentation Mrs. Gandhi narrated the difficulties with the refugees, Pakistan's intransigence and India's very limited choice of building up military pressure while keeping the door open for political solution.

"Both sides then had a discussion to assess the stamina of the liberation struggle, its capacity to sustain itself inside Bangladesh, commitment of the Awami League leadership for independence and the extent of its break with West Pakistan. Brezhnev observered that, "there is an element of national liberation in the present situation," to which Podgorny gave a nod.

"Finally the Soviet leaders wanted to know what India expected them to do. Flexible attitude was adopted by both the sides for both political solution based on Mujib's release and building up India's armed preparedness, should she be embroiled in a military conflagration. Soviet arms assistance was assured to be quickened, but not more than normal supplies except for some weapons for freedom fighters, should the struggle prolongs.

"This meeting was the major turning point towards the liberation war."

বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ২৮-২৯শে সেপ্টেম্বর এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। কেননা, এই প্রথম বাংলাদেশের পরিস্থিতির মাঝে ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উপাদান বর্তমান’ এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে এবং ‘এই পরিস্থিতি ভারতকে বৃহত্তর সংঘর্ষে জড়িত করে ফেলতে পারে’ এই আশঙ্কায় একমত হয়ে ভারতের সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করার পক্ষে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তির সম্মতি বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ভারতের সর্বাত্মক সহায়তার পথ উন্মুক্ত করে। ভারতের সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি যে ‘রাজনৈতিক সমাধানের’ জন্য সচেষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়, সেই সমাধানের শর্তাবলী - যা যুক্তইশতেহারে ঘোষণা করা হয় - কার্যত ছিল বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর নামান্তর।

যুক্তইশতেহার প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মস্কো শীর্ষ সম্মেলনে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে দিল্লীর সমীক্ষা তাজউদ্দিনের কাছে পৌঁছানো হয়। তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের নিকট সংশ্লিষ্ট পটভূমিসহ মস্কো সম্মেলন সম্পর্কে দিল্লীর সমীক্ষা এবং এই ইশতেহার সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত উপস্থিত করেন। দুই দিনের মধ্যে মস্কোতে যে যুক্তইশতেহার প্রকাশিত হয় তা তিন দিন ধরে আলোচনা করার পর প্রবাসী মন্ত্রিসভা অবশেষে ২০০-শব্দবিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার খসড়া অনুমোদন করেন।[১২৮] বস্তুত মস্কো আলোচনার ফলাফল ও যুক্তইশতেহারের জন্য অপেক্ষা না করেই, কোসিগিনের স্বাগতিক বক্তৃতাকে উপলক্ষ করে আওয়ামী লীগের অজ্ঞাতনামা ‘প্রভাবশালী জাতীয় পরিষদ সদস্যদের’ প্রতিক্রিয়া ফলাও করে ‘স্টেটস্‌ম্যান’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এতে বলা হয়, ‘কোসিগিনের ভূমিকা এতদিন যাবত পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা যা চেয়েছিল তার সঙ্গে সার্থকভাবে মিলে গেছে।’[১২৯] কিছুটা এরই জের হিসাবে মন্ত্রিসভার আলোচনাতেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার অধিকার যাতে সামান্যতম অর্থেও খর্বিত না হয়, সে সম্পর্কে সতর্ক পর্যালোচনার পর মন্ত্রিসভা যুক্তইশতেহারকে সর্বসম্মতভাবে স্বাগত জানান:

“The joint statement of Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi and Soviet leaders reflects a deep understanding of the Bangladesh issue in the Kremlin. While suggesting a political solution of the problem, the joint statement advocates ‘urgent measures paying regard to the wishes, the inalienable rights

and lawful interests of the people of East Bengal.’ These three basic principles can only lead to the support of total independence of Bangladesh for which the 75 million people of Bangladesh are shedding blood every moment.

“Due importance has been given in this joint statement with regard to ‘speediest return of refugees to their homes with honour and dignity.’ This can happen only if the refugees are enabled to return in freedom, which is the avowed policy of the Government of Bangladesh.

“At a time when the destiny of 75 million struggling people of Bangladesh is being discussed all over the world and in the UN, we wish to reiterate and re-emphasise that total independence is our goal. We urge all the power of the world to support this goal. People of Bangladesh and their elected representatives have given irrevocable verdict on this issue.”

মস্কো শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশ সঙ্কট সমাধানের মূল নীতি সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথম দিকে তা বাস্তবায়নের উপায় ও পদ্ধতির প্রশ্নে মস্কো ও দিল্লীর ভূমিকায় কিছু পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। যুক্ত ঘোষণার পর পরই সোভিয়েট পত্রপত্রিকায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সমালোচনা তীব্রতর হয় এবং বিভিন্ন সোভিয়েট শহরে প্রতিবাদ সভার মত বিরল ঘটনা অনুষ্ঠানের সংবাদ আসতে থাকে।[১৩০] তবু পরবর্তী দুই সপ্তাহ ধরে, অন্তত ইয়াহিয়ার ১২ই অক্টোবরের বক্তৃতার আগে পর্যন্ত, সঙ্কটের নিরস্ত্র সমাধানের পক্ষে তাদেরকে আশা বজায় রাখতে দেখা যায়।[১৩১] দাঁতাত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার বৃহত্তর স্বার্থে দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের জড়তা ছিল বোধগম্য। ২২শে অক্টোবরে মৈত্রীচুক্তির নবম ধারা অনুযায়ী সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিরুবিন দিল্লী সফর শুরু করার পর সোভিয়েট ভূমিকা সম্পর্কে সংশয়ের নিরসন ঘটতে থাকে। পাকিস্তানী জান্তার মনোভাব ও উদ্দেশ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে বরং ভারতের নীতি- নির্ধারকগণ আমাদের অভিমতের নিকটতর ছিলেন। বস্তুত শেখ মুজিবের মুক্তি ও আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা জান্তার পক্ষে যে সাধ্যাতীত এ কথা বহির্মহলের অনেকেরই জানা ছিল; যেমন জানা ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তাদের

প্রবল অনিচ্ছার কথা।[১৩২] এ সব উপলব্ধির ব্যাপার ছাড়াও বিপুল সংখ্যক শরণার্থী রক্ষণাবেক্ষণ সেপ্টেম্বর- অক্টোবর নাগাদ ভারতের জন্য এমন বিপজ্জনক হয়ে পড়ে যে, এর সম্ভাব্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় রোধের জন্য দ্রুত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণই তাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়।[১৩৩]

অধ্যায়- ১৪: সেপ্টেম্বর - অক্টোবর

সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ মুক্তিসংগ্রামের রণনৈতিক নীতির আন্তর্জাতিক দিক অত্যন্ত আশাব্যঞ্জকভাবে সংগঠিত হয়ে উঠলেও এই নীতির জাতীয় দিক, তথা, মুক্তিযোদ্ধা এবং নিয়মিত বাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার মাধ্যমে দখলদার সৈন্যদের দুর্বল ও পরিশ্রান্ত করার লক্ষ্য তখনও অনায়ত্ত। সীমান্তে বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনী তখনও বিশেষ সক্রিয় নয়। আর জুলাইয়ের শেষ থেকে দেশের ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার যে অধোগতি শুরু হয়, তা রোধ করার মত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়নি। দেশের ভিতরে রাজনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, গেরিলা যুদ্ধের বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ, কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের কমান্ডকাঠামো গঠন এবং নিয়মিত সরবরাহ ও যোগাযোগ সুনিশ্চিতকরণ ব্যতীত পরিস্থিতির উন্নতিসাধন যে অত্যন্ত দুরূহ, আগস্ট থেকেই তা সবিশেষ স্পষ্ট। অথচ মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা ক্রমাগত বৃদ্ধির মাধ্যমে দখলদার সেনাদের ক্ষতিগ্রস্ত ও যুদ্ধ- পরিশ্রান্ত করে তোলা না গেলে কেবলমাত্র ভারতীয় বাহিনীর নিয়োগ বাংলাদেশের দ্রুত ও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য যথেষ্ট হত না।

দখলদার সৈন্যদের পরাভূত করার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বের ছিল তা ভারতের সামরিক পরিকল্পনার বিবর্তন থেকেও অনুধাবন করা সম্ভব। যে কোন কল্পিত বা সম্ভাব্য বহির্বিপদ মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সব দেশের সামরিক বাহিনীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। পরিবর্তনমান আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে কল্পিত বিপদের হ্রাস বৃদ্ধি সঠিকভাবে পরিমাপ করা এবং তা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সম্পদ সদ্ব্যবহারের চিন্তাই সামরিক পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে

সাথে পরিকল্পনারও সময়োচিত পরিবর্তন করতে হয় বলে সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মার্চের শেষে আক্রান্ত মানুষের জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত করার পর বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ভারতে প্রবেশ শুরু করলে এর অন্তর্নিহিত সামরিক ঝুঁকি বিবেচনা করে মে মাস থেকেই ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা শুরু করেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দিন আহমদকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপনের পর সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে এই লক্ষ্য অর্জনও নির্মীয়মাণ ভারতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

‘পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত’-এ রকম একটা সামরিক যুক্তি পাকিস্তানী শাসকেরা বরাবর প্রায়ই প্রচার করতেন। সম্ভবত এই কারণে ১৯৬৯ সালের আগে পূর্বাঞ্চলে মোতয়েন তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল অনুর্ধ এক ডিভিশন। এমনকি ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯৬৮- ৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনের তীব্রতা দৃষ্টে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্ন যখন হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে, একমাত্র তখনই ঢাকার স্বতন্ত্র ‘কোর কমান্ড’ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে নবগঠিত ইস্টার্ন কমান্ডের জন্য ১৯৭১ সালের জানুয়ারী অবধি চার ব্রিগেডের মত সৈন্য (Division plus) মোতায়েন রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন আক্রমণের আশঙ্কা না থাকায় ভারতও বরাবরই এই এলাকায় প্রায় সমসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখত। এর কিছু মোতায়েন থাকত কোলকাতার নিরাপত্তার জন্য এবং ১৯৬২ সালের পর থেকে, বেশীরভাগই থাকত ঠাকুরগাঁও ও সিকিম- পশ্চিম ভুটানের মাঝখানের সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড প্রতিরক্ষার জন্য।[১৩৪] 'Siliguri Corridor' নামে পরিচিত এই ভূখণ্ডের কাছে চীন খুব তাড়াতাড়ি সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম। মাত্র ৩০ কিলোমিটার প্রশস্ত এই সঙ্কীর্ণ এলাকা পতনের ফলে আসামসহ পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ভারতের প্রধান ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকায় এর সামরিক গুরুত্ব বরাবরই বেশী। অবশ্য ১৯৭১ সালের মার্চে নক্সালপন্থী আন্দোলন দমন এবং সাধারণ নির্বাচনকালীন আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে পশ্চিমবঙ্গে তিন ডিভিশন সৈন্য সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিস্তৃত করে রাখা হয়েছিল।[১৩৫]

পাকিস্তানের সামরিক আক্রমণের মুখে কেবল এপ্রিল ও মে এই দু’মাসেই যখন ৪৩ লক্ষ লোক ভারতে প্রবেশ করে, তখন মে- জুন মাসে দিল্লীর সামরিক সদর দফতরে Director of Military Operations লে.

জেনারেল কে. কে. সিং- এর তত্ত্বাবধানে সামরিক পরিকল্পনা তৈরী শুরু হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী উপদ্রুত অঞ্চলে পাকিস্তানের তিন/চার ডিভিশন সৈন্যের বিরুদ্ধে ভারতের অন্যূন ছয়/সাত ডিভিশন সৈন্যের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়, যদিও প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত একজন সৈন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য সংখ্যা তিন হওয়া উচিত। স্পষ্টতই বাংলাদেশের বিদ্রোহজনিত পরিস্থিতি এবং বিদ্রোহী বাহিনীর সমর্থন বাবদ কিছু সুবিধা ভারতের অনুকূলে হিসাব করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের পক্ষে বাংলাদেশ সীমান্তে এই ছয়/সাত ডিভিশন সৈন্য জড়ো করার জন্য ভারতের পশ্চিম সীমান্ত থেকে কোন সৈন্য সরিয়ে আনার কোন উপায় ছিল না। সম্ভাব্য যুদ্ধে পাকিস্তান পশ্চিমাঞ্চলকেই যে প্রধান রণাঙ্গনে পরিণত করবে ভারতের এমন আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত ছিল। উত্তর সীমান্তে চীনের বিরুদ্ধে মোতায়েন ভারতের আট/নয় ডিভিশন সৈন্য থেকে বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সৈন্যের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব ছিল একমাত্র শীতকালে, যখন তুষারপাতে উত্তরের অধিকাংশ গিরিপথ বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই পরবর্তী শীতকালের আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ সম্ভব নয়, এই অনুমানের ভিত্তিতেই ভারতের সামরিক পরিকল্পনা গড়ে ওঠে।[১৩৬] জুলাইয়ের প্রথমদিকে অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার প্রায় এক মাস আগে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয় বলে জানা যায়।

সংক্ষেপে এই ভারতীয় রণপরিকল্পনার মূল কাঠামো ছিল: (ক) দক্ষিণে দুই প্রধান সমুদ্রবন্দরের প্রবেশ পথে নৌঅবরোধ সৃষ্টি করে পাকিস্তানের সমস্ত সরবরাহ বন্ধ করা এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের পশ্চাদপসারণের পথ বন্ধ করে তাদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আতঙ্ক সৃষ্টি করা; (খ) বিমানবন্দর, বড় বড় সেতু, ফেরী সংযোগ পথ ইত্যাদি দখল/বিনষ্ট করে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা; (গ) বিভিন্ন যোগাযোগ কেন্দ্র দখল করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ যোগাযোগবিহীন করে আরও টুকরো টুকরো এবং নিষ্ক্রিয় করে ফেলা; এবং (ঘ) এই পন্থায় পাকিস্তানের অধিকাংশ সৈন্য পরাভূত করার পর ঢাকার উদ্দেশে দ্রুত অভিযান শুরু করা।[১৩৭] ঢাকার দিকে দ্রুত অভিযান শুরুই ভারতীয় বাহিনীর মূল লক্ষ্য বলে বর্ণনা করা হলেও এই পরিকল্পনায় পরিষ্কারভাবে স্বীকার করা হয় যে, বরাদ্দকৃত তিন সপ্তাহের মধ্যে (অর্থাৎ বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কার্যকর হওয়ার পূর্বেই)

ঢাকাকে মুক্ত করা ভারতীয় ছয়/সাত ডিভিশন সৈন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। কে. কে. সিং- এর অভিমত ছিল, যেহেতু এই সৈন্যবল ও সময়- সীমার মাঝে ঢাকা দখল ভারতীয় বাহিনীর সাধ্যের বাইরে, সেহেতু গোটা বাংলাদেশের পরিবর্তে এর বড় কিছু অংশ মুক্ত করার লক্ষ্যেই বরং তাদের সামরিক শক্তি পরিচালিত হওয়া উচিত।[১৩৮]

কে. কে. সিং- এর এই অভিমত অনুযায়ী ভারতের সৈন্য সমাবেশ ক্ষমতা এবং বাংলাদেশের বিজয় সুনিশ্চিত করার মধ্যে যে ব্যবধান (gap) ছিল, তা পূরণ করা সম্ভব হয় একমাত্র মুক্তিবাহিনীর সাহায্যেই। দেশের ভিতরে ও সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে যদি দখলদার বাহিনীকে নানা উপায়ে বিঘ্নিত, ক্ষতিগ্রস্ত, এবং অবশেষে যুদ্ধপরিশ্রান্ত করে তোলা যায়, তবেই একমাত্র ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে দ্রুত ও সর্বাত্মক বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে পারে বলে অনুমান করা হয়। পাকিস্তানী অবস্থানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধিই ছিল তাই মুক্তিযুদ্ধের রণনৈতিক আয়োজনের জাতীয় দিক। বাংলাদেশের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য সমগ্র রণনৈতিক আয়োজনের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উভয় উপাদানই ছিল প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপূরক।

সেপ্টেম্বর থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্রশিক্ষণ ব্যাপকতর হওয়ার ফলে মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত সম্প্রসারিত করার এক অসামান্য সুযোগ ঘটে। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত উপদলীয় বিরোধ ও সংঘাতের ফলে সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে যে, দেশের ভিতরে মুক্তিসংগ্রামের রাজনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কমান্ডকাঠামো গঠনে সামান্য অগ্রগতিই সম্ভব হয়। মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটের ব্যাপারে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও পেশাদারী মাপকাঠি গ্রহণের আবশ্যকতা উত্তরোত্তর স্বীকৃতি লাভ করলেও বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কাজেই কোন কমান্ডব্যবস্থা ছাড়াই ভাল- মন্দ, সৎ- অসৎ, সক্ষম- অক্ষম সব মিলিয়েই তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের আয়তন দ্রুত স্ফীত হতে শুরু করে। এর ফলে এদের মধ্যে সামাজিক পুনর্গঠন এবং সামাজিক অরাজকতা উভয় ধরনের শক্তিরই পাশাপাশি বিকাশ ঘটতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগের (induction) ব্যাপারে নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর অধিনায়কদের দায়িত্ব ছিল মূলত আনুষ্ঠানিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশে প্রবেশের পর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সেক্টর সংগঠনের যোগাযোগ হত ছিন্ন। অনেক

ক্ষেত্রে অসংগঠিত ও প্রতিকূল অবস্থার মুখে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাড়ানোর চেষ্টা করত।

জুন-জুলাই-আগস্টে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের পক্ষে এই উপলব্ধিতে আসা সম্ভব হয় যে, রাজনৈতিক অবকাঠামো, কমান্ডব্যবস্থা এবং তৎপরতার সুপরিকল্পিত কর্মসূচী ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের সামান্য অংশকে, বড় জোর এক পঞ্চমাংশকে, আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। সশস্ত্র তৎপরতার পক্ষে অনুপযোগী এই চার-পঞ্চমাংশের ক্ষতিকর প্রভাব যথাসম্ভব হ্রাস করার জন্য স্ক্রীনিং ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পক্ষে অভিমত জোরদার হতে থাকে। কিন্তু সম্ভবত নিয়মিত বাহিনীর সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যস্ততার দরুন, বাংলাদেশের উর্ধতন সামরিক নেতৃত্বকে এই সব সমস্যার সমাধানে বিশেষ উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যে চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগ ছিল, তাও আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে সামান্যই কার্যকর হয়। ফলে সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসে কুড়ি হাজার করে নতুন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিংয়ের বিষয়ে বাংলাদেশ নেতৃত্ব উৎসাহ প্রকাশ করলেও কার্যক্ষেত্রে এদেরকে সদ্ব্যবহার করার আয়োজন অসংগঠিত থাকে।

অথচ অন্যদিকে ভারত যখন উত্তরোত্তর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ভিন্ন শরণার্থী সমস্যার কোন সত্যিকারের সমাধান নেই, তখন ভারতের পরিবর্তনমান সমর পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুসারে মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তদনুসারে অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বেকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশ সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের দেশে পাঠানো শুরু হয়। দেশের ভিতরে মুক্তিযুদ্ধের উপযোগী কোন রাজনৈতিক সংগঠন থাকুক অথবা না-ই থাকুক, মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার মত কোন কমান্ডব্যবস্থা তৈরী হোক বা না-ই হোক, সে সবের প্রতি দৃকপাত না করে কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাবৃদ্ধির উপরেই জোর দেওয়া হয়।[১৩৯] এর ফলাফল সর্বত্র শুভ হয়নি।

শক্তিক্ষয় ও দখলদার সৈন্যদের যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু যথোপযুক্ত রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং,[১৪০] পরিকল্পনা ও কমান্ডব্যবস্থার অধীনে অল্প

সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে একই ফল সঞ্চারের জন্য তার চাইতে অনেক বেশী মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ করতে হয়; কেননা রিক্রুটমেন্ট থেকে কমান্ড গঠন পর্যন্ত সর্ববিষয়েই অসন্তোষজনক অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে পাক সৈন্যদের দুর্বল ও পরিশ্রান্ত করে চূড়ান্ত বিজয়ের পথ প্রশস্ত করা হয় বটে, কিন্তু এর ফলে প্রত্যাশিত স্বাধীনতার পর সামাজিক অস্থিরতার শক্তিও প্রবল হয়ে ওঠে। অতিশয় সীমিত সময়ের মধ্যে ফলোৎপাদনে বাধ্য কোন পেশাদার সামরিক নেতৃত্বের পক্ষে সামাজিক ভারসাম্যের এইসব সূক্ষ্ম যুক্তির প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার মত কোন অবকাশ ছিল না।

একই সময়ে শত্রুকে শ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীকেও সীমান্তসংঘর্ষে সক্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। জুন- জুলাইয়ের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, দেশের ভিতরে সশস্ত্র তৎপরতার পাশাপাশি সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু করার প্রচেষ্টা চলে, যাতে (১) ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের সুবিধা হয়; এবং (২) পাকিস্তানী বাহিনী দীর্ঘ সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত হয়ে পড়ার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। আসন্ন শীতকালে বৃহত্তর অভিযানের চিন্তা সম্মুখে রেখে, পাকিস্তানকে এমনি খণ্ড খণ্ডভাবে সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত করার জন্য সীমান্ত সংঘর্ষকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু পূর্ব আলোচিত কারণে বাংলাদেশে সেক্টর অধিনায়কদের তৎপরতার মান প্রধান সেনাপতি ওসমানীরও গভীর নৈরাশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৪১]

সেক্টর অধিনায়কদের মধ্যে যারা সীমান্তে পাকিস্তানী অবস্থানের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর পক্ষে উদ্যোগী ছিলেন, তারাও এমন কিছু মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হন যেগুলির কোন সমাধান তাদের জানা ছিল না। যেমন, নিয়মিত বাহিনীকে প্রায় শেষ অবধি ভারতের ভূখণ্ড থেকেই তৎপরতা চালাতে হয়; তা ছাড়া, নিয়মিত বাহিনীর নিজস্ব কোন সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থা (Logistics) না থাকায় এবং আক্রমণের ক্ষেত্রে অনেক সময় গোলন্দাজ সহায়তা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হওয়ায়, সীমান্ত তৎপরতার জন্য অনেক সময়েই তাদেরকে ভারতের সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হত। এ ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতার যে অভাব ঘটত তা নয়, কিন্তু তা পাওয়া যেত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডের নিরাপত্তা, তাদের জনপদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের উপর পাকিস্তানী গোলন্দাজ প্রতি- আক্রমণের ঝুঁকি বিবেচনা করার পর। এতেও

হয়ত অসুবিধা হত না, যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে তৎপরতা চালাবার প্রয়োজন এবং প্রতি- আক্রমণের ঝুঁকি সম্পর্কে বাংলাদেশ সেক্টর ইউনিট ও ভারতীয় ফরমেশনের পর্যায়ে মিলিত আলাপ- আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসার কোন নিয়মিত ব্যবস্থা থাকত।

বস্তুত আগস্ট অবধি বিডিএফ (Bangladesh Forces) সদর দফতর সীমান্ত তৎপরতার বিষয়ে সেক্টর বাহিনীকে সাধারণত কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ দিতেন না। সীমান্ত তৎপরতা কার্যত সেক্টর অধিনায়কদের পরিকল্পনা ও উদ্যোগের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ সময় অবধি সেক্টর তৎপরতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় দাঁড়ায়। জুলাইয়ের শেষ দিকে ভারতের ‘ইস্টার্ন কমান্ড’-এর ডিরেক্টর’অপারেশনস্- এর দায়িত্ব নেওয়ার পর মেজর জেনারেল বি. এন. সরকার বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের অপারেশনস্ পরিকল্পনায় বিরাজমান শূন্যতা দৃষ্টে তিনি আগস্টের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রত্যেক মাসের জন্য তৎপরতা- টার্গেটের তালিকা তৈরী করতেন এবং প্রস্তাবাকারে তার এক কপি পাঠাতেন ওসমানীর মাধ্যমে সেক্টর অধিনায়কদের কাছে এবং অন্য কপি ভারতের সংশ্লিষ্ট ফরমেশন কমান্ডারদের কাছে।[১৪২] উদ্দেশ্য ছিল এগুলি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সেক্টরকে আগ্রহী করে তোলা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভারতীয় ফরমেশন কমান্ডারদের অবহিত রাখা। আগস্ট থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রতি মাসের টার্গেট পরিকল্পনার কাজ অক্টোবর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রস্তাবিত এই সব তৎপরতার টার্গেটকে যথাযথ আক্রমণ পরিকল্পনায় পরিণত করার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ সেক্টর নেতৃত্বের এবং অনুমান করা হত এ ব্যাপারে ভারতীয় ফরমেশন নেতৃত্বের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, বিশেষত সেপ্টেম্বরে, ভারতীয় সহযোগিতার ভিত্তিতে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের পক্ষে সেক্টর অধিনায়কদের প্রতি না- ছিল বাংলাদেশ হেডকোয়ার্টারের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ, না- ছিল অনুকূল আবহাওয়া।

প্রায় আগস্ট পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারতের কৃচ্ছ্রতা এবং এর পাশাপাশি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে গড়িমসির ফলে ভারতের প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অনেকের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভালভাবেই দানা বেঁধেছে। তা ছাড়া দীর্ঘদিন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধীনস্থ থাকার কালে ভারত

সম্পর্কে যে মতবাদ বদ্ধমূল হয়ে তোলা হয়েছিল (indoctrination), অনেকের মধ্যে তাও পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় ফরমেশনের অপেক্ষাকৃত পদস্থ অফিসারদের মধ্যে কারো কারো পদমর্যাদা- সচেতন পেশাদারী আচরণ, বিদ্রোহী তরুণ অফিসারদের আবেগপূর্ণ মানসিকতা উপলব্ধিতে অক্ষমতা, উর্দু ভাষার উপর বীতশ্রদ্ধ বাংলাদেশ সৈন্যদের সঙ্গে যথেচ্ছ হিন্দী ভাষা ব্যবহার ইত্যাকার আচরণ এবং অক্ষমতায় সম্পর্কের আবহাওয়াকে আরও খারাপ করে তোলে। এইরূপ আবহাওয়ার মাঝে এবং বিডিএফ সদর দফতরের সুস্পষ্ট নির্দেশের অনুপস্থিতিতে সেক্টর- নেতৃত্ব ভারতীয় ফরমেশনের সঙ্গে যথোপযুক্ত আলোচনা না- করেই কিছু কিছু আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে। ফলে সেপ্টেম্বরে বিশেষত পূর্বাঞ্চল ও উত্তর- পূর্বাঞ্চলে নিয়মিত বাহিনী যেখানে সক্রিয় ছিল, সেখান থেকে তাদের তৎপরতা সম্পর্কে সাফল্য অপেক্ষা ক্ষয়ক্ষতি বিপর্যয়ের সংবাদই বেশী আসতে থাকে।

৮ থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বরে এই সব অঞ্চল সফর করার পর বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য সচিব ড. টি. হোসেন এ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত অথচ বাস্তবধর্মী রিপোর্ট[১৪৩] মন্ত্রিসভার কাছে পেশ করেন এ প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃতির যোগ্য:

"I have witnessed two operations, one at Baranpunji and one at Balat. The complains are the same. Our boys were not given adequate artillery cover. Indian artillery is inferior (if the range of Pak artillery is 5 miles, Indian artillery goes upto 3 miles). I do not know how far this is true but the complains were uniform everywhere. The Indian sides were found unprepared both at Baranpunji, where Pak army actually entered Indian territory and encircled our boys 3 miles inside, and at balas. Indian response was late by 24 hours....

"At Melaghar our casualty is enormous and mostly due to inadequate supply of ammunition.

"The borders are effectively sealed by Pak army. A few miles of liberated areas are being recaptured particularly along Balas to Bassara borders.

“I ventured to enquire from the Indian side. They said our boys entered without planning and information to their counterpart, so they were not ready for the offensive.

“Any way these problems are to be sorted out at local levels to make them consistent with higher level agreement before any optimism is indulged in our reliance on our host.”

সেপ্টেম্বর- অক্টোবর দেশরক্ষা মন্ত্রী তাজউদ্দিন মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার রাজনৈতিক দিক নিয়ে মেজর জেনারেল সরকারের সঙ্গে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে আমাকে নিযুক্ত করতেন। এই সুবাদে সেই সময় নিয়মিত বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সংবাদ আসার পর এগুলির পুনরাবৃত্তি রোধ করার উপায় উদ্ভাবনের যে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা চলতে থাকে, সে সম্পর্কে মোটামুটিভাবে অবহিত থাকতাম। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এবং অক্টোবরের প্রথম দিকে এই চিন্তাভাবনা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা থেকে দুটো উপলব্ধি মুখ্য হয়ে ওঠে। প্রথমত, নিয়মিত বাহিনী যদিও বাংলাদেশ কমান্ডের অধীন, তবু যে সব অঞ্চল থেকে সশস্ত্র তৎপরতা চালানো হত সেই সব অঞ্চল ভারতীয় ভূখণ্ড বিধায় পাকিস্তানী পাল্টা- আক্রমণের ঝুঁকি[১৪৪] ছিল মুখ্যত ভারতেরই। তা ছাড়া এই সব তৎপরতার সফল পরিচালনার জন্য ভারতের অন্যবিধ সহযোগিতারও প্রয়োজন ছিল। কাজেই তৎপরতার স্থান নির্বাচন ছাড়াও এর সাফল্যের জন্য উভয় পক্ষের স্থানীয় ইউনিটের মিলিত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু অক্টোবরে এই যুগ্ম- পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটার পরেও যখন কয়েকটি তৎপরতা ব্যর্থ হয়, তখন এই ব্যর্থতার জন্য পরস্পরের প্রতি দোষারোপের চেষ্টা ক্রমান্বয়ে তিক্ত আকার ধারণ করে।[১৪৫] এর ফলে দ্বিতীয় উপলব্ধিও ক্রমশ অত্যন্ত জোরাল হয়ে ওঠে: কোন তৎপরতায় যেখানে একাধিক স্বতন্ত্র বাহিনীকে একযোগে কাজ করতে হয়, সেখানে দ্বৈত কমান্ডের উপস্থিতি ব্যর্থতার পথকেই কেবল প্রশস্ত করে। সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ও অবিভাজ্য। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রথম মহাযুদ্ধকালে মিত্র দেশগুলির মধ্যে সম্মিলিত কমান্ডব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। খুব সীমিত পরিসরে হলেও সীমান্ত তৎপরতা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেক্টর ও ভারতীয় ফরমেশনের যুগ্ম- কমান্ড গঠনের আবশ্যকতা অত্যন্ত জরুরী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই প্রশ্নে ওসমানীকে সম্মত করাতে তাজউদ্দিনকে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়। ওসমানীর তীব্র বিরোধিতাকে অতিক্রম করে অক্টোবরের শেষ দিকে সীমান্ত যুদ্ধের জন্য অবশেষে যখন যুগ্ম- কমান্ড গঠিত হয়, তখন রণক্ষেত্রের বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং ফলে যুগ্ম- কমান্ড গঠনের মূল উদ্দেশ্যও অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রথমত, জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন প্রথম ব্রিগেড 'কার্যকরভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায়' এবং 'নিকট ভবিষ্যতে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা না- থাকায়' প্রধান সেনাপতি ওসমানী তাঁর নতুন 'Ops plan' অনুযায়ী সিলেটের চা বাগানে এই ব্রিগেডকে কোম্পানী/ পেটুন গ্রুপে ভাগ করে গেরিলা তৎপরতা চালাবার জন্য নিয়োগ করেন। ফলে তিনটি পুরাতন ব্যাটালিয়ানের বড় অংশই সীমান্ত যুদ্ধ থেকে বাদ পড়ে। দ্বিতীয়ত, সেপ্টেম্বরের শেষে ইন্দিরা গান্ধীর সাফল্যজনক মস্কো সফরের পর ভারতীয় 'ইস্টার্ন কমান্ড'কে যখন জানান হয় যে অতঃপর ভারতীয় বাহিনীকে কেবলমাত্র 'অবস্থান- অঞ্চল' গঠনের লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই,[১৪৬] তখন বৃহত্তর ভূমিকার প্রস্তুতি হিসাবে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় বাহিনী নিজেরাই পাকিস্তানী অবস্থানের বিরুদ্ধে সীমান্ত সংঘর্ষে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে- প্রথমে ব্যাটালিয়ান পর্যায়ে, পরে ব্রিগেড পর্যায়ে। ফলে তাদের কাছে বাংলাদেশের সেক্টর ইউনিটের গুরুত্ব দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে।

পাশাপাশি, পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বেড়ে ওঠায়, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি করে পাকিস্তানী বাহিনীকে যুদ্ধ- পরিশ্রান্ত করে তোলার জন্য ভারতীয় পক্ষের আগ্রহ অক্টোবর নাগাদ গভীরতর হয়। ওসমানী তাঁর পরিবর্তিত 'Ops plan' অনুযায়ী নিয়মিত বাহিনীর একাংশকে 'গেরিলা যুদ্ধে' দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারতীয় আগ্রহ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

অধ্যায়- ১৫: সেপ্টেম্বর - অক্টোবর

সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসে কুড়ি হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দানের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের প্রবাসী প্রশাসনের জন্য এক বড় সমস্যা হয়ে

দাঁড়ায়। প্রথম থেকেই বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে মনোনয়ন দেওয়া একটি জটিল সমস্যা ছিল। উপযুক্ত এই সব যুবকদের আলাদা আশ্রয় এবং তাদের দৈহিক সুস্থতা ও মানসিক উদ্দীপনা বজায় রাখার জন্য জুনের প্রথম সপ্তাহে 'যুব শিবির' স্থাপনের স্কীম অনুমোদিত হয়। জুনের শেষ সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা শুরুর অব্যবহিত পর দেশের যুব সম্প্রদায় যখন পাকিস্তানী বাহিনীর বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তখন থেকে আরও অধিক সংখ্যায় তারা ভারতে পালিয়ে আসতে থাকে। ফলে ট্রেনিং প্রার্থী এই অতিরিক্ত যুবকদের সাময়িক আশ্রয়স্থল হিসাবে ২৪টি যুব শিবির প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা ছাড়াও 'যুব অভ্যর্থনা শিবির' স্থাপনের কাজ চলতে থাকে। যুব শিবিরের বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ১লা আগস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, যুব শিবির স্থাপনের কাজ খুবই মন্থরগতিতে অগ্রসর হলেও, ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় ৬৭টি 'অভ্যর্থনা শিবির' স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়।[১৪৭] আর এক রিপোর্টে দেখা যায়, ১২ই আগস্ট পর্যন্ত স্থাপিত যুব শিবিরের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১টি।[১৪৮]

প্রয়োজনীয় স্ক্রীনিং- এর পর গড়পড়তা ৫০০ যুবককে 'অভ্যর্থনা শিবিরে' গ্রহণ করা হত, পরে তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে[১৪৯] ১,০০০টি আসনবিশিষ্ট 'যুব শিবিরে' স্থানান্তরিত করা হত। সবশেষে এই 'যুব শিবির' থেকেই সশস্ত্র ট্রেনিংয়ের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীতদের 'ট্রেনিং শিবিরে' পাঠানো হত। এই পর্যায়ক্রমিক স্ক্রীনিং- এর মাধ্যমে দৈহিক ও চারিত্রিক যোগ্যতার ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করার যে সুযোগ ছিল তা পূর্ব বর্ণিত রাজনৈতিক কারণে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়। রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং ব্যবস্থার মৌলিক দুর্বলতার সংশোধন না- করে কেবল 'যুব শিবির' ও 'অভ্যর্থনা শিবিরে'র দ্রুত সংখ্যা বাড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। অবশ্য ১৫, ১৬ই এবং ২১শে সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র, সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'যুব শিবিরের বোর্ড অব কন্ট্রোল' এবং 'কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসন কমিটির' যুগ্ম অধিবেশনে যুব শিবির ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উদ্দেশ্যে কিছু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যুব শিবিরের ডিরেক্টর এবং তার প্রশাসনিক সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল বরাবর ২৪টি 'যুব শিবির' এবং ১০০টি 'অভ্যর্থনা শিবির' স্থাপনের লক্ষ্য অর্জিত হয়।[১৫০]

বস্তুত কেবল যুব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নয়, প্রবাসী সরকারের প্রশাসন বিভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক উল্লেখযোগ্য দক্ষতার মান স্থাপনে সক্ষম হন।[১৫১] মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এক নির্বাসিত জনসমষ্টির মধ্য থেকে নাতিক্ষুদ্র প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং এক যুক্তিসঙ্গত দক্ষতার মানে তাদেরকে সক্রিয় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলা যে কোন বিচারেই এক প্রশংসাযোগ্য দৃষ্টান্ত। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আওয়ামী লীগের উপদলীয় সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠলেও, এর ফলে সরকারের কাঠামো যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি সম্ভবত তার একটি কারণ ছিল নির্দলীয় প্রশাসন বিভাগের কর্তব্যবোধ এবং অপর কারণ ছিল, রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী সফল প্রয়াস। 'অধিকাংশ প্রশাসনিক দফতরে আওয়ামী লীগ আদর্শে বিশ্বাসী নয়, এমন সব অফিসারদের 'কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য' অথবা সরকারী প্রশাসনের প্রতিটি শাখা আওয়ামী লীগের দলীয় ব্যবস্থাধীনে আনার জন্য পরিষদ সদস্যদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ যখন 'পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী' বা দলীয় কমিটি নিয়োগের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তখন প্রকৃতপক্ষে একা তাজউদ্দিন এই দাবীকে প্রতিহত করেন, যাতে রাজনৈতিক দলাদলি প্রশাসন বিভাগের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। তবে সমগ্র প্রশাসনিক তৎপরতাকে অধিকতর সমন্বিত এবং বিশেষত প্রচারমাধ্যমকে ফলপ্রসূ করার জন্য কিছু অভিজ্ঞ ও প্রবীণ অফিসারের যে প্রয়োজন তাজউদ্দিন বোধ করতেন, অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা অপূর্ণ থাকে।[১৫২]

জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে 'পরিকল্পনা সেল' গঠিত হওয়ার পর যুদ্ধোত্তর জরুরী সরবরাহ, শরণার্থী পুনর্বাসন, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন এবং প্রশাসনিক সংস্কারের মত অত্যন্ত জরুরী, প্রাসঙ্গিক এমনকি মধ্যমেয়াদী কয়েকটি বিষয়ে নীতি ও কর্মসূচীর পরিকল্পনা শুরু করেন। আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ বাঙালী কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করার পর বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির এক অসামান্য সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আগস্টের শেষ দিক থেকে নিক্সন প্রশাসনের বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রমের সঙ্গে খোন্দকার মোশতাক ও মাহবুব আলম চাষী উভয়েই উত্তরোত্তর জড়িত হয়ে পড়ায়, বাংলাদেশের এই কূটনীতিকরা যে যথাযথভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন বা তাদের কুশলতার যে পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটেছিল, এমন মনে করার কোন ভিত্তি নেই। মুক্তিসংগ্রামের বৃহত্তর রণনৈতিক আয়োজন সম্পর্কে এদের অবহিত করে,

এদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার মূল অংশকে তৃতীয় বিশ্বে- কেন্দ্রীভূত করলেও বরং ডিসেম্বরে সাধারণ পরিষদের ভোট বাংলাদেশের পক্ষে হয়ত অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক হত। বস্তুত এই সব কূটনীতিকদের কিভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে, তার সামান্য খবরই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে এসে পৌঁছাত এবং যা পাঠানো হত সেগুলি তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরুত্বের অধিক ছিল না। তবু সমগ্র অবস্থার বিচারে অক্টোবরের মাঝামাঝি বাংলাদেশ সরকার অন্তত প্রশাসনিক দিক থেকে বহুলাংশেই সক্ষম ও সংহত।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ঐ কথা ঠিক প্রযোজ্য না হলেও, সেখানেও অক্টোবরের প্রথম থেকেই উন্নতির লক্ষণ স্পষ্ট। নিক্সন প্রশাসনের অন্তর্ঘাতী প্রচেষ্টা আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রণনৈতিক আয়োজনের আন্তর্জাতিক দিক প্রত্যাশিত পথে এগিয়ে চলায় তাজউদ্দিন আশাবাদী ছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় পরিস্ফুট হওয়া মাত্রই উপদলীয় বিরোধিতার সমাধান সহজ হয়ে আসবে। সামরিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর সীমান্ত তৎপরতা নানা কারণে স্তিমিত। দেশের ভিতরে রাজনৈতিক অবকাঠামো এবং একীভূত কমান্ডব্যবস্থা না থাকায় অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের সমাবেশ সত্ত্বেও তাদের সম্ভাব্য তৎপরতার ফলাফল অজ্ঞাত। বস্তুত সশস্ত্র তৎপরতার কোন বড় চিহ্ন তখনও বিশেষ ছিল না।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ধীরে ধীরে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। ১০ই অক্টোবর ডেমরায় বোমা বিস্ফোরণ, ১১ই অক্টোবর তেজগাঁও বিমানবন্দরের উদ্দেশে অসফল মর্টার আক্রমণ, ১৩ই অক্টোবর টঙ্গীর অদূরে রেলগাড়ী সমেত রেল-ব্রীজের ধ্বংসসাধন এবং তার পর থেকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারী অফিস ও ব্যাংকে বোমা বিস্ফোরণ, বিভিন্ন স্থানে টহলদার অথবা অবস্থানরত বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের যে নতুন পর্যায় শুরু হয়, ক্রমশ তা অক্টোবরের শেষ নাগাদ দখলদার সৈন্যদের ক্ষয়ক্ষতি ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে। ইতিপূর্বে জুন ও আগস্ট মাসের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে রেল ও সড়ক ব্রীজ এবং যানবাহনের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। এর ফলে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে পরিচালিত US-AID- এর এক সার্ভে অনুযায়ী- স্থলপথে পরিবহনের হার আগের তুলনায় এক- দশমাংশে নেমে আসে।[১৫৩] এগুলি প্রয়োজনীয় মেরামত সম্পন্ন হওয়ার আগেই

মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন আক্রমণ দখলদার বাহিনীর অভ্যন্তরীণ চলাচলের ক্ষমতাকে আরও সঙ্কুচিত করতে শুরু করে। এর পাশাপাশি ১৫ই আগস্ট থেকে সামুদ্রিক জাহাজ ও অভ্যন্তরীণ নৌযানের বিরুদ্ধে যে দুঃসাহসিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল ১৯ ও ২৬শে সেপ্টেম্বরে এবং ১লা অক্টোবরে তা আরও ক্ষতিসাধন করে চলে।[১৫৪] এর ফলে বিশেষত বাণিজ্যিক নৌমহলে আতঙ্কের সঞ্চার ঘটে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দখলদার সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা উত্তরোত্তর কষ্টকর হয়ে ওঠে।[১৫৫]

একই সময় সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য চলাচল, অবস্থান ও যোগাযোগের উপযোগী সামরিক অবকাঠামো তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়ে আসায়,[১৫৬] ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত সমাবেশ দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে এবং বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীর মিলিত অভিযান পাকিস্তানের অবশিষ্ট সীমান্ত ঘাঁটির (B.O.P) ধ্বংস সাধনে নিয়োজিত হয়। ফলে অক্টোবরের শেষ নাগাদ সর্বমোট ৩৭০টি সীমান্ত ঘাঁটির মধ্যে মাত্র ৯০টি টিকে থাকে।[১৫৭] কিন্তু কোন কোন অভিযানে একাধিক ভারতীয় ব্যাটালিয়ান অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও, পাকিস্তানের সুরক্ষিত সীমান্ত ঘাঁটিগুলির জোরাল প্রতিরোধ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ফলে গৃহীতব্য রণকৌশল সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন উপলব্ধি ঘটে: সম্মুখ সমরে এই সব সুদৃঢ় সীমান্ত ঘাঁটি পরাভূত করা যেহেতু খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, সেহেতু এই সব ঘাঁটি পাশ কাটিয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাওয়াই দ্রুত বিজয় লাভের অন্যতম মূল পূর্বশর্ত।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দেশের ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং দেশের সীমান্তে মিলিত বাহিনীর যে আক্রমণ শুরু হয়, তা মূলত ছিল জুন- জুলাই মাসে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরিচালিত। ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকে একযোগে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি হলে তারা যে ভিতরের প্রয়োজন অনেকখানি উপেক্ষা করেই সীমান্ত অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে গেরিলা তৎপরতার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও দখলদার বাহিনী যে খণ্ড- বিখণ্ড হয়ে পড়ে তা এ সময়েই পরিলক্ষিত হয়। ছোট বড় কোন প্রকার ভূখণ্ড হারানো রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানীদের মেনে নেওয়া সম্ভব নয় এবং এর জন্য নিজেদের একীভূত শক্তিকে খণ্ড- বিখণ্ড করতেও যে তাদের কোন দ্বিধা নেই, তিন মাস পূর্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম তৎপরতাকালেই তা স্পষ্ট হয়েছিল। এবার তফাৎ প্রথমত, ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট সামরিক

লক্ষ্যের অভিমুখে সংখ্যায় অল্প বাংলাদেশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য কয়েক গুণ বড় ও শক্তিশালী ভারতীয় সৈন্য সীমান্ত অঞ্চল বরাবর চাপ সৃষ্টির কাজে তৎপর হয়; এবং দ্বিতীয়ত, দেশের ভিতরে বিরামহীন ঢেউয়ের মত সশস্ত্র তরুণের দল যাতে পিছন থেকে শত্রুর শক্তিক্ষয় করে যেতে পারে তার ব্যবস্থাদিও সম্পন্ন করা হয়। অক্টোবরের শেষে এই যুগ্ম তৎপরতা দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যদের জন্য এক সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে বড় রকমের বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা তাদের লোপ পায়।[১৫৮]

১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তান কেবল পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে নিরস্ত্র বাঙালীদের নিপীড়ন ও হত্যার জন্য পক্ষকালের মধ্যে আরো দুই ডিভিশন সৈন্য নিয়ে এসে গোটা পূর্বাঞ্চলকে বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত করার সময় সম্ভবত তারা কল্পনাও করে উঠতে পারেনি যে, এই নির্বুদ্ধিতার মূল্য হিসাবে শীঘ্রই তাদেরকে তিন রণাঙ্গনে যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে হবে পশ্চিমাঞ্চলে, পূর্বাঞ্চলের সীমান্তে এবং পূর্বাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ জনপদে।

অধ্যায়- ১৬: অক্টোবর

অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কোন নতুন উপাদানের সংযোজন ঘটেনি, যার ফলে উপমহাদেশের ঘটনাধারায় কোন দিক-পরিবর্তন সম্ভব ছিল। পাকিস্তানের সামরিক কোটারী ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন আগের মতই অনিচ্ছুক। কাজেই তাদের পক্ষে রাজনৈতিক মীমাংসার কোন নতুন প্রস্তাব তোলা বা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। পূর্বাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য তৎপরতা যদি সত্যই বিপদমাত্রা অতিক্রম করে, তবে তা প্রতিরোধের সর্বশেষ উপায় হিসাবে তারা সীমিত আকারে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটনের জন্য পশ্চিম ও পূর্ব উভয় সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ সম্পন্ন করে। কিন্তু পরিবর্তিত শক্তির ভারসাম্যে নিজেদের দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে, যুদ্ধ অথবা কূটনীতি যে উপায়েই হোক পূর্ব বাংলার উপর দখল যাতে বজায় রাখা সম্ভব হয়, তজ্জন্য আমেরিকার উপরেই ইয়াহিয়া সরকারকে সর্বাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে

দেখা যায়। আমেরিকাও ছিল মুক্তিযুদ্ধ প্রতিরোধ, তথা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় আগের মত বদ্ধপরিকর। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা রোধ করার ক্ষেত্রে তাদের সকল প্রয়াস যেমন তখন অবধি অসফল, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের প্রশ্নে ভারতকে নিবৃত্ত করার উপায়ও তাদের অজানা। পাকিস্তানের অপর মিত্র চীন সঙ্কটের প্রথম দিকে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থনসূচক অভিমত প্রকাশ করার পর বিগত কয়েক মাস যাবত রহস্যময়ভাবেই নীরব হয়ে থাকে।[১৫৯] কিন্তু ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর ভারত-সোভিয়েট যুক্তইশতেহার প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের বিরুদ্ধে চীনের সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আরো হ্রাস পেয়েছে বলে অনুমান করা সঙ্গত ছিল। অন্যদিকে জুলাই থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রমশ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির নিকটবর্তী হয়ে ওঠার পরেও শেখ মুজিবের মুক্তি ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা সম্পর্কে যেটুকু আশা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ছিল, পাকিস্তানের অনমনীয়তার দরুন অক্টোবরের শেষ দিকে তা নিঃশেষিত হয় এবং ফলে সোভিয়েট ভূমিকা মৈত্রীচুক্তির নবম ধারার অধীনে কার্যকর হতে শুরু করে। আর ভারত শরণার্থী সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ উপায় হিসাবে সামরিক পদক্ষেপ সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরোক্ষ সমর্থন আদায়ের পর এতদসংক্রান্ত অবশিষ্ট সামরিক ও কূটনৈতিক আয়োজন সম্পন্ন করার কাজে পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করে।

কাজেই বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে অক্টোবরের শেষে আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য স্পষ্টতই ছিল দখলদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করার পূর্বে অবশিষ্ট মূল ছিল, সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার আগেই এই অভিযান সফলভাবে পরিসমাপ্ত করার সম্ভাব্যতা নিয়ে।

অক্টোবরের প্রথমার্ধে পাকিস্তান তার সমর-প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। তৎসত্ত্বেও পশ্চিম, পূর্ব এবং আভ্যন্তরীণ - এই তিন রণাঙ্গনের যুদ্ধের কথা বিবেচনা করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের উপর প্রায় সর্বতোভাবেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বরের শেষে মস্কো থেকে প্রকাশিত ভারত-সোভিয়েট যুক্ত ঘোষণার মর্ম পাকিস্তানের জন্য বিশেষ দুর্বোধ্য ছিল না। তদুপরি সেপ্টেম্বর থেকে চীনের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান শুরু হওয়ায় চীনা সশস্ত্রবাহিনীর উপর এর প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ অগোচরে থাকার কথা নয়। তা ছাড়া লিন পিয়াও-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানেরও দু’ সপ্তাহ আগে

সম্ভাব্য পাক- ভারত যুদ্ধে চীনের প্রত্যাশিত ভূমিকা সম্পর্কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত খাজা মোহাম্মদ কায়সার তাঁর ‘অনিশ্চয়তাবোধের’ কথা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মদ খানকে জ্ঞাপন করেন।[১৬০]

এই ‘অনিশ্চয়তাবোধ’ পাকিস্তানের জন্য অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ সম্ভবত গভীর উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়। মস্কো- ঘোষণার মর্ম ও চীনের শুদ্ধি অভিযানের তাৎপর্য ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণের সংবাদ এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে ভারতের সৈন্য সমাবেশের আয়োজন দৃষ্টে পাকিস্তান নিজস্ব নিরাপত্তার সকল জিম্মাদারী কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করেন। ৭ই অক্টোবর ইয়াহিয়া উপমহাদেশে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি রোধকল্পে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ‘ব্যক্তিগত উদ্যোগ’ কামনা করে কিসিঞ্জারকে এক জরুরী বার্তা পাঠান।[১৬১] কিসিঞ্জার ঐ দিনই ‘উপমহাদেশে যুদ্ধের আশঙ্কা রোধ করার উদ্দেশ্যে’ যুক্তরাষ্ট্রের National Security Council (NSC)- এর কার্যকরী উপসংস্থা Washington Special Action Group (WSAG)- এর জরুরী বৈঠক তলব করেন। এই উপসংস্থা ক্রমবর্ধমান বিপদ থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য পাক- ভারত সীমান্ত থেকে উভয়পক্ষেও সৈন্য প্রত্যাহার করার পক্ষে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৬২] এর মধ্যে অন্যতম মূল উদ্যোগ ছিল সীমান্ত থেকে সৈন্য অপসারণ এবং বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা প্রেরণ বন্ধের ব্যাপারে ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নকে সম্মত করানো।[১৬৩] অবশ্য সরাসরি ভারতের উপর চাপ প্রয়োগের ব্যাপারেও মার্কিন সরকারের কোন কুণ্ঠা ছিল না। ১২ই অক্টোবর দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্পষ্ট ভাষায় অবহিত করেন, ভারত যদি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য প্রদান থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে পাকিস্তান পশ্চিম দিক থেকে ভারত আক্রমণ করবে।[১৬৪]

বৃহৎ শক্তির পর্যায়ে উত্তেজনা হ্রাসের এক সম্ভাবনা বিরাজমান থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত ভারতের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে সোভিয়েট সহযোগিতা লাভের আশা করেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সোভিয়েট ভূমিকা ছিল ভিন্নতর। সোভিয়েট ইউনিয়ন উদ্ভূত সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল ঠিকই কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা যে ভারত- সোভিয়েট যুক্তইশতেহারে বর্ণিত রাজনৈতিক দাবীর অনুবর্তী, তা পুনর্ব্যক্ত করা হয় ১০ই অক্টোবরে প্রাভ্‌দায় প্রকাশিত পাঁচ- কলাম দীর্ঘ এক বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধে।[১৬৫] তারপরেও সোভিয়েট

মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য মার্কিন তৎপরতা ক্রমশই জোরদার হতে থাকে।

কিন্তু ‘ক্ষমতা হস্তান্তরের’ জন্য ১২ই অক্টোবর ইয়াহিয়া খানের নতুন আর এক কর্মসূচী ঘোষিত হয়। এতদিন শেখ মুজিবের মুক্তি, পূর্ববঙ্গবাসীর অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিকে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং সম্মান ও নিরাপত্তাসহ শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের দাবীতে সোভিয়েট সরকারী প্রচারমাধ্যমগুলি উত্তরোত্তর সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এর কোন কিছুই যে পাকিস্তানী শাসকদের চিন্তাভাবনাকে সামান্যতম অর্থেও প্রভাবিত করেনি, ইয়াহিয়ার বক্তৃতা ছিল তারই প্রমাণ। ইয়াহিয়া এই বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপোস রফার কোন তোয়াক্কা না করেই অবৈধভাবে শূন্য ঘোষিত জাতীয় পরিষদের ৭৮টি আসনে ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ২৭শে ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[১৬৬] এর পাশাপাশি পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ সম্পন্ন করার ফলে এই আশঙ্কা স্পষ্টতর হয়, যে প্রকারেই হোক পূর্ব বাংলার উপর নিজেদের দখল কায়েম রাখাই পাকিস্তানের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই পটভূমিতে ‘উপমহাদেশে উত্তেজনা হ্রাসের জন্য’ যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক উদ্যোগের প্রকৃত মর্ম কি তা সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হয়নি। অপরদিকে শরণার্থী সমস্যা ভারতের জন্য চিরস্থায়ী বোঝা হয়ে উঠতে পারে এই মর্মে ভারতের বিরোধীদলসমূহের প্রচারণায় কংগ্রেস সরকারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে ক্রমেই আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠছে এবং কংগ্রেস দলের মঙ্গল- অমঙ্গল যে বহুলাংশেই স্বচ্ছতর সোভিয়েট ভূমিকার উপর নির্ভরশীল, তাও সম্ভবত সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের তখন আর অজানা নয়। নববর্ষে ভারতের নয়টি রাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের মুখে বাংলাদেশ - সমস্যা নিয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থার জন্য দক্ষিণপন্থী দলগুলির প্রচারণা কংগ্রেস সরকার এবং ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তির বিরুদ্ধে সমভাবেই তীব্রতর হতে থাকে।[১৬৭]

এই অবস্থায় ১৬ই অক্টোবর সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র প্রাভদার ‘রাজনৈতিক ভাষ্যকার’ (সম্ভবত সোভিয়েট পার্টির কোন ঊর্ধ্বতন মুখপাত্র) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, উপমহাদেশে উত্তেজনার কারণ এবং এই উত্তেজনার দ্রুত বৃদ্ধির সমস্ত ‘দোষ সর্বতোভাবেই পাকিস্তানের একার।’[১৬৮] পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট মনোভাব

উত্তরোত্তর কঠোর হয়ে ওঠা সত্ত্বেও ১৮ই অক্টোবর মার্কিন রাষ্ট্রদূত বীম মস্কোয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর কাছে পাক-ভারত সীমান্ত থেকে উভয়পক্ষেও সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য মার্কিন-সোভিয়েট যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করেন।[১৬৯] ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল উ থানট অন্তত বাংলাদেশ প্রশ্নে প্রায়শ মার্কিন উদ্যোগের এক পরিপূরক ভূমিকা গ্রহণের প্রবণতা দেখাতেন। ২০শে অক্টোবরে তিনি পাকিস্তান ও ভারতের কাছে সমগ্র সীমান্ত বরাবর জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদল নিয়োগের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করেন। ২১শে অক্টোবর ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে 'ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে' উভয়পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহার করার অনুকূলে ত্বরিত সম্মতি জানান।[১৭০] ভারত সরকারের আনুষ্ঠানিক জবাব অনেক পরে দেওয়া হলেও, অন্য সূত্র থেকে ভারতের বক্তব্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হয়: 'বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তি এবং শরণার্থীদের সসম্মানে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে পাকিস্তানের সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত' ভারতের পক্ষে সৈন্য প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়; বিশেষত সীমান্ত থেকে ভারতের সৈন্য ঘাঁটিগুলি তুলনামূলকভাবে দূরে অবস্থিত হওয়ায় জরুরী অবস্থায় সৈন্য সমাবেশ যেখানে তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।[১৭১]

২২শে অক্টোবর সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিন দিল্লী এসে পৌঁছান। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বীমের পাঁচ দিন আগের প্রস্তাবের জবাবে ২৩শে অক্টোবর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মার্কিন সরকারকে জানিয়ে দেন যে, শেখ মুজিবের মুক্তি এবং 'পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সাধন' ব্যতীত কেবল সীমান্ত অঞ্চল থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে যুদ্ধের আশঙ্কা রোধ করা সম্ভব নয়।[১৭২] এদিকে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনয়নের জন্য, বিশেষত শরণার্থী প্রশ্নে ভারতের সমস্যা ও ভূমিকা পশ্চিম ইউরোপের কাছে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী ২৪শে অক্টোবরে দীর্ঘ উনিশ দিনের জন্য পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে দিল্লী ত্যাগ করেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই সব সাক্ষাৎকার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলির জন্য এত বেশী জল্পনা-কল্পনার বিষয় ছিল যে, ফিরুবিনের ভারত সফরের গুরুত্ব বিশেষ কোন প্রাধান্য লাভ করেনি। কিন্তু ২৭শে অক্টোবর ফিরুবিনের ভারত সফর শেষ হওয়ার পর দুই দেশের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়, 'বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক শান্তি

বিপন্ন হয়ে পড়ায়' ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তির নবম ধারার অধীনে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং 'সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে পূর্ণরূপে একমত যে পাকিস্তান খুব শীঘ্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করতে পারে।'[১৭৩] ফিরুবিনের প্রত্যাবর্তনের তিন দিনের মধ্যে সোভিয়েট বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল কুটাকভের নেতৃত্বে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সোভিয়েট সামরিক মিশন দিল্লী রওয়ানা হয়।[১৭৪] ১লা নভেম্বর থেকে আকাশ পথে শুরু হয় ভারতের জন্য সোভিয়েট সামরিক সরবরাহ।[১৭৫]

অক্টোবরে অধিকৃত অঞ্চলে পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যা, সন্ত্রাস ও নিপীড়নের শাসন তখনও বলবৎ।[১৭৬] এই হত্যা ও সন্ত্রাসের উপর একটা শাসনতান্ত্রিক আবরণ লাগানোর আয়োজনই ছিল ইয়াহিয়ার ১২ই অক্টোবরের বক্তৃতার মর্মকথা। ইয়াহিয়া যাতে এই দুষ্কর্ম সমাধা করার সুযোগ পায়, এ জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য প্রত্যাহার এবং এই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ছাড়া, সীমান্ত থেকে উভয় দেশের সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের মার্কিন প্রস্তাবের পিছনে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্ত পারাপার দুরূহ করে তোলার গূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগ কেবলমাত্র নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বলেই সম্ভব। ভেটো-ক্ষমতাসম্পন্ন সোভিয়েট ইউনিয়নকে এ ব্যাপারে সম্মত করানোর প্রয়োজন ছিল তাই সর্বাধিক। দৃশ্যত সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানের জন্য এই সঙ্কট থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটি মাত্র পথই খোলা রেখেছিল- তথা, শেখ মুজিবের মুক্তিসহ পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক বাসনা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে উদ্ভূত সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান এবং পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ সকল শরণার্থীর দ্রুত স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতকরণ। কিন্তু এই সব দাবী মেনে নেবার পর পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানী রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা যে কার্যত অসম্ভব, এই উপলব্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও সম্ভবত পূর্ণ মাত্রাতেই ছিল। কাজেই পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানের নগ্ন সামরিক দখল বৈধকরণ একমাত্র উপায় হিসাবে- ইয়াহিয়া ১২ই অক্টোবরের ঘোষণা অনুযায়ী - ৭৮টি জাতীয় পরিষদ আসনে প্রহসনমূলক উপনির্বাচন সমাপ্ত করা,[১৭৭] ইয়াহিয়ার 'বিশেষজ্ঞ' প্রণীত শাসনতন্ত্রের পক্ষে জাতীয় পরিষদের অনুমোদন লাভ করা এবং বেসামরিক প্রতিনিধিদের কাছে 'শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন করার' জন্য ইয়াহিয়ার প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া এবং ইত্যবসরে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের সহায়হায়

মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতীয় সহযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টাই ছিল মার্কিন কূটনৈতিক উদ্যোগের মূল কথা।

অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ এই মর্মে গৃহীত মার্কিন কূটনৈতিক উদ্যোগের ব্যর্থতা যখন স্পষ্ট হয়, তখনই অথবা তারও আগে কিসিঞ্জার পাকিস্তানের পক্ষে প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপের কথা বিবেচনা করেছিলেন কি না, তা আজও অজ্ঞাত। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে মার্কিন হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসৃত পন্থা ছিল মার্কিন নৌসেনার অবতরণ- যেমন ঘটেছিল পঞ্চাশের দশকে লেবাননে, ষাটের দশকে ডোমিনিকান রিপাবলিকে। কিন্তু ষাটের দশকের প্রারম্ভে দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ ধ্বংস ও হত্যার বিভীষিকা তুলনাহীনভাবে প্রসারিত করে। এর ফলে খোদ আমেরিকার সর্বত্র অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সামরিক হস্তক্ষেপ করার সরকারী নীতির বিরুদ্ধে এক প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রে এই হস্তক্ষেপবিরোধী জনমত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য বিরাটভাবে সহায়ক হয়। বাংলাদেশ প্রশ্নেও - বিশেষত পাকিস্তানী জান্তার অমানুষিক বর্বরতা এবং এই জান্তার সমর্থনে নিক্সন প্রশাসনের সহযোগিতার নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন সিনেট, হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ, সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ জনমত উত্তরোত্তর এমনভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে শুরু করে যে, মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে বাংলাদেশের অভ্যুদয় রোধ করার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের উদ্যোগ নেওয়া রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত দুরূহ হবে বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘমেয়াদী মার্কিন স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে জোট- নিরপেক্ষ ভারতের প্রাধান্য ও ক্ষমতা প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা মার্কিন প্রশাসনের একটি মৌল প্রয়োজন বলে পরিগণিত হওয়ায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে কোন সময়েই আমাদের পক্ষে নাকচ করা সম্ভব হয়নি।

বরং ২৫শে অক্টোবরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পুনর্বার উত্থাপিত হওয়ার প্রাক্কালে 'নিক্সনের সফরসূচী চূড়ান্তকরণের জন্য' পিকিং ও কিসিঞ্জারের প্রায় সপ্তাহব্যাপী আলোচনা, চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে তেইশ বছর দীর্ঘ মার্কিন বিরোধিতার অবসানান্তে চীনের সদস্যপদ লাভ[১৭৮] প্রভৃতি ঘটনার তাৎপর্য আমাদের মুক্তিসংগ্রামের জন্য কি দাঁড়াতে পারে তা নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার উদয় ঘটে। চীন ও আমেরিকার সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাকিস্তান যেটুকু

সহায়তা করেছিল, তার বিনিময়ে পাকিস্তানের স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য এই দুই শক্তির সমঝোতা ঘটা আমাদের জন্য অচিন্তনীয় ছিল না। বরং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা থেকে এই সব জিজ্ঞাসা নির্দিষ্ট সন্দেহে পরিণত হয়।

অধ্যায়- ১৭: অক্টোবর

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের যে সব উপদলীয় তৎপরতা সেপ্টেম্বরে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল, অক্টোবরের প্রথম দিকে তা মন্দীভূত হয়ে পড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেপ্টেম্বরের শেষে ভারত-সোভিয়েট যুক্ত ঘোষণা সম্পর্কে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার বৈঠকে যে চুলচেরা আলোচনা হয়, তার ফলে যোগদানকারী কারো জন্যেই এ কথা দুর্বোধ্য ছিল না যে, মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের অনুকূলে মিত্রভাবাপন্ন বৈদেশিক শক্তিসমূহের সমঝোতা সম্পন্ন প্রায়। সম্ভবত তাঁদের মধ্যে এ উপলব্ধিও ঘটে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে সোভিয়েট ভূমিকাকে নিকটবর্তী করার জন্য 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি' গঠনের বিষয়ে তাজউদ্দিনের নেপথ্য উদ্যোগ অসঙ্গত ছিল না। এই সব আশাবাদ ও উপলব্ধির ফলে মন্ত্রিসভার কাজকর্মে এক নতুন গতি ও মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপর করে তোলা, নিয়মিত বাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে সৃষ্ট ব্যবধান হ্রাস করা, সরকারী প্রশাসনকে সংহত ও সক্রিয় করা, এমনকি যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভার এই সব গঠনমুখী সিদ্ধান্ত থেকে প্রতীয়মান হয়, মন্ত্রিসভাকে বিভক্ত করার জন্য যে বৈদেশিক স্বার্থ পূর্ববর্তী কয়েক মাস যাবত সাতিশয় সক্রিয় ছিল, খোন্দকার মোশতাকের আমেরিকা গমনের অক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার পর সেই স্বার্থ অন্তত অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

নীতিগত কারণে তাজউদ্দিন-অনুসৃত পন্থার বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের বিরোধিতা খানিকটা হ্রাস পেলেও এই বিরোধিতার ব্যক্তিগত উপাদান সম্ভবত কারো কারো ক্ষেত্রে অটুট থাকে। অন্তত তাঁদের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মহলগুলির প্রচারণার ধারায় তাজউদ্দিনবিরোধী উক্তির কোন ঘাটতি ছিল না। কিছু তারতম্য দেখা যায় কেবল অভিযোগের বিষয়বস্তুর

বিভিন্নতায়। অক্টোবরের আগে অবধি তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধবাদীদের মূল প্রচারণা ছিল: তাজউদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধের নীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, ভারতের ভূমিকা অস্পষ্ট বা ক্ষতিকর এবং সোভিয়েট ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ভারত-সোভিয়েট যুক্ত ঘোষণার প্রতি বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সমর্থনসূচক বিবৃতির পর এই প্রচারণার কার্যকারিতা যখন হ্রাস পায়, তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে তখন এই অভিযোগই বড় করে তোলা হয় যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী সরকারের সর্বস্তরে 'আওয়ামী লীগের দলগত স্বার্থ নিদারুণভাবে অবহেলা করে চলেছেন' এবং 'বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করে আওয়ামী লীগবিরোধী শক্তিদের জোরদার করছেন।' এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের তলবী সভা অনুষ্ঠানের দাবী শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী ও সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে তাজউদ্দিনকে অপসারণের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রকাশ্য আন্দোলনের আড়ালে[১৭৯] বিভিন্ন উপদলের যোগসাজশ জোরদার হয়। বিভিন্ন উপদলের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সফর ও প্রচার অভিযানের ফলে বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন অঞ্চলে মন্ত্রীদের সফর জোরদার করার পক্ষে অক্টোবরের শুরুতে মন্ত্রিসভা এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় খোন্দকার মোশতাক নিজেও ৬ থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত সীমান্তবর্তী বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের সঙ্গে এবং সেক্টর কমান্ডারদের কারো কারো সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোলকাতা ত্যাগ করেন। তাঁর এই সফর অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে এ কারণেও যে সমগ্র সফরকালের জন্য তাঁর সঙ্গী ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষী।[১৮০] যোগাযোগ ব্যবস্থাবর্জিত এই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে পররাষ্ট্র বিভাগের সদল দফতর থেকে প্রায় দু'সপ্তাহের জন্য মাহবুব আলমের অনুপস্থিতির কারণ মুখ্যতই রাজনৈতিক বলে প্রতীয়মান হয়। অন্তত বিভিন্ন আঞ্চলিক কাউন্সিলের নেতৃবর্গের সঙ্গে মোশতাকের আলাপ-আলোচনার যে সব খবর কোলকাতা এসে পৌঁছাত, তা থেকে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে নিদারুণ আশাভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর পদে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপার তখনও তিনি সবিশেষ আগ্রহী। তবে পুনরায় তিনি মুক্তিযুদ্ধের আপোসহীন সমর্থক। এবং কেবল তাঁর নেতৃত্বেই এই যুদ্ধ পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এই ধরনের একটি ভাবমূর্তি গঠনের জন্য পরিষদ সদস্য ও দলীয় নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁর বক্তব্য দৃশ্যত গঠনমূলক হয়ে ওঠে। এমনকি তাঁর এই সফর

সম্পর্কে মন্ত্রিসভার কাছে লিখিত রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, ভারত সরকারের তুষ্টির কারণ হতে পারে, এমন কিছু মার্জিত মন্তব্য তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য একই সঙ্গে তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে সেরনিয়াবাত- শেখ আজিজ নেতৃত্বাধীন গ্রুপ এবং শেখ মণি পরিচালিত 'মুজিব বাহিনী'র প্রকাশ্য বিদ্রোহের পিছনে ইন্ধন যোগানের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব- ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই সব উপদলীয় তৎপরতা দলের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের মাঝে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। তা ছাড়া, আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাজউদ্দিন কার্যকরী সংসদের সভা ২০শে অক্টোবর ধার্য করায় তলবী সভা আহ্বানের পক্ষে বিরোধী উপদলগুলির তোড়জোড়ও ভণ্ডুল হয়ে পড়ে।

অক্টোবরের প্রথমার্ধে একমাত্র 'মুজিব বাহিনী'র একাংশের কার্যকলাপে বরং অধিকতর বেপরোয়াভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বেপরোয়াভাবের কতটা তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিচায়ক, কতটা পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার নির্দেশক অথবা কতটা তাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতাজনিত অধীরতার পরিমাপক, তা বলা কঠিন। অক্টোবরে বৈদেশিক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে মিত্রভাবাপন্ন শক্তিসমূহের সমন্বয় এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমবর্ধিত সমাবেশ কোন্ প্রত্যাসন্ন বোঝাপড়ার প্রস্তুতি, সে সম্পর্কে অনবহিত এই তরুণ নেতৃত্ব তখনও তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে তাদের পুরাতন প্রচারণায় মত্ত: 'তাজউদ্দিনই বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার কারণ,' 'তাজউদ্দিন যতদিন প্রধানমন্ত্রী, ততদিন ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের স্বীকৃতিদান অসম্ভব,' 'তাজউদ্দিন ও মন্ত্রিসভা যতদিন ক্ষমতায় আসীন ততদিন বাংলাদেশের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।' এই সব বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা, আওয়ামী লীগের একাংশের সঙ্গে তাদের সংঘাত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কোন কোন ইউনিটের সঙ্গে তাদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, এমনকি নৌকমান্ডোদের সাথে তাদের অসহযোগী আচরণের সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ার দরুন রাজনৈতিকভাবে 'মুজিব বাহিনী' ক্রমেই বেশী অপ্রিয় ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে শুরু করে।[১৮১] তা ছাড়া 'মুজিব বাহিনী'র চার নেতাকেই তাদের পৃষ্ঠপোষকগণ উপমহাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতির আলোকে তাজউদ্দিন তথা মন্ত্রিসভাবিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত হওয়ার 'পরামর্শ দান শুরু করেছেন বলে অক্টোবরের মাঝামাঝি ভারতীয় সূত্র থেকে আমাদের জানানো হয়। বাংলাদেশ সূত্র থেকে জানা যায়, কথিত পরামর্শের মুখে শেখ মণির ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকলেও, 'মুজিব

বাহিনী'র দ্বিতীয় প্রধান নেতা হিসাবে পরিচিত সিরাজুল আলম খান তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করায় এই দুই যুবনেতার মধ্যে মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় 'মুজিব বাহিনী'র নেতৃত্বের একাংশের পক্ষে অধীর হয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না; বস্তুত তাদের এই অধীরতার সহিংস প্রকাশ ঘটে তাজউদ্দিনের প্রাণনাশের অসফল প্রয়াসের মধ্য দিয়ে।

'মুজিব বাহিনী'র সদস্য হিসাবে পরিচয়দানকারী এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্রসহ সহসা একদিন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে হাজির হয়ে জানায় যে, তাদের এক নেতা তাজউদ্দিনের প্রাণ সংহারের প্রয়োজন উল্লেখ করা মাত্র স্বেচ্ছায় সে এই দায়িত্ব নিয়ে সেখানে এসেছে, যাতে তাজউদ্দিনের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়। তাজউদ্দিন তখন অফিসে সম্পূর্ণ একা।[১৮২] তাজউদ্দিন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে এই যুবক তাঁকে আরো জানায় যে, এ বিষয়ে সে পূর্ণ স্বীকারোক্তি করার জন্য প্রস্তুত এবং কৃত অপরাধের জন্য কর্তৃপক্ষ যদি তার কোন শাস্তি বিধান করেনও, তবু তাতে তার কোন আপত্তি নেই। তাজউদ্দিন আরো কিছু প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের পর অস্ত্রসমেত যুবকটিকে বিদায় দেন। সেই সময় 'মুজিব বাহিনী'র বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কোন কোন ইউনিটের এবং আওয়ামী লীগের একাংশের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল যে, এই ঘটনা প্রকাশের পর পাছে কোন রক্ষক্ষয়ী সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে, তা রোধ করার জন্য তাজউদ্দিন ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ গোপন করেন।[১৮৩] কিন্তু সম্ভবত এই ঘটনার পরেই তাজউদ্দিন মনস্থির করেন 'মুজিব বাহিনী'র স্বতন্ত্র কমান্ড রক্ষার জন্য RAW-এর প্রয়াসকে নিষ্ক্রিয় করা এবং এই বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে চূড়ান্ত চাপ প্রয়োগের সময় সমুপস্থিত।

এই সব উপদলীয় প্রশ্ন নিয়ে সময়ের যথেষ্ট অপচয় ঘটত; অথচ মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও সংহত করার জন্য সময় সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশী। অক্টোবরের মাঝামাঝি পাকিস্তান ও ভারতের সৈন্য সমাবেশ সম্পন্ন হওয়ার ফলে সীমান্ত পরিস্থিতি একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে দ্রুত ধাবমান। অথচ তখনও অন্তত ত্রিশ হাজার মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং প্রদান বাকী। আর যে পঞ্চাশ হাজার ইতিমধ্যে ট্রেনিং লাভ করেছে, তাদেরকে সক্রিয় করে তোলার লক্ষ্য তখনও অনায়ত্ত। রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে ট্রেনিং, সরবরাহ, শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ ও তৎপরতা- প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অজস্র সমস্যা প্রত্যহ চিহ্নিত হত, তার প্রশাসনিক সদুত্তর কাগজ-

কলমে খুঁজে পাওয়াও মাঝে মাঝে কষ্টকর হত, সেগুলি বাস্তবায়িত করা তো আরো বেশী অসুবিধার কথা।[১৮৪] মুক্তিযুদ্ধ ব্যবস্থাপনার এই সব ছোট- বড় দৈনন্দিন সমস্যাবলী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর রাজনৈতিক আদর্শ, এর আর্থ- সামাজিক লক্ষ্যের সঙ্গে সংগ্রামকে যুক্ত করার কাজটি ছিল আরও বেশী জটিল। কেবলমাত্র পাকিস্তানের সামরিক নির্যাতনের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই যে এই মুক্তিসংগ্রাম, অথবা উঠতি বাঙালী শাসকশ্রেণীর স্বতন্ত্র ক্ষমতাযন্ত্র সৃষ্টির জন্যই যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে পাকিস্তানের মত আর একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন- এ কথা এত মানুষের দুঃখ- কষ্ট, নির্যাতন ভোগ এবং এত প্রাণ বিসর্জনের পর স্পষ্টতই যুক্তিসঙ্গত ছিল না। দেশের আর্থ- সামাজিক রূপান্তরের মৌল প্রয়োজনের জন্য শিল্প জাতীয়করণের নীতি ইতিপূর্বেই মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছে এবং পরিকল্পনা সেল কিছু কিছু মধ্যমেয়াদী পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের এই বৃহত্তর আর্থ- সামাজিক লক্ষ্য অর্জন প্রচেষ্টার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ব্যবস্থাপনার দৈনন্দিন বিষয়গুলিকে গ্রথিত করার জন্য যে সংগঠন, পরিকল্পনা ও উদ্যমের প্রয়োজন ছিল, তা অংশত ব্যর্থ হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার কারণে এবং অংশত সময়ের অপচয়ে ও অভাবে।

সময়ের প্রয়োজন সত্যই তীব্র ছিল। সময়ের প্রয়োজন ছিল যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্তব্যনিষ্ঠ অংশ ক্রমশ সক্রিয় ও সংহত হয়ে উঠতে পারে, যাতে কাজের মাধ্যমে তাদের ভিতর থেকে যোগ্যতর নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটতে পারে, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার ঐক্যবন্ধন গড়ে উঠতে পারে, এবং যাতে দেশকে শত্রুমুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি আর্থ- সামাজিক কাঠামোর মৌলিক সংস্কার ও পুনর্গঠনে নিযুক্ত হতে পারে। মাত্র দু- তিন সপ্তাহের প্রাথমিক সশস্ত্র ট্রেনিংয়ের পর এই বিচ্ছিন্ন, যুদ্ধ- অনভিজ্ঞ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববিহীন তরুণদের প্রতিকূল অথবা অসংগঠিত অবস্থার মাঝে নিক্ষেপ করে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে সংগ্রামের সুসংহত শক্তিতে পরিণত করা কোন মন্ত্রবলেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাদের বিকাশের জন্য যতখানি সময়ের প্রয়োজন ছিল, তার পথে অন্তত দু'টি বাধা ছিল অতিশয় প্রবল। প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নব্বই লক্ষ শরণার্থীর দুর্বিষহ ভার বহনে ভারতের ক্রমবর্ধমান অক্ষমতা। দ্বিতীয় উত্তরের গিরিপথগুলি পরবর্তী বসন্তে তুষারমুক্ত হওয়ার আগেই উদ্ভূত সামরিক বিপদ নিষ্পত্তির জন্য ভারতের বোধগম্য ব্যগ্রতা।

কাজেই, চূড়ান্ত লড়াই বড়জোর ফেব্রুয়ারী অবধি পিছিয়ে দেবার অবকাশ ছিল; যদিও অক্টোবরের মাঝামাঝি পাকিস্তানের সৈন্য সমাবেশ সম্পন্ন হওয়ার পর যুদ্ধ শুরুর ব্যাপারটি কেবল ভারত- বাংলাদেশের প্রয়োজন ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ছিল না, তা সমভাবেই নির্ভরশীল ছিল পাকিস্তানের নিজস্ব প্রয়োজন ও সিদ্ধান্তের উপর।

কিন্তু আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক টানাপোড়েনের ফলে পাকিস্তানের যুদ্ধ যাত্রার আগেই যদি শীত এসে পড়ে এবং উত্তরের গিরিপথসমূহ তুষারবৃত হওয়ায় পরবর্তী এপ্রিল পর্যন্ত চীনের হস্তক্ষেপ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে পাকিস্তানকে পরবর্তী এপ্রিল/মে পর্যন্ত যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে সম্ভবত বিরত থাকতে হত। পাকিস্তানের এই অক্ষমতা সাপেক্ষে শীতের শেষ দিকে চূড়ান্ত লড়াই পিছিয়ে দিয়ে দু'তিন মাস অতিরিক্ত সময় লাভ করা যায় কি না, সে সম্ভাবনাও বিবেচনা করে দেখা হয়। সেপ্টেম্বরে তাজউদ্দিন ও ডি. পি. ধর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা নিয়ে কিছু আলাপ- আলোচনা করেছিলেন। মুক্তাঞ্চল গঠনভিত্তিক পূর্ববর্তী রণনৈতিক চিন্তার অবাস্তবতা তখন উভয় পক্ষের কাছেই যথেষ্ট স্পষ্ট। তবে সেপ্টেম্বরেই এ জাতীয় মৈত্রীচুক্তি সম্পর্কে সম্মত হওয়া ভারতের জন্য একাধিক কারণেই অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া উভয় পক্ষের জন্যই এরূপ চুক্তি সম্পাদনের সর্ববৃহৎ বিপদ ছিল এই যে, প্রস্তাবিত চুক্তি যেহেতু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জ্ঞাপনের সমার্থক, সেহেতু এ কথা প্রকাশিত হলে তৎদণ্ডেই- অর্থাৎ উত্তরের গিরিপথসমূহ তুষারাবৃত হওয়ার আগেই- পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা একরূপ অবধারিত ছিল। অবশ্য এই চুক্তিকে গোপন রেখে পাকিস্তানের সম্ভাব্য ত্বরিত প্রতিক্রিয়া এড়ানো যেত। কিন্তু চুক্তির সম্ভাব্যতা নিয়ে ডি. পি. ধরের আলোচনা সত্ত্বেও, এর পক্ষে বা বিপক্ষে ভারত সরকারের মনোভাব সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি।[১৮৫]

বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে অক্টোবরে এমন আশাবাদ খুব অসঙ্গত ছিল না যে এই চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হলে ভারত সরকারের স্বীকৃতি এবং সংগ্রামের চূড়ান্তপর্বে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের বিষয়টি বাংলাদেশের আয়ত্তে আসবে। এহেন আশাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্ব- কাঠামোবিহীন মুক্তিযোদ্ধাদের সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম যতদূর সম্ভব পিছিয়ে দিয়ে কয়েক মাস বাড়তি সময় সংগ্রহের চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত ছিল। দিল্লীতে ১৬ই অক্টোবর ডি. পি. ধরের কাছে এই বাড়তি সময়ের প্রয়োজন ব্যাখ্যাকালে আমি পাকিস্তানী দখল

অবসানের পর সম্ভাব্য অরাজকতা ও সামাজিক হানাহানির চিত্র তুলে ধরি।

কিন্তু কিছুদূর আলোচনার পরেই স্পষ্ট হয়, তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা অধিকতর বিব্রত ও চিন্তান্বিত, তা স্বাধীনতা- উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়ে নয়, বরং স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা কেন তখনও সক্রিয় নয়, তাই নিয়ে। তাঁদের প্রধান দুশ্চিন্তা মুক্তিসংগ্রামের এই নিশ্চলতা থেকেই উদ্ভূত মুক্তিযোদ্ধারা যদি দখলদার সেনাদের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে না- ই ঘটাতে পারে, তবে কিভাবে একে বাংলাদেশের নিজস্ব মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে বিশ্বের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? তৎসত্ত্বেও যদি ভারতীয় বাহিনীকে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তবে কিভাবে দ্রুত বিজয় সুনিশ্চিত করা সম্ভব? এবং যে যুদ্ধ বাংলাদেশের নিজস্ব মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং ভারতীয় বাহিনীর অভিযান যেখানে মন্থর ও বাধাগ্রস্ত, সেখানে কিভাবেই- বা বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ রোধ করা সম্ভব? তাদের অপর প্রধান উদ্বেগ ছিল বিগত কয়েক মাস ধরেই প্রায় অপরিবর্তনীয়- মুজিবনগর রাজনীতির ক্রমবর্ধমান উপদলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিশেষত তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে। এগুলির কোনটিরই যথার্থ সমাধান নির্দেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সব সমস্যা উত্থাপনের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টিই স্পষ্ট করা হয় যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে যদি না বাড়ে, তবে চূড়ান্ত সংগ্রামের কোন সময়সূচীই অনুসরণ করা সম্ভব নয়, এগিয়ে আনা বা পিছিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন কার্যত অর্থহীন। তবে তিনি জানান, সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের একটি জাতীয় কমান্ডব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য এবং যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকৃত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক; এবং এ বিষয়ে যদি তাঁদের কোন করণীয় থাকে তবে তাঁরা তা পালন করতে সম্মত আছেন। দিল্লীতে দু'দিনে ডি. পি. ধরের সঙ্গে তিন- দফা বৈঠকের পর সমস্যার উপলব্ধিকে গভীরতর করে যখন কোলকাতা ফিরে আসছিলাম তখন অধিকৃত এলাকায় ঝড়ের আগের স্তব্ধ মেঘের মত সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে হঠাৎ বাতাসের দোল শুরু হয়েছিল- বাইরে থেকে যা প্রথম বুঝতেই পাওয়া যায়নি।

২০শে অক্টোবর কোলকাতায় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠক শুরু হয়। ২০ ও ২১শে অক্টোবর দু'দিন এই বৈঠক চলার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হওয়ায় (এবং সম্ভবত মন্ত্রিসভার সদস্যরাও তাঁদের সহগমন করায়) ২৭ ও ২৮শে অক্টোবর মুলতবি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই মাসে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির প্রথম বৈঠকের প্রায় সাড়ে তিন মাসের ব্যবধানে কার্যকরী কমিটির এটা ছিল দ্বিতীয় বৈঠক। আওয়ামী লীগের কার্যকরী বৈঠক আরও ঘন ঘন হওয়া উচিত এই মর্মে এক দাবী আওয়ামী লীগের নেতৃমহলে বিরাজমান ছিল। কিন্তু ভারতে প্রবেশের পর থেকেই শেখ মুজিবের অনুপস্থিতির ফলে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, অন্তত চারটি উপদলের যুগপৎ বিরোধিতা, দলকে বিভক্ত করার জন্য বৈদেশিক শক্তির অন্তর্ঘাতী ভূমিকা এবং প্রকাশ্য ও গোপন বিদ্রোহের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরও ঘন ঘন কার্যকরী কমিটির বৈঠক আয়োজন করতে বা পার্টির কাজে আরও বেশী সময় বরাদ্দ করতে হয়ত তাজউদ্দিন পারতেন, কিন্তু তারপর প্রবাসী সরকারের সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে রণনৈতিক আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কতটুকু সময় তিনি দিতে পারতেন, অথবা মুক্তিযুদ্ধ তার ফরে কতখানি সাহায্যপ্রাপ্ত হত, তা পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু অক্টোবরের কার্যকরী কমিটির বৈঠক শুরু হবার পর প্রথম দু'দিনের আলোচনা থেকে দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের বক্তব্য এবং তাঁদের পরিবেশিত তথ্যাদি মুক্তিযুদ্ধের ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করার পক্ষে সহায়ক ছিল।[১৮৬] এতদিন যাঁরা দলীয় ও সরকারী নেতৃত্ব থেকে তাজউদ্দিনের অপসারণের জন্য প্রাকশ্য প্রচার চালিয়ে এসেছেন, তাঁদের প্রতিনিধিরাও কার্যকরী কমিটির এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাজউদ্দিনের পদত্যাগ দাবী উত্থাপন থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা যে সংখ্যায় নিতান্ত অল্প, অন্তত এই উপলব্ধি থেকে কোন প্রকাশ্য আক্রমণ না চালিয়ে তাঁরা কৌশলের পরিবর্তন করেন এবং একটি সাবকমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। ২০ ও ২১শে অক্টোবরের আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের উপর আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ কতদূর সম্প্রসারিত করা যায়, তা নির্ধারণের দায়িত্ব জনাব কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে গঠিত এই সাবকমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়।[১৮৭]

২১শে অক্টোবর কার্যকরী কমিটির বৈঠকের পর সভা মুলতবি রেখে পরদিন বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য দিল্লী যান। ২৪শে অক্টোবর থেকে ১৯ দিনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সফর শুরু করতে চলেছেন। এই সফরের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে ইন্দিরা গান্ধী জানান যে, যদিও আসন্ন সফরের মাধ্যমে তিনি শান্তিপূর্ণ পথে বাংলাদেশ সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহকে সম্মত করানোর শেষ চেষ্টা করবেন, তবু তিনি এ সম্পর্কে বিশেষ আশাবাদী নন। তিনি আরও জানান, যদি কোন সুফল না পাওয়া যায়, তবে তাঁর ফিরে আসার পর এবং বাংলাদেশে পথঘাট আরো শুষ্ক হওয়ার পর পাকিস্তানী দখলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে দেখা হবে। পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে অংশগ্রহণের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল এই প্রথম। জানা যায়, তার মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্যদের কাছেও তা গোপন রাখা হয়েছিল। কাজেই একাধিক কারণেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখা অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এই অতীব আনন্দের সংবাদ বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার অপরাপর সদস্যদের অবহিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করায় তাঁর কাছ থেকে সমগ্র মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিসভা থেকে আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটি এবং কার্যকরী কমিটি থেকে প্রায় সর্বসাধারণ্যে প্রচার হতে থাকে যে বিদেশ সফর থেকে ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যাবর্তনের পরই ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করবে।[১৮৮] এই প্রচারের অন্যতম ফল হিসাবে অবশ্য আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির মুলতবি বৈঠকের আলোচনা আরও বেশী গঠনমূলক হয়ে ওঠে।

দিল্লীতে সৈয়দ নজরুলের উপস্থিতিতে তাজউদ্দিন প্রথমবারের মত ইন্দিরা গান্ধীর কাছে RAW - এর সমর্থনের ফলে 'মুজিব বাহিনী' যে নানা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে চলেছে তার উল্লেখ করেন। ইন্দিরা এই অবস্থার ত্বরিত প্রতিবিধানের জন্য সভায় উপস্থিত ডি. পি. ধরকে নির্দেশ দেন। ডি. পি. ধর 'মুজিব বাহিনী'কে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করার জন্য মেজর জেনারেল বি. এন. সরকারকে নিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে যথাশীঘ্র কোলকাতায় এক বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাজউদ্দিন ও কর্নেল ওসমানী, মুজিব বাহিনীর পক্ষে তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান ও আব্দুর রাজ্জাক (আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও শেখ মণি অনুপস্থিত থাকেন) এবং ভারতের সামরিক বাহিনীর পক্ষে মেজর জেনারেল সরকার ও ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার এক পর্বে একজন যুবনেতা দাবী করেন, আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলার অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। এরপর আলোচনা আর এগুতে পারেনি। পরে বি.

এন. সরকার কেবল যুবনেতাদের নিয়ে আলোচনার জন্য ‘ফোর্ট উইলিয়ামে’ মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেন। কিন্তু সেখানে আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলার ‘একমাত্র অধিকারী’ সেই যুবনেতা ছাড়া আর কেউই হাজিন হননি। কয়েকদিন বাদে যেহেতু যুবনেতাদের সকলে আগরতলায় উপস্থিত থাকবেন, সেহেতু সেখানেই তাদের সঙ্গে বি. এন. সরকারের পরবর্তী বৈঠকের সময় স্থির করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ‘মুজিব বাহিনী’র সকল নেতা একযোগে অনুপস্থিত থাকেন; মেজর জেনারেল সরকারও এই পণ্ডশ্রম বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য জরুরী কাজে মনোনিবেশ করেন।[১৮৯]

অধ্যায়- ১৮: অক্টোবর - নভেম্বর

নভেম্বরের শুরু থেকেই উপমহাদেশের আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান এবং তৃতীয় সপ্তাহে ভারত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তেই নিজ নিজ সৈন্য সমাবেশ সম্পন্ন করে। পূর্বাঞ্চলে সেই মার্চ থেকে পাকিস্তান যে গণহত্যা ও সন্ত্রাসের শাসন শুরু করেছিল তখনও তার কোন বিরাম ঘটেনি, কিন্তু অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে তাদের প্রাধান্য আর প্রশ্নাতীত নয়। সীমান্তেও তারা ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর বৃহত্তর চাপের সম্মুখীন। পাকিস্তান মালদহ ও ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে অসফল কিছু প্রতি- আক্রমণের প্রচেষ্টা চালাবার পর ভারতীয় কাশ্মীরকেই তারা পাল্টা চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়।[১৯০] পূর্বাঞ্চলে সীমান্তে তাদের ভূমিকা মূলতই আত্মরক্ষামূলক- অবশিষ্ট সীমান্ত ঘাঁটি (BOP)-গুলিকে নির্ভর করে তাদের সৈন্যবল সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত। যদি ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনী মুক্তাঞ্চল গঠনের জন্য কিছুটা ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়, তবে তা প্রতিরোধ করার জন্য ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সীমান্তবর্তী শহরগুলির সামরিক ঘাঁটি ‘দুর্গের’ মত সুরক্ষিত করে তুলেছে। সেখানেই যাতে তাদের সীমান্তবর্তী সৈন্যরা পুন: একত্রিত হয়ে বৃহত্তর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।[১৯১]

বস্তুত জুন- জুলাই মাসে, মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ তৎপরতার সময় সীমান্ত এলাকায় মুক্তাঞ্চল গঠন প্রতিরোধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান যে বিওপিভিত্তিক সীমান্ত প্রতিরক্ষার কৌশল অবলম্বন করে তা বিগত তিন মাসে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন

এবং ভারতীয় বাহিনীর বৃহত্তর চাপ সত্ত্বেও মূলত অপরিবর্তিত থাকে, এর সঙ্গে কেবল তাদের পিছনের ঘাঁটিগুলির অবস্থান যুদ্ধের উপযোগী করে সুদৃঢ় করে তোলা হয়। জানা যায়, অক্টোবরের শেষ অবধি পাকিস্তানী সমরনায়কদের এই ধারণা ছিল যে, দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর চাপ কমানোই ভারতীয় বাহিনীর সীমান্ত তৎপরতা বৃদ্ধির কারণ।[১৯২] সম্ভবত এই আংশিক উপলব্ধি থেকে তারা ঢাকার জন্য স্বল্প সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখে। অবশ্য গোটা সীমান্ত জুড়ে অন্যূন নব্বইটি বিওপি প্রহরা, সীমান্তবর্তী দশটি শহরে[১৯৩] 'দুর্গ' ও আরো কিছু সংখ্যক শহরে 'মজবুত ঘাঁটি' তথা 'Strong Point' প্রতিষ্ঠা এবং তদুপরি সীমান্তের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় ও বাংলাদেশের বাহিনীর ব্যাটালিয়ান অথবা বৃহত্তর আঘাত মোকাবিলায় নিযুক্ত থাকার পর ঢাকা বা তার চারপাশে সর্বশেষ লড়াইয়ের মত উদ্বৃত্ত সৈন্য কতটুকু তাদের ছিল, তাও বিচার্য। উদ্বৃত্ত সৈন্যের অভাব হেতু সীমান্ত থেকে প্রতিপক্ষের জোরাল আক্রমণের মুখে পশ্চাদপসরণ করে 'দুর্গের' মধ্যবর্তী ভূভাগ নিয়ন্ত্রণ করা তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। সে ক্ষেত্রে নিয়াজীর তথাকথিত 'দুর্গ' পাকিস্তানী সেনাদের আত্মহননের খেদায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল সমধিক। পাকিস্তানের সামরিক পরিকল্পনার এই বিভ্রান্তি ও অবাস্তবতা কেবল তাদেও সৈন্যের সংখ্যাল্পতা থেকে উদ্ভূত ছিল না, প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে তাদের অক্ষমতাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল।

পক্ষান্তরে, অক্টোবর মাসে দু'একটি সীমান্তবর্তী 'মজবুত ঘাঁটি'র সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ফলে ভারত ও বাংলাদেশের সামরিক নেতৃত্বের পক্ষে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ঢাকা অভিমুখে দ্রুত সামরিক অভিযান সম্ভব করার জন্য এই সব 'মজবুত ঘাঁটি' ও 'দুর্গকে' পাশ কাটিয়ে যাওয়াই উপযুক্ত কৌশল। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কৌশল কার্যকর করার জন্য মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় অজানা বিকল্প পথঘাট, নদীনালা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বিশদ তথ্যাদি সংগৃহীত হতে শুরু করে। বস্তুত এপ্রিল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বাহিনীর অফিসার এবং নন- কমিশন্ড অফিসারগণ পাকিস্তানের সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কে, যথা - সংগঠন, শক্তিমত্তা, অবস্থান, অস্ত্রসম্ভার, গোলা- বারুদ, অবকাঠামো, লজিস্টিকস্, পরিকল্পনা, কৌশল, নেতৃত্ব, তথ্য, যোগাযোগ, ট্রেনিং, মনস্তাত্ত্বিক গঠন প্রভৃতি বিষয়ে এবং সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় যথা - স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক উপাদান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পথঘাট, নদীনালা, সেতু- ফেরী, শক্তি ও জ্বালানী ইত্যাকার বিষয়ে যে সমুদয় তথ্য

ভারতীয়পক্ষকে সরবরাহ করে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অভিযান পরিচালনার কাজে তার মূল্য ছিল অপরিসীম। কেবল তা-ই নয়, মুক্তিযোদ্ধারাও পাকিস্তানী ইউনিটসমূহের সর্বশেষ অবস্থান, আয়তন, গতিবিধি এবং সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য নিয়মিত সরবরাহ করে তাদের বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযানকে অসামান্যভাবে সাহায্য করে।

নভেম্বরের শুরুতে প্রত্যক্ষ তৎপরতার ক্ষেত্রেও তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা আগের তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয়। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পুনরায় তাদের যে তৎপরতা আরম্ভ হয়, নভেম্বরের শুরুতে সেই তৎপরতার মান অধিকতর পরিপক্ব এবং তৎপরতার পরিধিও অনেক বিস্তৃত। কোন এলোপাতাড়ি আক্রমণ নয়, বরং লক্ষ্য ও কৌশল সম্পর্কে যথোপযুক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তারা দখলদার সৈন্যদের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে শুরু করে।[১৯৪] ইতিপূর্বে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধির ফলে এবং অংশত কোন কোন অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশল পরিবর্তিত হওয়ার ফলে রাজাকার বাহিনীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সুবিধাবাদী অংশটি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে থাকে এবং এই অবস্থায় এই বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধির জন্য দখলদার সামরিক শাসকেরা জামাতে ইসলাম ও বিহারী সম্প্রদায়ের সমবায়ে গঠিত 'আল-বদর' ও 'আল-শামস্' বাহিনীদ্বয়ের গোঁড়া সদস্যদের উপর অধিকতর নির্ভর করতে শুরু করে। এই সমুদয় বাহিনীর সম্মিলিত তৎপরতা সত্ত্বেও স্থানীয় জনসাধারণ তাদের পূর্ববর্তী ভয়ভীতি ও জড়তাকে অতিক্রম করে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করতে শুরু করে। ফলে দখলদার সৈন্য, তাদের স্থানীয় দোসর এবং সামরিক ও আধাসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ক্ষমতা বিরাটভাবে বৃদ্ধি পায়, দখলদার সেনাদের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ দখলদার সৈন্যদের মধ্যে হতাশা, অবসাদ ও আতঙ্কের আবহাওয়া বিস্তার লাভ করতে থাকে।[১৯৫]

মুক্তিযোদ্ধাদের এই সব তৎপরতার মূল্য ছিল অপরিসীম। দখলদার সেনাদের হতোদ্যম ও যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত করে তুলে চূড়ান্ত আঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুতের যে সামরিক দায়িত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ছিল, সেই লক্ষ্য অর্জনের দিকে তারা এখন দ্রুত ধাবমান। এই তৎপরতার রাজনৈতিক গুরুত্ব এর সামরিক মূল্যের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। অক্টোবর-নভেম্বরের তৎপরতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র ছাত্র

ও তরুণের দল অনন্য প্রত্যয়ের সাথে স্বদেশবাসীর কাছে, বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্বের সকল সংবাদমাধ্যমের কাছে এ কথা স্বীকৃতি লাভ করে যে, এই অকুতোভয় তরুণেরা নিজেদের সীমিত শক্তি ও অস্ত্রবল নিয়ে দেশের সকল অঞ্চলে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে চলেছে এক শক্তিশালী দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তার নিজস্ব শক্তির মহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত না হলে, পরবর্তীকালে ভারতের অংশগ্রহণের পর এই যুদ্ধকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা বিশ্ববাসীর পক্ষে যেমন কঠিন হত, তেমনি ভারতও সম্ভবত রাজনৈতিক ও সামরিক উভয়বিধ কারণে সর্বাত্মক সাহায্য প্রদানের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত হয়ে থাকত। অন্তত ডি. পি. ধর ১৬ ও ১৭ই অক্টোবরে প্রাঞ্জল ও বিশদভাবেই তাঁদের এই দ্বিধার কথা আমার কাছে প্রকাশ করেন।

দেশের ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক তৎপরতার মুখে পাকিস্তানী বাহিনীর অবস্থা যখন ক্রমশ খারাপের দিকে, তখন পাকিস্তানের মোট সৈন্যসংখ্যার যে চার-পঞ্চমাংশ সীমান্তে মোতায়েন ছিল তারা ক্রমবর্ধিত সামরিক চাপের সম্মুখীন হয়। সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় বাহিনী যে ভূমিকা পালনে নিযুক্ত ছিল সেই ভূমিকা অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। নভেম্বরের শুরুতে পাকিস্তানী জান্তার পক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব যে, ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত ও ক্রমবর্ধিত সামরিক চাপের মুখে পাকিস্তানের ক্লান্ত, হতোদ্যম চার ডিভিশন সৈন্য, যৎসামান্য বিমান ও নৌবহর এবং ৭৩,০০০ আধা-সামরিক জনবল নিয়ে দীর্ঘদিন পূর্বাঞ্চলের উপর ঔপনিবেশিক দখল রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। এমতাবস্থায় 'পূর্ব পাকিস্তানের' এই সংঘর্ষকে পাক-ভারত যুদ্ধে পরিণত করে ভারতীয় কাশ্মীরের কিয়দংশ দখল করা, মিত্ররাষ্ট্রদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ত্বরান্বিত করা এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পূর্বতন স্থিতাবস্থা কায়েম করার জন্য সচেষ্ট হওয়াই পাকিস্তানী শাসকদের কাছে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য পন্থা হিসাবে বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।[১৯৬] ভারতীয় কাশ্মীরের কিয়দংশ দখলের জন্য সামরিক প্রস্তুতি ও ক্ষমতা পাকিস্তানের নিজস্ব আয়ত্তেই ছিল। বরং বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য মিত্ররাষ্ট্রদের সামরিক হস্তক্ষেপ সংগঠিত করা পাকিস্তানের জন্য অপেক্ষাকৃত দুরূহ ছিল। স্পষ্টতই চীন হস্তক্ষেপে অপারগ ছিল ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি, উসূরী নদী বরাবর চল্লিশ ডিভিশন এবং সিংকিয়াং সীমান্ত বরাবর আরও ৬/৭ ডিভিশন সোভিয়েট সৈন্যের উপস্থিতি প্রভৃতি

বিষয় বিবেচনা করেই। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অক্ষমতা ততটা ছিল না; যদিও ইয়াহিয়া জান্তার বিরুদ্ধে সৃষ্ট প্রবল মার্কিন জনমত ছিল একটি প্রবল রাজনৈতিক বাধা।

তৎসত্ত্বেও নভেম্বরে বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, যুক্তরাষ্ট্র যদি সম্ভাব্য সোভিয়েট প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে চীনকে কোন কার্যকর সামরিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় তবে সেই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে চীনা বাহিনী সিকিম সংলগ্ন চুম্বি উপত্যকার[১৯৭] মধ্য দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের' উত্তর সীমান্ত থেকে স্বল্প দূরে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সীমিত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে অথবা সরাসরি 'পূর্ব পাকিস্তানের' উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করতে সম্মত হতে পারে। সেই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সপ্তম নৌবহরের জাহাজবাহিত বিমানের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ভাগ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের উপর বিমান আচ্ছাদন (Air cover) বিস্তার করে নৌসেনা অবতরণের মাধ্যমে সামরিক পরিস্থিতিকে পাকিস্তানের অনুকূলে আনার কাজে উদ্যোগী হতে পারে বলে মনে হয়। চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়ে চীনা সৈন্য এবং বঙ্গোপসাগর দিয়ে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের আগমনের ফলে ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনিশ্চিত হয়ে পড়া এবং অমীমাংসিতভাবে যুদ্ধ শেষ হওয়া অসম্ভব নয় বলে মনে হয়। কিন্তু চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সম্ভব করে তোলার ক্ষমতা পাকিস্তানী শাসকদের সামান্যই ছিল। অবশ্য ৭ই অক্টোবর ইয়াহিয়া খান 'পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি রোধকল্পে' প্রেসিডেন্ট নিক্সনের 'ব্যক্তিগত উদ্যোগের' উপর নিজের সার্বিক নির্ভরশীলতার কথা ব্যক্ত করার পর থেকে নিক্সনের নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী কিসিঞ্জারকেই পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক দখল রক্ষার জন্য উত্তরোত্তর তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায়। বিশেষত ২৬শে অক্টোবর চীন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কিসিঞ্জারের কর্মব্যস্ততা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যখন মনে হয় ইয়াহিয়া জান্তার স্বপক্ষে উপমহাদেশের ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রণের প্রধান দায়িত্ব 'হোয়াইট হাউসে' স্থানান্তরিত হয়েছে।[১৯৮] মুখ্যত কোন দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ব সংঘাতে রূপান্তরিত করার এমন নাটকীয় দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ অবধি মার্কিন কূটনৈতিক উদ্যোগের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল সীমান্ত থেকে ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য প্রত্যাহার এবং জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সম্মত করানো। কিন্তু এই সব

মার্কিন প্রস্তাব মূল সমস্যা সমাধানের দিকে না গিয়ে যে কেবল পাকিস্তানী দখলকেই দীর্ঘায়িত করার প্রয়াসী, সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে তখন তা আর অস্পষ্ট নয়। একদিকে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং শরণার্থী ফেরৎ নেওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উদ্যোগের অভাব, এবং অন্যদিকে ভারতের উপর শরণার্থী সমস্যার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দৃষ্টে সোভিয়েট ভূমিকা তখন মার্কিনী প্রত্যাশার বিপরীতগামী। ভারতকে নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েট অসম্মতি দৃষ্টে মার্কিন প্রশাসন সম্ভবত উপলব্ধি করেন - যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক আয়োজন বন্ধ করার জন্য মার্কিন কূটনৈতিক তৎপরতা এবং পাকিস্তানের একক সামরিক উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়, সেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া পাকিস্তানের আসন্ন বিপর্যয় রোধ করার কোন উপায়ই আর অবশিষ্ট নাই। এ ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ ঘনীভূত হয় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংঘটিত দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা দৃষ্টে। ৩রা নভেম্বর পাকিস্তানে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত বেঞ্জামিন ওয়েলার্ট সীমান্ত অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে ভারতের অসম্মতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং অযাচিতভাবেই ১৯৫৯ সালের পাক-মার্কিন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে মার্কিন অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান 'যে কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর' এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের অস্ত্র ও সৈন্যবলসহযোগে পাকিস্তানকে সাহায্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।'[১৯৯] পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে দু'টি আঞ্চলিক সামরিক জোটের সদস্য হিসেবে পাকিস্তান যে কোন কমিউনিস্ট দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তা লাভের অধিকারী ছিল। কিন্তু অন্য কোন চুক্তির অধীনে কোন অকমিউনিস্ট দেশের 'আক্রমণের বিরুদ্ধে' পাকিস্তান যে অনুরূপ মার্কিন সহায়তা লাভের অধিকারী, তদ্রূপ তথ্য তখন অবধি ছিল অজানা। ব্যাপারটি সন্দেহজনক মনে হয় এ কারণেই যে, এ ধরনের কোন গোপন চুক্তি বলবৎ থাকলে পাকিস্তান ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তা প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টার বোধহয় কার্পণ্য করত না। ১৯৫৯ সালের দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে এ জাতীয় মার্কিন অঙ্গীকার সত্যই ছিল কি না সে সম্পর্কে তখন নিশ্চিত না হওয়া গেলেও বাংলাদেশে প্রত্যাসন্ন চূড়ান্ত মুক্তির লড়াই ব্যর্থ করার জন্য এই চুক্তিকে ব্যবহার করার সুযোগ বা বাসনা যে মার্কিন প্রশাসনের রয়েছে এমন ইঙ্গিত ওয়েলার্টের বিবৃতি থেকে পাওয়া যায়। ওয়েলার্টের বিবৃতি উদ্দেশ্যমূলক বলে[২০০] মনে হলেও স্বভাবতই যে প্রশ্নটি আমাদের জন্য মুখ্য হয়ে ওঠে তা ছিল: কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ

কার্যকর হওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কে অন্তত আমার নিজের কোন সন্দেহ ছিল না যে, পাকিস্তানের শেষরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যদি সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তই নেয়, তবে তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন এই ধরনের কোন চুক্তি অথবা সেই চুক্তির কোন অস্পষ্ট ধারার সুবিধাজনক ব্যাখ্যা। তেমনি প্রয়োজন তাদের ছিল ভারত- সোভিয়েট চুক্তির সতর্কবাণী সত্ত্বেও চীনা সশস্ত্রবাহিনীকে তিব্বত- ভারত সীমান্তে সীমিত হস্তক্ষেপের জন্য সম্মত করানো। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সে দিকেও আর একটি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

গণহত্যা শুরুর পর পাকিস্তানকে যদিও চীন নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ করে এসেছে,[২০১] তবু মে থেকে উপমহাদেশীয় প্রশ্নে চীন কোন প্রকাশ্য মতামত ব্যক্ত করেনি। অনুমান করা হয়েছিল, স্বাধীনতার পক্ষে মওলানা ভাসানী ও চীন- সমর্থক কোন কোন বামপন্থী গ্রুপের ভূমিকা, পাকিস্তানী বাহিনীর বিরামহীন বর্বরতা, আগস্টে ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি প্রভৃতি ঘটনা চীনকে বাংলাদেশের পরিস্থিতির জটিলতা সম্পর্কে অধিকতর বাস্তববাদী করে তুলেছে। হঠাৎ জানা গেল, সেই চীনের 'আমন্ত্রণক্রমে' উচ্চ সামরিক প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত পাকিস্তানের এক প্রতিনিধিদল 'পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং উপমহাদেশের সাম্প্রতিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য' পিকিং উপস্থিত হয়েছে।[২০২] পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলকে 'আমন্ত্রণ' করার ব্যাপারে চীনের নিজস্ব আগ্রহ কতটু ছিল তা অজ্ঞাত। তবে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের সফর শেষে দেখা যায়, চীন ভারতের জন্য চিরাচরিত নিন্দাজ্ঞাপন ছাড়া পাকিস্তানের জন্য বেশীদূর অগ্রসর হতে আগ্রহী নয় - এমনকি আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে প্রথাগত যুক্তইশতেহার প্রকাশের স্বার্থেও।[২০৩] বিভিন্ন ঘটনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ করার ব্যাপারে চীনের আগ্রহ ছিল সামান্যই, সম্ভবত অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্ধে পিকিং- এ অনুষ্ঠিত চৌ- কিসিঞ্জার আলোচনা থেকেই এর উৎপত্তি।[২০৪] 'পূর্ব পাকিস্তানের' সুরক্ষার জন্য চীনা সেনাবাহিনীর সীমিত হস্তক্ষেপের পক্ষে সকল যুক্তিজাল বিস্তার এবং সমূহ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি উচ্চারণের পরেও পিকিং- এ কিসিঞ্জার যদি স্বভাবত সাবধানী চীনা নেতৃত্বকে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল অথচ সামরিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত দেখতে পান, তবে তাদের কাছে আর এক প্রস্থ ধরনা দেওয়ার জন্য পাকিস্তানীদের পাঠানোর প্রয়োজন কিসিঞ্জারেরই প্রথম উপলব্ধি করার কথা। পাকিস্তানীদের জন্য চীনের আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করা, বা চীনের

কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ভুট্টোর মত ব্যক্তিত্বকে প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে সুপারিশ করা কিসিঞ্জারের পক্ষে ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ।

পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলে বিমানবাহিনীর প্রধান রহিম খান, সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ গুল হাসান ও নৌবাহিনীর প্রধান রশীদ আহমদ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সফরের সামরিক উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বপদে 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি' হিসাবে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিয়োগ বেশ কিছু বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেননা ২৬শে মার্চ আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ভুট্টো '৭০- এর নির্বাচনের বিজয়ী দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের প্রধান হিসাবে ক্ষমতা লাভের জন্য যতই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ততই ক্ষমতাসীন জান্তা তাঁর ক্ষমতারোহণের পথ দুরূহ করতে থাকে। বস্তুত ইয়াহিয়ার 'বিশেষজ্ঞ - প্রণীত' খসড়া শাসনতন্ত্র এবং জাতীয় পরিষদের তথাকথিত 'উপনির্বাচনে' দক্ষিণপন্থী প্রার্থীদের 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত' ঘোষণা করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভুট্টোকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখা। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে এক অজ্ঞাত অথচ অত্যন্ত প্রভাবশালী মধ্যস্থতায় ইয়াহিয়া- ভুট্টো সম্পর্কে হঠাৎ উন্নতি ঘটে।[২০৫] ১লা নভেম্বর ঘোষণা করা হয় আওয়ামী লীগের শূন্য ঘোষিত আসনের উপনির্বাচনে ভুট্টোর পিপলস্ পার্টির পাঁচজন প্রার্থী 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত' হয়েছে এবং অন্তত আরও ছ'জনের অনুরূপভাবে 'নির্বাচিত' হবার সম্ভাবনা রয়েছে।[২০৬] এর চারদিন বাদে ভুট্টো পাকিস্তানী সামরিক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে পিকিং যান।

চীনকে ভারতের উত্তর সীমান্তে সামরিক হস্তক্ষেপে সম্মত করানোর ক্ষেত্রে এই মিশনের ব্যর্থতার সংবাদ একাধিক সূত্রে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এর 'সাফল্য' সম্পর্কে ভুট্টোর দাবী ও দ্ব্যর্থক কথাবার্তায়[২০৭] চীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু সংশয় আমাদের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। চীনের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুট্টোর সচেতন অতিশয়োক্তি পাকিস্তানী জান্তার জন্য সমূহ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বলে পরবর্তীকালে জানা যায়।[২০৮] ইতিপূর্বে চীনের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের জন্য ইন্দিরা গান্ধী যে অভিনন্দন বার্তা পাঠান তার জবাবে ভুট্টো- মিশনের প্রত্যাবর্তনের পর চৌ এন- লাই ভারত ও চীন উভয় দেশের জনগণের বন্ধুত্ব বন্ধন উন্নত হওয়ার আশা প্রকাশ করে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে - আমেরিকা ও পাকিস্তানের উপর্যুপরি প্রচেষ্টার জন্যই হোক, মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর ক্রমবর্ধিত চাপের মুখে

পাকিস্তানের হতদ্দশা দৃষ্টেই হোক, অথবা চীনের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে আসায় চীনের নেতৃত্ব পুনরায় নিজেদের সবল মনে করার জন্যই হোক - চীন পাকিস্তানের সমর্থনে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বেঞ্জামিন ওয়েলার্ট যখন পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় ব্যস্ত এবং অপরদিকে ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল যখন সামরিক হস্তক্ষেপে চীনা নেতৃত্বকে সম্মত করার জন্য পিকিং গমনে উদ্যত, সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে মার্কিন প্রশাসনের উপমহাদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার সুযোগ অতি সামান্যই ছিল। যে কারণে ইন্দিরার এই দূরযাত্রা, সেই শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে নিক্সন তার প্রকাশ্য বিবৃতি-বক্তৃতায় সম্পূর্ণ নিরব থাকেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তিন ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকেও তিনি শরণার্থী-সংক্রান্ত সমস্যা এড়িয়ে যান, সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহাস্য বন্ধ করার প্রয়োজন উল্লেখ করেন, এবং পাকিস্তানকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সামন্য বলে দাবী করেন।[২০৯] নিক্সনের একমাত্র 'কনসেশন' ছিল পাকিস্তানকে দেয় ৩.৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সাহায্য বন্ধ ঘোষণার।[২১০] শেখ মুজিবের মুক্তি ও সঙ্কটের নিরস্ত্র সমাধানে নিক্সনের সহযোগিতা লাভের কোন ক্ষীণ আশা তখনও যদি ইন্দিরা গান্ধীর থেকে থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে, কোন যুক্তইশতেহার ব্যতিরেকেই, তিনি স্বদেশের পথে পাড়ি জমান ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মানী হয়ে। প্যারিসের বহুলাংশে সহানুভূতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে ইন্দিরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন: পূর্ব বাংলার একমাত্র সমাধান স্বাধীনতা, শীঘ্রই হোক আর দেরীতেই হোক এ স্বাধীনতা আসবেই।[২১১] নভেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে কেবল ইন্দিরা গান্ধীই নন, আরো অনেক মহল থেকে একই পরিণতির কথা উচ্চারিত হয়েছিল প্রাঞ্জল ভাষায়।[২১২]

ইন্দিরা গান্ধীর আরেমরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ সফরের পর সঙ্কটের নিরস্ত্র সমাধানের শেষ আশাটুকুও যখন নিঃশেষিত, তখন শরণার্থী সমস্যা থেকে ভারতের নিষ্কৃতির পথ ছিল মাত্র একটিই। এই পথ ছিল, সামরিক পন্থায় পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী দখলের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করে সেখানে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের উপযোগী নিরাপদ রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করা। এপ্রিলে পাকিস্তানী গণহত্যার ভয়াবহ শুরুতে, সর্বাংশেই এক হতচকিত অবস্থার মাঝে, ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের জন্য তাজউদ্দিনকে যে

সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেছিলেন তার আন্তরিকতা ও গুরুত্ব লঘু করা চেষ্টা না করেও বলা যায়, মূলত পাকিস্তানী জান্তার 'সামরিক সমাধানের' অনিবার্য ফল হিসাবে সৃষ্ট অবিরাম শরণার্থী স্রোত ভারতের উপর অশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ ছাড়াও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে তা সমাধানের অপর কোন পন্থা ভারতের ছিল না। এই পরিণতির দিকে ভারতের সর্বোচ্চ মহলের বক্তব্য ক্রমশ যেমন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়,[২১৩] তেমনি দখলকৃত বাংলাদেশের সীমান্তে নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে ভারতের সামরিক চাপ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে।[২১৪] মার্চে পাকিস্তানী গণহত্যা শুরুর জবাবে পূর্ব বাংলার অকুতোভয় ছাত্র, যুবক ও বিদ্রোহী সৈন্যের দল সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার পর তারই পর্যায়ক্রমিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্বে পাকিস্তানের নির্মম সুসংগঠিত সামরিক যন্ত্রকে বিচূর্ণ করার জন্য বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর অংশগ্রহণ যেরূপ অত্যাবশ্যক গণ্য করা হয়েছিল, বিগত কয়েক মাসে রাজনৈতিক আপোস-মীমাংসা ও কূটনৈতিক মধ্যস্থতার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি নিঃশেষ করার পর শরণার্থী উপদ্রুত ভারতের জন্যও তদ্রূপ ভূমিকা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ সামরিক ভূমিকা গ্রহণের পথে তখনও ভারতের একটি বড় সমস্যা ছিল। বাংলাদেশের জন্য ভারতের সর্ববিধ সহযোগিতা প্রদান, এমনকি মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে সীমান্ত সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করা ছিল এক কথা, আর পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের সর্বাত্মক যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ভারতের জন্য শেষোক্ত পদক্ষেপের অনিবার্য পরিণতি ছিল বিশ্বের কাছে নিজকে আক্রমণকারী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। বাংলাদেশ সঙ্কটের চাপে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে নিরাপত্তা বিষয়ক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর জোট-বহির্ভূত দেশ হিসাবে নিজের পূর্বতন ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে ভারত ইতিমধ্যেই যে সমস্যার মোকাবিলা করতে শুরু করে, তা পাকিস্তান আক্রমণের উদ্যোগ নিয়ে অনেক বেশী জটিল করে তোলা এবং অন্তত বেশ কিছু কালের জন্য অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা একটি অত্যন্ত দুরূহ সিদ্ধান্ত ছিল। একদিকে উদ্ভূত সঙ্কট নিরসনে প্রত্যক্ষ সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের মৌল প্রয়োজন এবং অন্যদিকে সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের ফলে গুরুতর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা - এই পরস্পরবিরোধী বিবেচনার মধ্যে ভারতের সিদ্ধান্ত নির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত হবার আগেই পাকিস্তানী জান্তাই ভারতকে

এই উভয় সঙ্কট থেকে মুক্ত করে। ‘পূর্ব পাকিস্তানের’ অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সীমান্তে ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর মিলিত ও ক্রমবর্ধিত চাপের[২১৫] বেসামাল প্রতিক্রিয়া হিসাবেই হোক, কিংবা পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হবার পর তা অমীমাংসিতভাবে শেষ করার ক্ষেত্রে অন্তত একটি মিত্র রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের আশ্বাস বা স্বকল্পিত আশাকে অবলম্বন করেই হোক, কিংবা ক্ষমতাসীন জান্তার অভ্যন্তরে ক্ষমতা বদলের জন্য কোন ষড়যন্ত্রমূলক প্ররোচনার কারণেই হোক, অথবা এই সমুদয় কারণ কমবেশী সংমিশ্রিত হওয়ার ফলেই হোক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিজেই যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৩শে নভেম্বর পাকিস্তান ‘জরুরী অবস্থা’ ঘোষণা করে এবং ঐ দিন তক্ষশীলায় চীনা সাহায্যে নির্মিত ভারী যন্ত্রপাতি কারখানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চীনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান ‘দশ দিনের মধ্যে’ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করেন।[২১৬] যথাসময়ে সম্ভাবনাটি বাস্তবায়িত হয়।

অধ্যায়- ১৯: নভেম্বর

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ পরবর্তী ঘটনা বিকাশের সম্ভাব্য পথ ছিল দুটি: (১) আসন্ন শীতে ভারত-তিব্বত গিরিপথসমূহ তুষারাবৃত হয়ে পড়ার পর ঢাকার উদ্দেশে মিলিত ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত অভিযান; অথবা (২) শীতের প্রাক্কালে গিরিপথসমূহ উন্মুক্ত থাকতেই আসন্ন বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য আমেরিকা ও চীনের কৌশলী হস্তক্ষেপের (tactical intervention) উপর ভরসা করে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক তদারকিতে যুদ্ধবিরতি ও স্থিতাবস্থা নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা। এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে প্রকৃত ঘটনা কোন্ পথে অগ্রসর হতে পারে, তা সুস্পষ্ট ছিল না। তবে কার্যকারিতার দিক থেকে প্রথম সম্ভাবনার সাফল্য উজ্জ্বলতর মনে হয় মূলত দু’টি কারণে। প্রথমত, মুক্তাঞ্চল গঠন প্রতিরোধ করার দীর্ঘ শ্রান্তিকর কাজে পাকিস্তানী বাহিনী সুদীর্ঘ সীমান্ত বরাবর ছড়িয়ে থাকায় তাদের প্রহরার এলাকা সুবিস্তৃত ছিল বটে, কিন্তু তার ফলে বৃহত্তর আক্রমণ প্রতিরোধের গভীরতা সর্বত্রই তাদের লোপ পায়। তাদের প্রতিরক্ষার আয়োজন অনেকটা হয়ে ওঠে স্ফীত বেলুনের মত-এর বহিরাবরণ যতই নিরবচ্ছিন্ন দেখাক, এর ভিতরটা ছিল সর্বাংশেই ফাঁপা। দ্বিতীয়ত, সকল প্রধান সড়ক ও যোগাযোগ কেন্দ্রে পাকিস্তান প্রতিরক্ষার

জন্য যে সব ‘দুর্গ’, ‘মজবুত ঘাঁটি’ প্রভৃতি গড়ে তুলেছিল, সে সব পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কৌশল অবলম্বনের দরুন ঢাকার উদ্দেশে দ্রুত অভিযান পরিচালনা ভারত ও বাংলাদেশ মিলিত বাহিনীর পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয়।

অবশ্য এক্ষেত্রে আশঙ্কা ছিল এই যে, বাংলাদেশ- ভারতের এই অভিযান দৃষ্টে পাকিস্তান দ্রুত তাদের সৈন্য গুটিয়ে এনে ঢাকা নগরী অবরোধের প্রচেষ্টা চালাতে পারে। পাকিস্তানীদের হাতে ঢাকার জনসমষ্টি পণবন্দী (hostage) হিসাবে অবরুদ্ধ হওয়ার পর তাদের মুক্ত করার প্রচেষ্টায় অকল্পনীয় প্রাণহানী এবং বাড়ীঘর ও সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তো ছিলই তদুপরি পাকিস্তানের চূড়ান্ত পরাজয় বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কাও ছিল প্রবল। এই অবস্থায় চীনের সম্ভাব্য ভূমিকা অস্পষ্ট হয়ে থাকলেও, মার্কিন সপ্তম নৌবহরের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ যে পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের প্রত্যাশিত পরাজয়কে অত্যন্ত অনিশ্চিত করে তুলতে পারে এবং তার ফলে মুক্তিসংগ্রাম যে অধিকতর দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী পর্বে প্রবেশ করতে পারে, সে জাতীয় আশঙ্কা নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী ও আমার মধ্যে আলোচিত হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন হস্তক্ষেপের আশঙ্কা প্রবল বলে গণ্য করলেও আমরা এই উপলব্ধিতে পৌঁছি যে, ঢাকার চতুষ্পার্শ্বে দ্রুত ব্যূহ রচনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের নিজস্ব সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কোন কার্যকর হস্তক্ষেপ সম্ভব নয়। ঢাকার বুকে ‘সর্বশেষ লড়াই’ সংঘটনের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পাকিস্তানের রয়েছে কি না অথবা ঢাকায় ব্যূহ রচনার মত কোন রিজার্ভ সৈন্যের আয়োজন তাদের আছে কি না, তা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তৎসত্ত্বেও ঢাকা নগরীর সম্ভাব্য অবরোধ, মার্কিন সপ্তম নৌবহরের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ঊর্ধ্বতন ভারতীয় নেতৃত্বের গোচরে আনার বিষয় স্থির হয়।

বস্তুত নভেম্বরে যুদ্ধের সম্ভাবনা যতই নিকটতর ও স্পষ্টতর হতে থাকে, ততই তার অন্তর্নিহিত সমস্যাবলী অধিকতর মুখ্য ও জরুরী হয়ে উঠতে থাকে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ব্যবস্থাপনা ও আক্রমণধারা উন্নত করার জন্য যে সব বিষয় এতদিন অগ্রাধিকার লাভ করে এসেছিল সেগুলির প্রয়োজন হ্রাস পেতে শুরু করে, এমনকি কোন কোন বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতি অংশত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যেমন, পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের চার ডিভিশন এবং ভারতের সাত ডিভিশন সৈন্যের শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে বিগত কয়েক মাস ধরে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান

সর্ববৃহৎ হলেও, এই দুই পেশাদার সশস্ত্রবাহিনীর প্রত্যাসন্ন সংঘাতের পটভূমিতে অনিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের, এমনকি বাংলাদেশের নিয়মিত ব্যাটালিয়ানসমূহের ভূমিকা পূর্বাপেক্ষা সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সীমিত ভূমিকার অর্থ গুরুত্বশূন্য ভূমিকা নয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযানের মূল দায়িত্ব ভারতীয় কমান্ডের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও শত্রু- অবস্থানের পশ্চাতের তৎপরতা ও সংশ্লিষ্ট কৌশল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সামরিক কমান্ডের সহায়ক ভূমিকার প্রভূত প্রয়োজন ছিল।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে স্বভাবতই যে উদ্যোগ প্রত্যাশিত ছিল, ওসমানী তা থেকে নিজকে বহুলাংশে দূরে সরিয়ে ফেলেন এবং সার্ভিস ম্যানুয়াল রচনার মত এমন সব কাজে নিজকে ব্যস্ত রাখেন যার সঙ্গে প্রত্যাসন্ন চূড়ান্ত অভিযানের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। অক্টোবরের শেষে ওসমানীর আপত্তি সত্ত্বেও যুগ্ম- কমান্ডব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর থেকে ওসমানীর আচরণে কোন স্পষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা অথবা তাঁর বক্তব্যে গ্রহণযোগ্য বিকল্প রণকৌশলের প্রস্তাব ছিল না। বস্তুত ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে নিয়মিত বাহিনীর তৎপরতার ফলে উদ্ভূত নির্দিষ্ট সমস্যাদি প্রতিবিধানের
জন্য[২১৭] তাজউদ্দিন যখন যুগ্ম- কমান্ড গঠনের পক্ষে মনস্থির করেন, তখন এ বিষয়ে কোন বিকল্প প্রস্তাব না করেই যুগ্ম- কমান্ড গঠিত হলে নিজে পদত্যাগ করবেন বলে ওসমানী তাজউদ্দিনকে হুমকি দেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন আরো কয়েকটি ইস্যুতে ওসমানী এ ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এই প্রথমবার তাজউদ্দিন তাঁকে জানান, লিখিতভাবে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করলে, তাজউদ্দিন এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন। অতঃপর ওসমানী যুগ্ম- কমান্ড অথবা পদত্যাগপত্র সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। কিন্তু ভারতীয় সামরিক নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর পূর্বসঞ্চিত বিরূপ ধারণা এরপর থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এর প্রভাব রণাঙ্গনে নিয়মিত বাহিনীর উপর কতখানি পড়েছিল বলা শক্ত; তবে সেক্টর অপারেশনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমান্ডের ভূমিকা বরাবরই যতটা দুর্বল ও অনিয়মিত ছিল, নভেম্বরেও তার কোন তারতম্য ঘটেনি বলে মনে করা চলে। চূড়ান্ত অভিযানের প্রাক্কালে ওসমানীর এহেন ভূমিকার ফলে ভারতীয়দের সঙ্গে গৃহীতব্য তৎপরতা ও কৌশলের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার অনেকখানি তাজউদ্দিনকেই পূরণ করার চেষ্টা করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে ডেপুটি চীফ- অব- স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করিম খোন্দকার বিমানবাহিনীভুক্ত অফিসার হলেও

গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের স্বচ্ছতার দরুন পেশাগত পরামর্শের জন্য আরও বেশী নিয়োজিত হতেন।

পাকিস্তানের সম্ভাব্য অবরোধ ও ধ্বংসের হাত থেকে ঢাকা নগরীকে রক্ষা করার চিন্তা ছাড়াও অন্য যে একটি উদ্বেগ এ সময় তাজউদ্দিনের জন্য মুখ্য হয়ে ওঠে তা ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশিত সাফল্যের পর প্রতিহিংসা- হত্যার বিপদ থেকে শেখ মুজিবের জীবন রক্ষা করার। তাজউদ্দিনের আশঙ্কা জন্মেছিল প্রত্যাসন্ন চূড়ান্ত লড়াইয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে শেখ মুজিবের জীবন রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, যদিও বাস্তবক্ষেত্রে আগস্ট মাস থেকে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা উন্নত হওয়ার লক্ষণ ক্রমশ প্রকাশ পেয়ে চলে। ৩রা আগস্টে ইয়াহিয়া খান যখন ঘোষণা করেন যে দেশদ্রোহিতার অপরাধে শীঘ্রই শেখ মুজিবের বিচার এবং উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হবে[২১৮] তখন শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা কিছুমাত্র রয়েছে বলে মনে করা কঠিন হয়ে পড়ে। ৫ই আগস্টে সামরিক জান্তার যে তথাকথিত ‘শ্বেতপত্র’ প্রকাশিত হয়, তাতে ‘সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সংঘটনের মাধ্যমে’ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আওয়ামী লীগের ‘ষড়যন্ত্রের’ আয়োজন সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়।[২১৯] ফলে আসন্ন বিচারের রায় কি দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে কার্যত সকল অস্পষ্টতা দূর হয়। ৭ই আগস্টে আওয়ামী লীগের যে ৭৯ জনের নাম জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ থেকে বাতিল করা হয়, তাদের মধ্যে শেখ মুজিবের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২২০] ৯ই আগস্ট পাকিস্তান থেকে পুনরায় ঘোষণা করা হয়, ‘পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য’ শেখ মুজিবের শীঘ্রই বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার করা হবে।[২২১] কিন্তু ঐ দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নয়াদিল্লীর সঙ্গে ওয়াশিংটনের সময়ের তফাৎ সাড়ে দশ ঘণ্টার মত; ফলে মৈত্রীচুক্তি- সংক্রান্ত ঘোষণার পর ঐ দিনই মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কোন ‘দ্রুত ব্যবস্থা’ (summary action) গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেয়।[২২২] ফলে পরবর্তী ঘোষণা অনুযায়ী ১১ই আগস্টে লায়ালপুরে বিশেষ সামরিক আদালতে রুদ্ধদ্বার বিচার শুরু হলেও ঐ দিনই তা মুলতবি ঘোষণা করা হয়। ৭ই সেপ্টেম্বরে যখন পুনরায় বিচার শুরু হয়, তখন শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনের জন্য এ. কে. ব্রোহী এবং তাঁর তিনজন সহকারী আইনজীবীকে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়।[২২৩] ২রা অক্টোবরে পাকিস্তানের সামরিক আদালত শেখ মুজিবকে ‘অপরাধী’ সাব্যস্ত করে ‘মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশ’

করছে বলে একটি কূটনৈতিক সূত্রে প্রকাশ পায়; অবশ্য একই সূত্র থেকে বলা হয় যে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গকে এই নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে যে সামরিক আদালতের এই রায় কার্যকর করা থেকে তারা বিরত থাকবে।[২২৪] এই তথ্যের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় ১০ই অক্টোবরে, যখন জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগপন্থীদের পূর্ববর্তী তালিকা ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে প্রকাশিত হয়। এই তালিকা থেকে শেখ মুজিবের নাম বাদ পড়ে।[২২৫] অর্থাৎ 'মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত' শেখ মুজিব তাঁর নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ আসনে কার্যত পুনর্বহাল হন। অক্টোবরের শেষে 'নিউজউইক' পত্রিকার প্রতিনিধিকে ইয়াহিয়া খান জানান, শেখ মুজিবকে তিনি খেয়ালখুশী মত ছেড়ে দিতে অসমর্থ হলেও, 'জাতি যদি তাঁর মুক্তি চায়' তবে ইয়াহিয়া 'তা পূরণ করবেন'।[২২৬] পরবর্তীকালে কিসিঞ্জারের বিবরণ থেকেও দেখা যায়, ৩রা নভেম্বরে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কিসিঞ্জারকে অবহিত করেন, 'ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের মনোনীত কোন প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করার বিষয় বিবেচনা করতে রাজী আছে।[২২৭]

'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অপরাধে মৃত্যুদণ্ড লাভের সম্ভাবনা থেকে শেখ মুজিবের অবস্থার এই ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশকে মুক্ত করার চূড়ান্ত অভিযান শুরু করার পর পুনরায় তাঁর জীবনাশঙ্কা দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে তাজউদ্দিনের উদ্বেগ ভিত্তিহীন ছিল না। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় সচেষ্ট মার্কিন প্রশাসন শেখ মুজিবের প্রাণসংহার থেকে ইয়াহিয়াচক্রকে নিবৃত্ত রাখবে বলে অনুমান করা হলেও,[২২৮] পাকিস্তানের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর সামরিক জান্তাকে শেষ উন্মত্ততা থেকে বিরত রাখা যে সম্ভব হবে, এমন নিশ্চয়তার সত্যই অভাব ছিল। এই আশঙ্কাবোধ থেকে শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষার নিশ্চিত উপায় উদ্ভাবন নভেম্বরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে তাজউদ্দিনের অন্যতম প্রধান প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেই সময় ঢাকা নগরীর ও শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের সঙ্গে সামগ্রিক সমর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির যোগসূত্র প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠায় এবং মন্ত্রিসভা তখনও অবধি উচ্চ স্তরের সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার মত প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হওয়ায় তাজউদ্দিন প্রায় এককভাবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অক্টোবরের প্রথম থেকে মন্ত্রিসভার কাজকর্মে শৃঙ্খলা ও সমন্বয় যদিও উন্নত হতে শুরু করে তবু মোশতাক, মাহবুব আলম চাষী প্রভৃতির কার্যকলাপের বিবরণ সম্পর্কে

কমবেশী অবহিত হওয়ার পরেও তাদের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে মতপার্থক্যহেতু মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে তথ্যের নিরাপত্তা তখনও এক গুরুতর সমস্যা ছিল। ইতিপূর্বে ২৭শে অক্টোবর অপরাহ্নে কোলকাতায় ৮ থিয়েটার রোড সংলগ্ন লর্ড সিনহা রোডস্থ বিএসএফ ভবনে এক বিশেষ জরুরী ব্রিফিং- এ ডি. পি. ধর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ও আমাকে মোশতাকচক্র ও মার্কিন প্রতিনিধিদের মধ্যে গোপন দেনদরবারের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বিবরণ দান করেন, তাতে অনেক বিষয়ের মধ্যে এ কথাও সুস্পষ্ট হয় যে, মোশতাকের উপস্থিতিতে মুক্তিসংগ্রামের উচ্চতর সামরিক পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রিসভা আদৌ কোন নিরাপদ ফোরাম নয়। ঐ দিন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে- আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির মুলতবি বৈঠকের এক ফাঁকে - তাজউদ্দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু মোশতাক সম্পর্কে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দোদুল্যমান মনোভাবের ফলে উভয়ের মধ্যে কয়েক- দফা বৈঠকের পর কেবল মাহবুব আলম চাষীর বিরুদ্ধেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের এক অস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিসভার ভিতরে তথ্যের এই নিরাপত্তার অভাব এবং প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর অভিমানহত আচরণের ফলে নভেম্বরের মাঝামাঝি - পাকিস্তানের সঙ্গে চূড়ান্ত সামরিক বোঝাপড়ার প্রাক্কালে - বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে সকল সামরিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল তার অধিকাংশই তাজউদ্দিন একক দায়িত্বে গ্রহণ করেন।[২২৯] যদিও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি মন্ত্রিসভার পূর্ণ সম্মতি এবং দলীয় নেতৃবর্গের মতামত লাভের জন্য সচেষ্ট থাকতেন।

এই সময়ে অর্থাৎ নভেম্বরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানী বাহিনীর দখল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার বৃহত্তর লক্ষ্যের অধীনে ঢাকা নগরীকে সম্ভাব্য ধ্বংস থেকে রক্ষা করা, মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায়ে পাকিস্তানী প্রতিহিংসা থেকে মুজিবের জীবন রক্ষা করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আটক বিপন্ন বাঙালীদের মুক্ত করার প্রয়োজন বিশেষ মনোযোগের বিষয়ে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধের এই তিনটি অধস্তন অথচ অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সুনির্দিষ্টভাবে ভারতের বাংলাদেশ- নীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক ডি. পি. ধরের কাছে উপস্থিত করার ফলে এবং ইত্যবসরে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্রমবর্ধিত দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠার ফলে সরাসরি ঢাকার উদ্দেশে দ্রুত অভিযান চালিয়ে সম্ভাব্য পাকিস্তানী অবরোধ প্রচেষ্টা প্রতিহত করার এবং সে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে পাক- বাহিনীর সকল পলায়নপথ রুদ্ধ করে পণবন্দী হিসাবে তাদের ব্যবহার করার পক্ষে

চিন্তাভাবনা জোরদার হয়। ১৫ই নভেম্বর দিল্লীতে আমি এই সমুদয় বিষয়ের প্রতি ডি. পি. ধরের দৃষ্টি আকর্ষণের পর লক্ষ্য করি অন্তত রাজনৈতিক পর্যায়ে তাদের চিন্তাও সমমুখী। ভারতের সামরিক নেতৃত্বও একই লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী হবেন বলে অনুমান করা হলেও কার্যক্ষেত্রে ঐ সময় তাদের সামরিক পরিকল্পনার রূপান্তর কিভাবে অগ্রসর হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের যথার্থ ধারণা ছিল না। পরবর্তীকালে প্রকাশিত বর্ণনা থেকে জানা যায়, অংশত গতানুগতিক অভিযান- পদ্ধতি ও সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এবং অংশত নদীনালা অতিক্রমের উপযোগী পর্যাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং সাজ- সরঞ্জামের অভাবে ভারতের সামরিক নেতৃত্ব শেষ মুহূর্ত অবধি ঢাকাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উঠতে পারেনি।[২৩০] সৌভাগ্যবশত বঙ্গোপসাগর দিয়ে পাকিস্তানীদের পলায়নপথ সম্পূর্ণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৌ- অবরোধ পরিকল্পনা এবং স্থলভূমিতে পাক- বাহিনীর চলাচল ও পুনর্সমাবেশ বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিমান তৎপরতার সিদ্ধান্ত যথোচিত সম্পূর্ণতার সঙ্গেই গৃহীত হয়। কিন্তু ভারতীয় সামরিক পরিকল্পনায় ঢাকাকে মুক্ত করার বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তের অভাবহেতু বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরীর সমাবেশের পর মুক্তি অভিযান বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার যে আশঙ্কা দেখা দেয়, নির্ভেজাল উপমহাদেশীয় রীতিতে পাকিস্তানের বৃহত্তর ভুলের জন্য তার সংশোধনও ঘটে। ডিসেম্বরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জানা যায়, নভেম্বরের শেষার্ধেও পাকিস্তান ভারতের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে 'অনবহিত থাকায়', ঢাকার জন্য আলাদা রিজার্ভের ব্যবস্থা তাদের তো ছিলই না, এমনকি সীমান্ত থেকে সৈন্য গুটিয়ে আনারও কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না।[২৩১]

রাজনৈতিক পর্যায়ে ভারতীয় আশ্বাসের তুলনায় ভারতের সামরিক পরিকল্পনা পিছিয়ে থাকার ফলে ঢাকাকে দ্রুত মুক্ত করা তথা বিজয় সম্পন্ন করার পথে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বৃহত্তর সামরিক ভুল ছাড়াও আর একটি উপাদান কার্যকর ছিল। নভেম্বরে বাংলাদেশের বাইরে ও ভিতরে স্বাধীনতা- সমর্থক প্রায় সকল অবহিতমহল বিশ্বাস করতেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মিলিত অভিযান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত এলাকার সর্বত্র দীর্ঘ- নির্যাতিত মানুষের বিদ্রোহের শক্তি পুনরায় এমনভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে যে পাকিস্তানের অবশিষ্ট সামরিক ক্ষমতা তাতে সর্বাংশে বিপর্যস্ত না হয়ে পারে না। এই সব আশ্বাস ও বিশ্বাসের ব্যাপার ছাড়াও প্রকাশিত ও সংগৃহীত তথ্য থেকে সে সময়েই জানা যায়, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমবর্ধিত তৎপরতার ফলে

পাকিস্তানী সৈন্যদের নৈশ চলাচল ক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। রাত্রিতে মুক্তিবাহিনী এবং দিনে সম্ভাব্য ভারতীয় বিমান তৎপরতার ফলে ঢাকা অবরোধের জন্য সীমান্ত থেকে সৈন্য পিছিয়ে আনার পাকিস্তানী প্রয়াস যে অসম্ভব হতে পারে তা অস্পষ্ট ছিল না। এই সব উপলব্ধির উপর নির্ভর করে ক্ষিপ্রগতিতে ঢাকা দখল এবং সমস্ত শত্রুসেনাকে বন্দী করে ফেলার মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ও অধস্তন লক্ষ্যগুলি একযোগে অর্জন করা সম্ভব বলে মনে হয়।

১৬ই নভেম্বরে ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রণক্রমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন আহমদ দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এই বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধীর সামপ্রতিক সফরের অভিজ্ঞতা, বিশেষত বাংলাদেশ প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর মনোভাব, অধিকৃত অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা, সীমান্ত অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ, কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানের সম্ভাব্য অভিযান, ভারতের পাল্টা অভিযানের প্রস্তুতি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। সম্ভবত পূর্ববর্তী বৈঠকের অভিজ্ঞতার ফলে[২৩২] এবার চূড়ান্ত অভিযান শুরুর পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী কোন অভিমত প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন; ফলে সৈয়দ নজরুল বরং কিছুটা বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়েই এবার কোলকাতা ফিরে আসেন। এই সময়ে তাজউদ্দিনকে জানানো হয়, গত দু'মাস যাবৎ তাঁর ও ডি. পি. ধরের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের বিষয় নিয়ে যে আলোচনা চলে আসছিল তা ভারত সরকার স্থগিত রাখার পক্ষপাতী; কেননা তাদের মতে ভারতে অবস্থানকালে এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর ভারতের চাপের মুখেই সম্পন্ন হয়েছে বলে চিত্রিত হওয়া স্বাভাবিক।[২৩৩] তবে এর ফলে বাংলাদেশকে মুক্ত করার ব্যাপারে ভারতের সর্বাত্মক সহায়তার কোন তারতম্য ঘটবে না, এ প্রতিশ্রুতিও পুনরায় তাজউদ্দিনকে দেওয়া হয়।

তাজউদ্দিনও চুক্তির ব্যাপারে ভারতের এই সিদ্ধান্তকে সঠিক হিসাবেই গ্রহণ করেন। কেননা পাকিস্তানের দখল অবসানের জন্য যে ভূমিকায় ভারতকে সম্মত করানোর উদ্দেশ্যে তাজউদ্দিন এক সময় এই চুক্তির কথা ভেবেছিলেন, তার সকল আয়োজনই এখন সম্পন্ন-প্রায়। দিল্লী থেকে ফিরেই তাজউদ্দিন শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের জন্য বেসামরিক প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন, জরুরী পণ্য সরবরাহ, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা ও সমন্বিত কর্মসূচী জরুরীভিত্তিতে

প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা সেল ও সকল প্রশাসনিক বিভাগকে তৎপর করে তোলেন। অবশ্য কোন কোন দফতর নভেম্বরের প্রথম থেকেই শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের জন্য তাদের বিভাগীয় কর্মসূচী প্রণয়ন শুরু করেন। পরিকল্পনা সেল যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ শুরু করেন তারও অন্তত একমাস আগে।

তাজউদ্দিন দিল্লী থেকে ফিরে আসার দু'দিন বাদে ডি. পি. ধর কোলকাতা এসে পৌঁছান উপমহাদেশের দ্রুত ধাবমান ঘটনা পটভূমিতে, বিভিন্ন অসমাপ্ত আলোচনাকে সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে এবং সম্ভবত সামগ্রিক আয়োজনের চূড়ান্তকরণ তদারক করার উদ্দেশ্যে। আমাদের দিক থেকে বহুবিধ জটিল সমস্যার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা ছিল সরবরাহকৃত অস্ত্র পুনরুদ্ধার-সংক্রান্ত। যে সব মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল-এবং পাকিস্তান যাদেরকে অস্ত্র দিয়েছিল - তাদের কাছে থেকে প্রত্যাসন্ন বিজয়ের পর অস্ত্র পুনরুদ্ধার করার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আলোচনাধীন একটি খসড়া প্রস্তাব এবং সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে নিযুক্ত করেন। ১৯ থেকে ২১শে নভেম্বরের মধ্যে ডি. পি. ধরের সঙ্গে আমার মোট চার-দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে দীর্ঘতম বৈঠক ছিল ১৯শে নভেম্বর এবং এই দিনের আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আমার রাখা সংক্ষিপ্ত নোট ছিল:

> "Meeting took place at 9 pm at Grand Hotel. DP, (Indian) Defence Secretary K. B. Lal and MH discussed about: (1) the nature of the political problem after liberation; (2) the arrangement for disarming the FF (and other armed elements); (3) the minimum and maximum time-frame for Indian Army to remain in Bangladesh after liberation; and (4) the possibility of intervention by US Seventh Fleet. Reasons given for possible US intervention: (a) with the programme of scaling down the (US) basing arrangements in S.E. Asia,... and when the future of that region looked uncertain, could the US afford the risk of breaking the status-quo of South Asia? (b) particularly when it was being initiated in the background of Indo-Soviet Treaty, could the US accept the rise of Russian influence in

South Asia which was about to decapaciate its staunch ally (Pakistan)?....”

এই বৈঠক সম্পর্কে কিছু বর্ণনা আবশ্যক। পাকিস্তানের সঙ্গে নিকটভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠার পর দ্রুতগতিতে বাংলাদেশকে পাকিস্তানী দখল থেকে মুক্ত করা সম্ভব - এই অনুমানের উপর নির্ভর করে বর্তমান ও সম্ভাব্য পরিস্থিতির বিশেষণ এবং এর মাধ্যমে মূল সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কাজের পরিসীমা নির্ধারণই এই সব বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে উচ্চতর রাজনৈতিক অনুমোদনের পর বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রোগ্রাম প্রণয়ন সম্ভব হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সম্ভাব্য রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে ঐ সন্ধ্যায় যে আলোচনা হয়, তাতে দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। প্রায় আট মাস ধরে পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের স্থানীয় অনুচরবৃন্দ বর্ণনাতীত হত্যা, নির্যাতন ও বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়ে এসেছে এবং তার বিরুদ্ধে কার্যত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণবিহীন বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র তরুণের দল মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ফলে গোটা সমাজ সর্বাংশে আলোড়িত হয়েছে। তারই উপর এক সর্বাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হতে চলেছে। এই সব কিছুর সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনে যে অকল্পনীয় তোলপাড় অবধারিত, তা নিয়ন্ত্রণ করা যে কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষেই দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র তরুণদের নিয়োগের ফলে পূর্ববর্তী ছ’মাস কার্যত এক ধরনের সমাজবিপ্লবের সূচনা ঘটে। শত্রুসেনা ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে এই সশস্ত্র তরুণদের ক্রমবর্ধিত তৎপরতা পুরাতন ব্যবস্থার সুবিধাভোগী শ্রেণীর দুর্গতির সৃষ্টি করা ছাড়াও পুরাতন সমাজের খোদ কাঠামোকেই আঘাত করতে শুরু করে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তরুণ যোদ্ধাদের কোন নতুন সামাজিক মূল্যবোধে ও বিকল্প সমাজব্যবস্থা গঠনের অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, অথবা কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে তাদের সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলা সম্ভব না হওয়ায় প্রত্যাসন্ন স্বাধীনতার পর সামাজিক পুনর্গঠনের ঐক্যবদ্ধ শক্তির পরিবর্তে বহুধা বিভক্ত সশস্ত্র গ্রুপ ও সামাজিক অরাজকতার শক্তির অভ্যুদয়ের আশঙ্কা ছিল অপেক্ষাকৃত প্রবল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রচারযন্ত্রের ব্যর্থতা স্বীকার্য কিন্তু তা আর তখন সংশোধনযোগ্য নয়। এই অবস্থায় প্রত্যাশিত স্বাধীনতাকে সম্ভাব্য সামাজিক অরাজকতা ও সশস্ত্র হানাহানির আবর্ত থেকে রক্ষা করার জন্য

অস্ত্রশস্ত্র ফেরত নেওয়ার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ সর্বাপেক্ষা জরুরী বিষয় বলে চিহ্নিত করা হয়। যেহেতু বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল ছিল, সেহেতু দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের যে অংশ সততা, সাহস ও কর্তব্যবোধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাদের সকলকে স্বাধীনতা সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলির মিলিত কমান্ডব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের সহায়তায় অস্ত্র পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা চালানো অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। পরবর্তী কয়েক দিন তাজউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনার ফলে এই চিন্তার আরও সম্প্রসারণ ঘটে এবং বহুদলীয় কমান্ডব্যবস্থার অধীনে সকল মুক্তিযোদ্ধার সমবায়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে প্রয়োজনীয় স্ক্রীনিং- এর পর নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন গঠনমূলক প্রয়োজনে তাদের সদ্ব্যবহার করার পক্ষে এক পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী হতে থাকে। তবে ১৯শে নভেম্বরের ঐ বৈঠকে বহুদলীয় কমান্ডব্যবস্থার অধীনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় অস্ত্র পুনরুদ্ধারের কর্মসূচী কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি ও পরোক্ষ সহায়তার প্রশ্ন নির্দিষ্টভাবেই উত্থাপিত হয়।

ডি. পি. ধর পূর্ববর্তী তিন মাসে বাংলাদেশের সর্বস্তরের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধির সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা চালানোর ফলে একটি বিষয়ে অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হন এবং দু'একবার তা তিনি আমার কাছে ব্যক্তও করেন: বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর ভারতীয় বাহিনী সেখানে যত অল্প সময় অবস্থান করবে, মিত্র হিসাবে ভারতের অর্জিত সুনাম ততবেশী অক্ষুণ্ন থাকবে। কাজেই ডি. পি. অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমার কাছে জানতে চান, সর্বাধিক কতদিন ভারতীয় সৈন্যকে বাংলাদেশে থাকতে হতে পারে বলে আমাদের ধারণা? এ প্রশ্নের উত্তর অংশত নির্ভরশীল ছিল, পলায়ন বা পরাজয় বরণের আগে পাকিস্তানী বাহিনী অধিকৃত প্রশাসন ও অবকাঠামোর কতখানি ধ্বংসসাধন করবে এবং অংশত পরাজয়ের পর পাকিস্তান তার হৃত উপনিবেশ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে কোন নতুন সামরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে কিনা তার উপর। পাকিস্তান যদি পরাজয় বরণের আগে কোন 'পোড়ামাটির নীতি' (scorched earth policy) অবলম্বনের সুযোগ না পায় এবং পরাজয়ের পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পুনরায় সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষমতা হারায়, তবে আশা করা যায়, তিন- চার মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের নিজস্ব সামরিক ও আধা- সামরিক বাহিনীকে ন্যূনতম কর্মদক্ষতার মানে উন্নীত করা সম্ভব; এরই পাশাপাশি সম্মিলিত রাজনৈতিক কমান্ডের অধীনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় অস্ত্রশস্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য বহুলাংশেই

অর্জন করা সম্ভব। আর যদি শেখ মুজিব তাঁর বিরাট জনপ্রিয়তা নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন, এবং সরকারের দায়িত্ব তুলে নেবার পরেও জাতির ঐক্যবোধ এবং সম্মিলিত আস্থার প্রতীক বহুদলীয় কমান্ডকাঠামোকে কার্যকর রাখেন, তবে আরো আগে বা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি বাংলাদেশের সম্ভাব্য অরাজক পরিস্থিতি প্রতিরোধের জন্য আমাদের বিবেচনায় অপরহার্য বলে আমি উল্লেখ করি।

মধ্যরাত্রির পর ডি. পি. ধর যখন আমাকে বিদায় জ্ঞাপনের জন্য হোটেলের লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে চলেন, তখন পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হিসাবে প্রথমবারের মত আমি উল্লেখ করি, আমাদের বিবেচনায়, পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের চূড়ান্ত পতন বন্ধ করার জন্য সপ্তম রণতরী বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়ে ঢাকার উপর বিমান- আচ্ছাদন বিস্তার এবং নৌসেনা অবতরণের চেষ্টা চালাতে পারে। ডি. পি. ধর পাকিস্তানী জান্তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কংগ্রেসের উভয় পরিষদ এবং সংবাদমাধ্যমসমূহের প্রবল সমালোচনার পটভূমিতে এহেন হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা ‘রাজনৈতিকভাবে খুবই দূরবর্তী’ বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু যে সহজ ও আপাতসিদ্ধ যুক্তি উল্লেখমাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত আশঙ্কার বিশেষণে প্রবৃত্ত হন তা ছিল: দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে জোট- বহির্ভূত ভারতের প্রভাব ও শক্তিকে সীমিত করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সতের বছর যাবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ‘মুসলিম পাকিস্তান’কে সবল করার জন্য সাহায্য করে এসেছে, সেখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের মত ঔদ্ধত্য দেখাবার পর, সেই ভারত যদি বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়, তবে কেবল জনমতের ভয়েই কি যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার আঞ্চলিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবে? জনমতই যদি মার্কিন প্রশাসনের সামরিক সিদ্ধান্তের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হয়, তবে অনেক আগেই কি ভিয়েতনামে শান্তি ঘোষিত হওয়া সম্ভব ছিল না? এরপর এক ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে এই হস্তক্ষেপ সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক, সমগ্র অভিযানের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাব, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ ও পরিসর প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের দু’জনার মধ্যে আলোচনা চলে।[২৩৪]

ডি. পি. ধরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পরবর্তী তিনটি বৈঠকে বিভি বিষয়ের মধ্যে অস্ত্র পুনরুদ্ধার যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে স্বাধীনতা

সমর্থক পাঁচটি রাজনৈতিক দলের অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং জাতীয় উপদেষ্টা কমিটিকে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সম্ভাবনা-সংক্রান্ত আলোচনা প্রাধান্য পায়। এ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র অধিকৃত প্রশাসনের সমস্ত বাঙালী অফিসার এবং সর্বস্তরের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার এক পরিকল্পনা পাকিস্তানীদের রয়েছে বলে অক্টোবরে আমাদের ঢাকা গ্রুপ থেকে যে তথ্য এসে পৌঁছায়, তার তাৎপর্য এবং তা মোকাবিলার্থ বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতির বিষয় আলোচিত হয়। এই সব আলোচনা যখন চলছিল, তখন যশোর শহরের অদূরে চৌগাছায় একটি মুক্তিবাহিনী ইউনিটের অবস্থানের উপর ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ ইউনিটসহ পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণের ফলে সীমান্ত সংঘাত সহসা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানী গোলার আঘাত ভারতীয় ভূখণ্ডে এসে পড়ায় যথাযোগ্য শক্তিতে ভারতীয় বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে এগিয়ে আসে। ভারত ও পাকিস্তানের উভয় পক্ষের পদাতিক ব্রিগেড, ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ ও বিমানবাহিনীর অংশগ্রহণ এবং উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের আবহাওয়া নিকটতর হয়ে ওঠে।[২৩৫]

একই সময়ে পরিকল্পনা সেল ও বিভাগীয় সচিবদের পর্যায়ে দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর পুনর্বাসন, আইন ও শৃঙ্খলা প্রবর্তন, খাদ্য ও জরুরী পণ্য সরবরাহ, বাসস্থান, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সব খসড়া পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রণয়নের কাজ চলছিল, তাকে সমন্বিত করার জন্য ২২শে নভেম্বরে বাংলাদেশে মন্ত্রিসভার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে সেক্রেটারীদের সমবায়ে এক সাবকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়। দেশ মুক্ত হওয়ার পর বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্ত্রিসভা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অধিকৃত অঞ্চলে সরকারী অফিসার ও কর্মচারী যারা দৃশ্যত পাকিস্তানীদের সাথে সহযোগিতা করে চলেছেন, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই প্রাণের ভয়ে তা করতে বাধ্য হয়েছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তারা স্বাধীনতাযুদ্ধের গোপন সমর্থক।[২৩৬]

স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত অভিযান এবং বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের এই প্রচেষ্টার মূল্যায়নকালে একটি কথা স্মরণ রাখা বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। ২৬শে মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের দিন থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর তাদের আত্মসমর্পণের দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চলে নয় মাসেরও কম সময়। চীন, ভিয়েতনাম, আলজিরিয়া, সাইপ্রাসের বা

এঙ্গোলার তুলনায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমগ্র মেয়াদ ছিল সব চাইতে কম। মুক্তিসংগ্রামের নয় মাসের প্রথম অর্ধেক সময় অতিবাহিত হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক শরণার্থীদের আশ্রয়দানের ফলে ভারতের জন্য যে বৈদেশিক আক্রমণের বিপদ দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে ভারতের নিজস্ব নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার কাজে। আগস্টে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমে ভারতের নিরাপত্তাবোধ উন্নত হওয়ার পরেই মুক্তিযুদ্ধের জন্য ভারতীয় সহায়তার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য নিশ্চিতকরণ ব্যতীত শরণার্থী সমস্যার কোন প্রকৃত সমাধান যে একেবারেই নেই, ভারতের এই উপলব্ধির প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের পরোক্ষ সম্মতি আদায় করতে আরো দু'মাস অতিবাহিত হয়। পাকিস্তানের সঙ্কটের একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সোভিয়েট প্রচেষ্টা নিঃশেষিত হওয়ার পর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের এক সম্ভাব্য সময়সূচী সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে প্রথম ইঙ্গিত দেন। ঐ সময় থেকে ৩রা ডিসেম্বরে পাকিস্তান পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করার দিন পর্যন্ত মোট সময় পাওয়া যায় ছয় সপ্তাহের কম এবং পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দিন পর্যন্ত আট সপ্তাহের কম। এই ছয় থেকে আট সপ্তাহের স্বল্প সময়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তুলনাহীন বর্বরতার ফলে সর্বাংশে ছিন্ন ভিন্ন এক সমাজকে একত্রিত করার জন্য, বিচ্ছিন্ন বিপর্যস্ত ও লুণ্ঠিত এক অর্থনীতিকে পুনরায় সচল করার জন্য এবং এই দুই বিশাল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নতুন এক রাষ্ট্রের সংগঠনকে দাঁড় করানোর জন্য যে সুবিপুল প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তা আয়ত্ত করা কোন উপায়েই সম্ভব ছিল না। সময় ছাড়াও অভাব ছিল সংগঠনের- উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন, কর্মদক্ষ, নিষ্ঠাবান মানুষের। এই অর্থে নভেম্বর ছিল প্রয়োজন ও আয়োজনের মাঝে দুস্তর ব্যবধান উপলব্ধি করার মাস। এই ব্যবধান দুরতিক্রম্য জেনেও যুদ্ধবিধ্বস্ত নতুন স্বাধীনতার তীরভূমির দিকে পাড়ি জমাবার মাস।

ঘটনা-উত্তাল নভেম্বরে একদিকে দেশের অভ্যন্তরে শহর-বন্দর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, আর এই সংগ্রামেরই সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির জন্য আসন্ন শীতে ভারত-বাংলাদেশ মিলিত বাহিনীর সংঘবদ্ধ অভিযানের প্রস্তুতি, এবং অন্যদিকে শীতের পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে বৃহৎ মিত্রদের হস্তক্ষেপ ও আন্তর্জাতিক তদারকিতে যুদ্ধবিরতি ও স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে অবলুপ্ত করার জন্য পাকিস্তানী সামরিক চক্রের প্রয়াস- এই দুই পরস্পরবিরোধী

ঘটনাস্রোতের মাঝে বাংলাদেশের বিঘোষিত স্বাধীনতা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তা তাজউদ্দিন ২৩শে নভেম্বরের বেতার ভাষণে সুনির্দিষ্টভাবে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন:

"মুক্তিবাহিনী এখন যে কোন সময়ে, যে কোন জায়গায় শত্রুকে আঘাত করতে পারে; এমনকি শত্রুর নিরাপদ অবস্থানের কেন্দ্রে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে বিমূঢ় করে দিতে পারে।... নদীপথে হানাদাররা বিপর্যস্ত, মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় অকেজো, বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত। ক্রমেই অধিক জায়গায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কার্যকর প্রশাসন চালু হচ্ছে। আর সৈন্য সামগ্রী ও মনোবল হারিয়ে শত্রুপক্ষ ততই হতাশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে।... এখন তারা চায় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কট সৃষ্টি করতে। তারা আশা করে যে, এমন একটা যুদ্ধ হলে, বাংলাদেশের রক্ষক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হবে, মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদের পরাজয়ের গ্লানি গোপন করা যাবে এবং এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যাতে তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি যে, এর একটি উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না।... সামরিক শাসকচক্র আত্মহত্যার যে ব্যবস্থাই করে থাকুক না কেন আর এই উপমহাদেশের জন্য যে ব্যবস্থাই বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রের মনঃপুত হোক না কেন, বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা একটিই- আর তা হল পূর্ণ স্বাধীনতা। ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রতিদিন প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার সংকল্প এবং সে স্বাধীনতা রক্ষার শক্তি। দখলদার বাহিনীর বিনাশ অথবা সম্পূর্ণ অপসারণের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইতিহাস মানুষকে অন্তত এই শিক্ষা দিয়েছে যে, জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির পরাজয় নেই- এমনকি এক বিশ্ব শক্তির সমরসম্ভার দিয়েও জনগণের মুক্তিসংগ্রাম দমন করা যায় না।

"অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়ছি, সে স্বাধীনতা লাভের দিনটি নিকটতম হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে আরো আত্মত্যাগ, কষ্ট স্বীকার ও জীবন দানের প্রয়োজন হবে। স্বাধীনতার ধারণা অশেষ অর্থগর্ভ। স্বাধীনতার তাৎপর্য নির্ভর করে যুদ্ধ অবস্থায় আমরা কি মূল্য দিই এবং শান্তির সময়ে এর কি ব্যবহার করি তার উপর। শত্রু সংহারের প্রতিজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে তাই শহীদের রক্তের উপযুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিজ্ঞাও আমাদেরকে নতুন করে নিতে হবে। বাংলাদেশের

শহরে ও গ্রামে তরুণেরা যে যুদ্ধে লিপ্ত তা বিদেশী দখলদারদের বিতাড়িত করার সংগ্রাম এবং অসাম্য ও সুবিধাভোগের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম।...

"বাংলাদেশের জনসাধারণের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজও পাকিস্তানের সামরিকচক্রের হাতে বন্দী হয়ে রয়েছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে হানাদার সৈন্যদের নিষ্ক্রমণের সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। তা করবার শক্তি আমাদের আছে এবং আমরা তা-ই করতে যাচ্ছি।"...

তাজউদ্দিনের এই বেতার ঘোষণায় কোন অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতির আড়ম্বর ছিল না, ছিল কঠোর প্রস্তুতির শেষে আসন্ন ঘটনাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার অটল আত্মবিশ্বাস।

অধ্যায়- ২০: নভেম্বর - ডিসেম্বর

১৯৭১ সালে প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রিতে - পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যখন নিরস্ত্র, অসহায়, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কোনরূপ সতর্কবাণী ছাড়াই, সম্পূর্ণ অতর্কিতে আক্রমণ করে। যুদ্ধই - কেননা আক্রমণ চলে ট্যাঙ্ক, কামান, মর্টার, মেশিনগান, রাইফেল, আরও নানা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে। আক্রমণ চলতে থাকে সমগ্র স্থলভূমিতে, বিমান থেকে, জলযান থেকে। যুদ্ধই - কেননা কেউই সে আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি - ছাত্রাবাসের ছাত্র, বস্তিবাসী শ্রমিক, পল্লীবাসী কৃষক, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত, বেকার যুবক, নারী, শিশু অথবা বৃদ্ধ। কখনো কারফিউয়ের মাঝে পেট্রোলে আগুন লাগানো বস্তিবসত থেকে ভীতসন্ত্রস্ত, পলায়নপর মানুষের উপর মেশিনগানের আক্রমণ চালানো হয়েছে; কখনো হাঁটুজলে দাঁড় করিয়ে দড়িতে বাঁধা মানুষের সারি গুলি করে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে মৃতের সাথে মুমূর্ষুকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ রেখে; তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা হয়েছে এ দেশের কৃতি পুরুষদের, বন্দী শিবিরে অমানুষিক নির্যাতনের পর তাঁদের ক্ষতবিক্ষত নিস্পন্দ দেহ গোপনে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে; নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অসংখ্য মানুষকে 'শান্তি কমিটির' ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেওয়া

হয়েছে তাদের প্রাণ সংহারের উদ্দেশ্যে; পথ থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যুবকদের সমস্ত রক্ত আর্মি ব্লাড ব্যাংকে সংগ্রহ করে নেবার পর তাদের প্রাণহীন দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে খানাখন্দকে; বসতবাটি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া অসংখ্য নিষ্পাপ কিশোরী, স্নেহশীলা তরুণীমাতা, গৃহবধূদের পাশবিক ভোগের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে মাসের পর মাস; প্রাণের ভয়ে প্রায় এক কোটির মত লোক দেশছাড়া হয়েছে; যারা দেশান্তরিত হতে পারেনি তারা ভয়ার্ত উদ্বেগে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছুটে বেড়িয়েছে বিনিদ্র আর উৎকণ্ঠার নারকীয় যন্ত্রণার মাঝে; দেশবাসীর মনে কোন শান্তি ছিল না, প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না, সম্ভ্রম তো নয়ই। যদিও অঘোষিত, এত কিছুর পর একে যুদ্ধ ছাড়া আর কি নামে অভিহিত করা যায়?

প্রত্যেক যুদ্ধের যেমন পরিকল্পনা থাকে, প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, তেমনি ২৫শে মার্চে পাকিস্তানের এই অঘোষিত যুদ্ধেরও পরিকল্পনা ছিল, প্রস্তুতি ছিল। এই প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় ফেব্রুয়ারীরও আগে থেকে, যখন আকাশ পথে সৈন্য আনার কাজ শুরু হয়। এই প্রস্তুতির কথা আর যাদেরই অগোচরে থাকুক, মার্কিন সরকারের ছিল না। কিসিঞ্জার ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে মার্কিন প্রশাসনের এক আন্তঃসংস্থা সমীক্ষা প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন 'পাছে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হওয়ার চেষ্টা করে'।[২৩৭] যে সময় কার্যত সমগ্র আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ ছিল, ঠিক সে সময় কিসিঞ্জারের পক্ষে 'পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হওয়ার চেষ্টা করতে পারে' এহেন অনুমানে প্রবৃত্ত হওয়ার চেষ্টা বিশেষ তাৎপর্যময়। যে কোন সামরিক অভিযান পরিকল্পনার জন্য সত্যিকারের বিপদ যদি নাও থাকে, তবে কল্পিত বিপদ একটি দরকারই। পাকিস্তানী জান্তা পূর্ব বাংলায় সামরিক আক্রমণ চালানোর জন্য যে কল্পিত বিপদের আশ্রয় নেয় কিসিঞ্জারের পক্ষে সেই কল্পনাকে সত্যের মর্যাদায় উন্নীত করার এই অশোভন ব্যগ্রতার পিছনে একটিই মূল কারণ থাকতে পারত - মার্কিন প্রশাসন কেবল পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতির খবরই রাখতেন না, অধিকন্তু এই আসন্ন অভিযানের পক্ষে তাদের অন্তত পরোক্ষ সমর্থন ছিল। এই কারণেই ৬ই মার্চে অর্থাৎ পাকিস্তানের গণহত্যা কার্যক্রম শুরু হওয়ার উনিশ দিন আগে হোয়াইট হাউসে 'সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ' (SRG)- এর বৈঠকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারী এলেক্সি জনসন যখন সকল কার্যকরণ বিশেষণ করে 'পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগ থেকে ইয়াহিয়াকে নিরুৎসাহিত করার' পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন, তখন কিসিঞ্জার ইয়াহিয়াকে সমর্থন করার

পক্ষে পেসিডেন্ট নিক্সনের অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেন। ফলে SRG এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, পাকিস্তানী জান্তার আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে 'প্রকাণ্ড নিষ্ক্রিয়তার' (massive inaction) নীতি অনুসরণই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সর্বোত্তম পন্থা। মার্কিন প্রশাসনের অন্তত পরোক্ষ অনুমোদন ছাড়া পাকিস্তানী জান্তার পক্ষে এত বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান শুরু করা আদৌ সম্ভব হত কি না, তা অত্যন্ত সন্দেহজনক। অন্যান্য কারণ ছাড়াও সম্ভবত এই 'নৈতিক' দায়িত্ব বোধের কারণে পাকিস্তানের অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে নিক্সন বা কিসিঞ্জারের পক্ষে পরবর্তী ন' মাসে কোনরূপ নিন্দা, প্রতিবাদ বা সমালোচনা একবারও উচ্চারিত হয়নি।

সামরিক জান্তার 'বাহাত্তর ঘণ্টার' পরিকল্পিত সার্জারী যখন মানব ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম গণহত্যা ও শরণার্থী স্রোত শুরু করে এবং আক্রান্ত, তাড়িত, পলায়নপর মানুষের মনে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, তখন থেকে মার্কিন প্রশাসনের তথাকথিত 'প্রকা নিষ্ক্রিয়তার' নীতি ধাপে ধাপে কিভাবে পাকিস্তানের সাহায্যার্থে সক্রিয় ও সহযোগিতাপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা ইতিপূর্বে আলোচিত। এই সহযোগিতার চরম প্রকাশ ঘটে ২২শে নভেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে। ২৩শে নভেম্বরে ইয়াহিয়া খান চীনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে 'দশ দিন বাদে' স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময়সূচী ঘোষণা করেছিলেন। ইয়াহিয়ার ঘোষণার দশম দিনে সূর্যাস্তের কিছু আগে পাকিস্তানী জঙ্গীবিমান প্রধানত ভারতীয় জম্মু ও কাশ্মীরের আশেপাশে একযোগে সাতটি বিমানক্ষেত্র আক্রমণ করে এবং রাত্রিতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে স্থল অভিযান শুরু করে। তার পরদিন পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনে সর্বাত্মক ভারতীয় প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়েই পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের শুরু হয়। ফলে, বাংলাদেশের মানুষ ২৫শে মার্চকেই পাকিস্তানের যুদ্ধারম্ভের দিন বলে গণ্য করলেও, বিশ্বের চোখে ৩রা ডিসেম্বরই পাক- ভারত যুদ্ধ আরম্ভের দিন। এর আগে মূলত পূর্ব বাংলার সীমান্তে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের বাহিনীর মধ্যে যেসব সশস্ত্র সংঘর্ষ চলে আসছিল, তা সীমান্ত সংঘর্ষ হিসাবেই পরিগণিত। কিন্তু কিসিঞ্জারের রায় অনুযায়ী ২১- ২২শে নভেম্বর বয়রা- চৌগাছা সীমান্তে উভয়পক্ষের ট্যাঙ্ক, বিমান ও গোলন্দাজ সংঘর্ষের দিনই যুদ্ধ শুরুর দিন।

তদনুযায়ী ২২শে নভেম্বর ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের' কার্যনির্বাহী উপসংস্থা 'ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ' (WSAG)- এর বৈঠকে কিসিঞ্জার 'যুদ্ধ আরম্ভের' জন্য ভারতকে দোষারোপ করেন এবং অবিলম্বে

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিসিঞ্জারের দুর্ভাগ্য যে, মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র দফতরই তার রায় এবং প্রস্তাবিত পদক্ষেপের সঙ্গে রাজী হতে পারেননি, বরং তারা আরও কিছু রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[২৩৮] কিন্তু পাকিস্তানী জান্তাকে তার হতদ্দশা থেকে উদ্ধার করার 'নৈতিক' দায়িত্ববোধ থেকেই হোক, এবং/অথবা তাদের দীর্ঘমেয়াদী আঞ্চলিক স্বার্থ যে কোন প্রকারে রক্ষা করার শক্তিদর্পী সিদ্ধান্ত থেকেই হোক, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সহকারী অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একের পর এক যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তার ফলে উপমহাদেশের সঙ্কট অচিরেই দুই বৃহৎ শক্তির বিশ্ব ভূরাজনৈতিক (global geopolitical) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতের অন্যতম প্রধান পাদপীঠে পরিণত হয়। ২২শে নভেম্বর নিক্সন ভারতকে সমরাস্ত্র সরবরাহ করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি সতর্কবাণী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।[২৩৯] সম্ভবত বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বহুধাবিভক্ত করতে না পারার ব্যর্থতাজনিত জ্বালা, মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য প্রদান থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করার অক্ষমতাজনিত ক্রোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির মুখে পাকিস্তানের ভরাডুবির আশঙ্কা - এই সমস্ত কিছুর ফলে পুঞ্জীভূত মার্কিনী উত্তাপ অংশত নির্গত হয় সোভিয়েট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। ফলে সূচনায় যা ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট, তা পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বলদর্পী বুদ্ধিভ্রংশতায় উপমহাদেশীয় সঙ্কটে পরিণত হয় এবং মার্কিন প্রশাসনের ন্যায়নীতি বিবর্জিত পৃষ্ঠপোষকতা ও ভ্রান্ত পরামর্শের ফলে এই সঙ্কটের জটিলতা ও পরিসর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মার্কিন প্রশাসনের চিরাচরিত বিশ্ব পাহারাদারীর মনোবৃত্তির প্রভাবে পাকিস্তানের আট মাস আগের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট বিশ্ব সংঘাতের রূপ ধারণ করে।

২৩শে নভেম্বর WSAG-এর বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের 'অসহযোগী' ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকে। কাজেই কিসিঞ্জার তাঁর বিশ্ব ভূরাজনৈতিক উদ্যোগ কার্যকর করার প্রথম ধাপ হিসাবে বেছে নেন জাতিসংঘে সদ্য নিযুক্ত চীনা প্রতিনিধি হুয়াং হুয়াকে এবং গোপনে নিউইয়র্কে যান হুয়াং হুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। কিসিঞ্জারের নিজেরই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী তার এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল, পিকিংকে 'মার্কিনী উদ্যোগের খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে অবহিত রাখা', 'সম্প্রসারণবাদ রোধকল্পে' মার্কিনী সরকারের 'সংকল্পের দৃঢ়তা' ব্যাখ্যা করা এবং এক্ষেত্রে বিরাজমান 'বাস্তব সম্ভাবনা' সদ্ব্যবহারের অসুবিধাগুলি চিহ্নিত করা। তিনি হুয়াং হুয়াকে উপমহাদেশের বিরাজমান সামরিক

পরিস্থিতির বর্ণনা দেন এবং মার্কিন সরকার পাকিস্তানের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান তার খসড়া দেখান। দুর্ভাগ্য পুনরায় কিসিঞ্জারের; হুয়াং হুয়া তাকে জানান চীন নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানকে সমর্থন করবে বটে, তবে বিষয়টি কবে নিরাপত্তা পরিষদে নিয়ে যাওয়া হবে সে ব্যাপারে চীন বরং পাকিস্তানের পরামর্শ অনুসরণ করবে।[২৪০] কিন্তু পাকিস্তান গণহত্যা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য সমালোচিত ও নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কায় তখন অবধি নিরাপত্তা পরিষদ অধিবেশনের পক্ষপাতী ছিল না।

কাজেই ২৪শে নভেম্বর কিসিঞ্জার পুনরায় WSAG- এর দ্বারস্থ হন ভারতকে আক্রমণকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য। ইন্দিরা গান্ধী ঐ দিনই ভারতীয় পার্লামেন্টে ব্যাখ্যা করেন, কোন্ পরিস্থিতিতে ভারতীয় বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে চৌগাছার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। WSAG বৈঠকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি কিসিঞ্জারের অভিযোগকে অমীমাংসিত বলে গণ্য করেন এবং রাজনৈতিক আপোসের জন্য পাকিস্তানকে চাপ দেওয়ার পক্ষে পুনরায় অভিমত প্রকাশ করেন।[২৪১]

নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের পক্ষে কিসিঞ্জার যখন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরকে সম্মত করানোর চেষ্টায় লিপ্ত, প্রায় সে সময়েই- অর্থাৎ ৩রা ডিসেম্বরের সপ্তাহাধিক কাল আগে- ভারত সরকার গোপনসূত্রে অবগত হন যে, ভিয়েতনাম ও ফিলিপিন উপকূলে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় সপ্তম নৌবহরের গতিবিধির এখতিয়ার বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। হঠাৎ বঙ্গোপসাগর অবধি মার্কিন নৌবাহিনীর তৎপরতার এখতিয়ার সম্প্রসারিত হওয়ায় ভারত সরকারের সন্দেহের উদ্রেক ঘটে। কিন্তু এ সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রশ্ন উত্থাপনের পরেও তাদের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা লাভে ভারত সরকার অসমর্থ হন।[২৪২] মার্কিন সপ্তম নৌবহরের এখতিয়ার বঙ্গোপসাগর অবধি সম্প্রসারিত করার পূর্বেই এর সম্ভাব্য তৎপরতার পরিকল্পনা যথারীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত।[২৪৩] বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে যাত্রার জন্য ‘সতর্ক অবস্থা’ জারী করা সত্ত্বেও সপ্তম নৌবহরকে পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পথে রাজনৈতিক বাধা নিক্সন প্রশাসনের জন্য তখনও প্রবল। এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার ক্রমবর্ধিত সংঘর্ষকে ‘নগ্ন ভারতীয় আক্রমণ’ হিসাবে প্রতিপন্ন করা এবং তজ্জন্য নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ ও চীনের

সম্মিলিত নিন্দাজ্ঞাপন অত্যাবশ্যক ছিল। একমাত্র এই উপায়েই মার্কিন ও বিশ্ব- জনমতকে পরিবর্তিত করা মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব ছিল এবং তার আগে সামরিক হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক দিক থেকে দুরূহ হত। নিরাপত্তা পরিষেদের অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে স্টেট ডিপার্টমেন্টের আপত্তি মার্কিন জনমতের তীব্রতাকেই প্রতিফলিত করে মাত্র। অবশ্য এই বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া নিক্সনের জন্য দুর্লংঘ্য অসুবিধার ছিল না। অসুবিধা ছিল অন্যত্র। ২৩শে নভেম্বর কিসিঞ্জার অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে সম্মত হওয়ার জন্য চীনকে যথাসাধ্য উৎসাহিত করার পরেও হুয়াং হুয়া অনুত্তেজিত থাকায় মার্কিন প্রশাসনের অবশিষ্ট ভরসার স্থল ছিল ব্রিটেন। কেননা ইন্দিরা গান্ধীর ফ্রান্স সফরকালে ফরাসী সরকারের সহানুভূতি ভারতের পক্ষে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদে ফ্রান্সের সহযোগিতার উপর মার্কিন ভরসা ছিল নিতান্ত কম। সোভিয়েট সহযোগিতার কোন প্রশ্নই ছিল না। কাজেই নিরাপত্তা পরিষদের অবশিষ্ট ও পঞ্চম স্থায়ী সদস্য ব্রিটেনকে পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে সম্মত করানো এতই জরুরী ছিল যে স্বয়ং নিক্সন ২৬শে নভেম্বরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী হীথ নিক্সন বর্ণিত পরিস্থিতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও, প্রস্তাবিত উদ্যোগ থেকে ব্রিটেনের আলাদা থাকার পক্ষে ইঙ্গিত দেন।[২৪৪] স্পষ্টতই পাকিস্তানের পাপের ভার তখন এতই পূর্ণ যে পাশ্চাত্য ত্রিশক্তিও এই প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত। আমেরিকার শেষ ভরসার স্থল তখন পুনরায় চীন। ২৯শে নভেম্বর কিসিঞ্জার তাই পুনরায় চীনা নেতৃত্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেন; এবারে অবশ্য হুয়াং হুয়ার মাধ্যমে নয়, প্যারিসের অন্য আর এক মাধ্যমের সহায়তায়। এবারের অনুরোধের বিষয়বস্তু ও ফলাফল কিসিঞ্জার গোপন রাখেন।[২৪৫]

এমনিভাবে বয়রা চৌরাস্তা সীমান্ত সংঘর্ষের দিন থেকে সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালেও এই সব ঘটনাকে ভারতীয় আক্রমণের নিদর্শন হিসাবে খাড়া করে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের আয়োজন করা এবং সেখানে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ও চীনের সম্মিলিত ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য কিসিঞ্জারের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। ফলে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে সপ্তম নৌবহরের যাত্রাও বিলম্বিত হতে থাকে। এদিকে ইয়াহিয়া ঘোষিত সময়সূচীর ‘দশ দিন’ নিঃশেষিত হতে থাকে। পূর্বাঞ্চলে ভারত-বাংলাদেশ মিলিত বাহিনীর সীমান্ত চাপ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে

থাকে, দেশের ভিতরে নিয়াজীর তথাকথিত ‘মজবুত ঘাঁটি’ মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা ক্রমশই পরিবৃত হয়ে পড়তে থাকে, দীর্ঘ আট মাসের একটানা অভিযানে বিশেষত মুক্তিবাহিনীর আঘাতে আঘাতে পরিশ্রান্ত পাকিস্তানী সেনাদের মনোবল দ্রুত ভাঙ্গনের দিকে এগুতে থাকে এবং শীত এগিয়ে আসার ফলে উত্তরের গিরিপথগুলি বন্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়তে থাকে। অথচ তখনও সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে পাকিস্তানের দুই মিত্রই অনড়, অচল। সপ্তম নৌবহরের নোঙ্গর তোলার কোন লক্ষণ নেই। এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির মাঝে পাকিস্তান সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে ধীরে ধীরে নিশ্চিত পরাজয় বরণের পরিবর্তে তার নিজের মিত্রদ্বয়কে সক্রিয় করে তোলার জন্য ৩রা ডিসেম্বরে ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্তী বিমানবন্দরসমূহে (একমাত্র আগ্রাই অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী শহর ছিল) বিমান আক্রমণ চালায় এবং সেই রাত্রিতেই পূর্ব পাঞ্জাব এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে স্থল অভিযান শুরু করে।

এই আক্রমণ শুরু করার আগের দিন পাকিস্তান পূর্বোল্লেখিত পাক- মার্কিন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির প্রথম ধারা অনুযায়ী ‘আক্রান্ত দেশ’ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ দাবী করে।[২৪৬] প্রায় এক মাস আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বেঞ্জামিন ওয়েলার্ট ১৯৫৯ সালের দ্বিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশেষ দায়িত্বের কথা সর্বপ্রথম উদঘাটিত করার পর, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষে এই বিশেষ উদঘাটনের কারণ সম্ভবত ভালোভাবেই জানা ছিল; কাজেই তখন থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট একাধিক প্রকাশ্য বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের এহেন দায়িত্বের কথা অস্বীকার করে।[২৪৭] মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের অস্বীকৃতি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও কার ভরসায় পাকিস্তান ২রা ডিসেম্বরে এই চুক্তির প্রয়োগ দাবী করে পরদিনই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্প্রসারণে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৩রা ডিসেম্বর WSAG- এর বৈঠকে কিসিঞ্জারের বক্তব্য থেকে। পাকিস্তান পশ্চিম ভারতে বিমান আক্রমণ শুরু করার মাত্র ছ’ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ এই আক্রমণ সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর বেতার বক্তৃতারও আগে, এই বিষয় আলোচনার জন্য হোয়াইট হাউসে WSAG- এর বৈঠক শুরু হয়। এই বৈঠকে যথাশীঘ্র নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত ছাড়াও ১৯৫৯ সালের পাক- মার্কিন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে পাকিস্তানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব অন্বেষণের ব্যাপারে যোগদানকারী সদস্যদের মধ্যে একমাত্র কিসিঞ্জারই ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।[২৪৮] তখন থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহ পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসনের প্রচেষ্টা ছিল: (১) নিরাপত্তা পরিষদে

সোভিয়েট ভেটোর আশঙ্কা সত্ত্বেও উপমহাদেশে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে বিশ্ব- জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য জাতিসংঘকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা; এবং (২) ১৯৫৯ সালের দ্বিপক্ষীয় চুক্তির নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যার অধীনে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশের উপকূলভাগের উদ্দেশে সপ্তম নৌবহরের যাত্রা শুরু করা। একমাত্র প্রথম লক্ষ্য অর্জনের পরেই দ্বিতীয় ও মূল পদক্ষেপ গ্রহণ করা মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সম্ভব ছিল। এর পরেও সপ্তম নৌবহরের কার্যকর প্রয়োগ নির্ভরশীল ছিল দু'টি সামরিক শর্তের উপর, যার মধ্যে প্রথমটি ছিল অপরিহার্য: (১) পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অন্তত ঢাকা ও উপকূলভাগে নিজ শক্তিতে পাকিস্তানী বাহিনীর কমপক্ষে তিন সপ্তাহকাল লড়াই করার ক্ষমতা; এবং (২) উত্তর সীমান্তে সীমিত আকারে হলেও চীনের যুগপৎ তৎপরতা।

মরিয়া হয়েই হোক এবং/অথবা মার্কিন হস্তক্ষেপ ত্বরান্বিত করার চিন্তাভাবনা থেকেই হোক, পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে পাকিস্তানও তার নিজস্ব সামরিক সামর্থ্য সম্পর্কে, তথা তার একক শক্তিতে অন্তত কিছু সময়ের প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করে রাখার মত ক্ষমতা সম্পর্কে, নিশ্চয়ই কিছু হিসেব-নিকেশ করে দেখেছিল। পাকিস্তানের সৈন্য সমাবেশের ধরন দৃষ্টে মনে হয়, পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় জম্মু ও কাশ্মীরের একাংশ দখল করে নেওয়াই তাদের রণপরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল; পূর্বাঞ্চলে কোন ভূখণ্ড যদি হারাতে হয় তবে তা পুনরুদ্ধারের কাজে লাগানো সম্ভব মনে করেই। দ্বিতীয়ত, পূর্বাঞ্চলে সীমান্তের বিভিন্ন অংশে ভারতের সাত ডিভিশন সৈন্য সমবেত হওয়ার খবর থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের সম্ভবত এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে নদীনালা পরিকীর্ণ ভূভাগ অতিক্রম করে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার মত পরিবহন ও ইঞ্জিনিয়ারিং উপকরণে ভারতের সীমাবদ্ধতাহেতু এবং তার বিরুদ্ধে সীমান্তের এপারের সুরক্ষিত 'দুর্গ' ও বাঙ্কার থেকে 'ভারতীয় সৈন্যের তুলনায় বহুগুণ শৌর্যের অধিকারী পাকিস্তানী জওয়ানদের' মূলত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সুবিধাহেতু ভারতীয় বাহিনীর অগ্রাভিযান বেশী গভীরে এগুনো সম্ভব নয়, বড় জোর কিছু এলাকা তারা দখল করে নিতে পারে। কিন্তু ৪ঠা ডিসেম্বরে পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর মিলিত প্রত্যাঘাত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত এলাকার সর্বত্র একযোগে মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত সাধারণ মানুষ পাকিস্তানী অবস্থানের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। এর ফলে মুক্তি অভিযান যে অসামান্য গতিবেগ অর্জন করে, তা পাকিস্তানের আশঙ্কা ও ভারতের

প্রত্যাশা উভয়কেই ছাড়িয়ে যায়। প্রচলিত যুদ্ধরীতিতে অভ্যস্ত পাকিস্তান যে সমস্ত যুক্তি থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' স্বল্প কিছু ভূখণ্ডের বেশী হারাবার কথা কল্পনা করতে পারেনি, সেই একই প্রচলিত যুদ্ধরীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সমর পরিকল্পনাবিদগণের পক্ষেও ঢাকাকে মুক্ত করা নিশ্চিত সামরিক লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করে ওঠা সম্ভব হয়নি। বৈপ্লবিক রাজনৈতিক উপাদান ও জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের ফলে মুক্তিযুদ্ধ যে অকল্পনীয় গতিময়তা ও শক্তি অর্জন করতে পারে, তা সম্ভবত পাকিস্তান বা ভারত কোন দেশেরই স্টাফ কলেজের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না।

অধ্যায়- ২১: ডিসেম্বর

৩রা ডিসেম্বর বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতার এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতাদানকালে ভারতের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানের বিমান- আক্রমণ শুরু হয়। অবিলম্বে তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠকের পর মধ্যরাত্রির কিছু পরে বেতার বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন, এতদিন ধরে "বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলে আসছিল তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।" ২৩শে নভেম্বর দশ দিনের মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ইয়াহিয়ার যে বাসনা ব্যক্ত হয়েছিল এবং ঐ একই দিনে তাজউদ্দিন তার বেতার বক্তৃতায় ঘটনা- বিকাশের যদ্রূপ সম্ভাবনা উল্লেখ করেছিলেন, অবশেষে সেইভাবেই মুক্তিযুদ্ধের শেষ অংকের শুরু হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এক জরুরী লিপিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানান, পাকিস্তানের সর্বশেষ আক্রমণের সমুচিত জবাব প্রদানে ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর মিলিত ভূমিকা সফলতর হতে পারে, যদি এই দুটি দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪৯] ভারত ও বাংলাদেশ স্থলবাহিনীর মিলিত প্রত্যাঘাত, ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণ ও নৌবাহিনীর অবরোধের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধের চরিত্র ৪ঠা ডিসেম্বর থেকেই আমূল পরিবর্তিত হয়।

পূর্ববর্তী সাত সপ্তাহ ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতা এবং ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত বাহিনীর তীব্রতর সীমান্ত চাপের ফলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই পাকিস্তানী বাহিনী বিরামহীন তৎপরতার দরুন পরিশ্রান্ত, বৈরী পরিবেশ ও অতর্কিত গোপন আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত, দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত হওয়ার ফলে দুর্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে

খণ্ড- বিখণ্ডিত এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক লক্ষ্য ও সামরিক সাফল্যের অভাবে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। সাত সপ্তাহ ধরে সংঘর্ষের পরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এর পরিণতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে পাকিস্তানী নেতৃত্বের উপলব্ধি ছিল ভ্রান্ত, তাদের প্রতিরক্ষার কৌশল ছিল অবাস্তব, বিমান ও নৌশক্তির সামর্থ্য ছিল নগণ্য এবং নেতৃত্বের পেশাগত মান নিম্ন। দখলদার সৈন্যদের যুদ্ধ- পরিশ্রান্ত ও হতোদ্যম করে তোলার পর মুক্তিবাহিনীর আট মাস দীর্ঘ সংগ্রামকে চূড়ান্তভাবে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় স্থলবাহিনীর সম্মুখ অভিযান শুরু হয় চারটি অঞ্চল থেকে: (১) পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিন ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৪র্থ কোর সিলেট- ব্রাহ্মণবাড়িয়া- কুমিল্লা- নোয়াখালী অভিমুখে; (২) উত্তরাঞ্চল থেকে দু' ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৩৩তম কোর রংপুর- দিনাজপুর- বগুড়া অভিমুখে; (৩) পশ্চিমাঞ্চল থেকে দু' ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ২য় কোর যশোর- খুলনা- কুষ্টিয়া- ফরিদপুর অভিমুখে; এবং (৪) মেঘালয় রাজ্যের তুরা থেকে ডিভিশন অপেক্ষা কম আর একটি বাহিনী জামালপুর- ময়মনসিংহ অভিমুখে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভারতের বিমান ও নৌশক্তি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচ্ছন্ন কিন্তু সদা- তৎপর সহযোগিতা এবং স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা। এই সমুদয় শক্তির সংমিশ্রণ ও সহযোগিতায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী আধিপত্য স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলোপ করার যথেষ্ট ছিল। বস্তুত যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভারত- বাংলাদেশ মিলিত বাহিনীর বিজয় সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কোন মহলেই ছিল না।

পাকিস্তানের উচ্চতর নেতৃত্বের মধ্যেও এ বিষয়ে সংশয় থাকার কোন যুক্তি ছিল না; তৎসত্ত্বেও ৩রা ডিসেম্বর তারাই সংঘর্ষ সম্প্রসারণে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। যেভাবেই হোক ইয়াহিয়াচক্রের মাঝে এ বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয় রোধকল্পে তার সামরিক শক্তির সম্ভার নিয়ে যুদ্ধবিরতি এবং পূর্বতন স্থিতাবস্থা কায়েম করার জন্য তৎপর হয়ে উঠবে। কার্যক্ষেত্রেও ঘটেছিল তাই। ফলে মার্কিন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য পাল্টা আন্তর্জাতিক শক্তির সমাবেশ অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। এইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ অংকে ভারত- বাংলাদেশ মিলিত শক্তির প্রত্যাশিত বিজয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে মার্কিন প্রশাসন সৃষ্ট বিশ্ব ভূরাজনৈতিক সংঘাতের ফলে। ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশের রণাঙ্গনে কোন বড় অগ্রগতি ঘটার আগেই ওয়াশিংটনে WSAG- এর বৈঠকে কিসিঞ্জার নিরাপত্তা পরিষদের আহূত অধিবেশনে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য

প্রত্যাহারের দাবী সম্বলিত মার্কিন প্রস্তাব পেশ করার জন্য এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য মিত্ররাষ্ট্রসমূহের সঙ্গেও আলোচনার কোন সময় তাদের ছিল না। এই ব্যস্ততা ছিল কিসিঞ্জারের নিজের ভাষায়, তাদের 'বৃহত্তর রণনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট'।[২৫০] WSAG- এর বৈঠকে মার্কিন 'জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ' (JCS)- এর পক্ষে এ্যাডমিরাল জুমওয়াল্ট পাকিস্তানের সামরিক সরবরাহ পরিস্থিতি এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যেই সঙ্গীন হয়ে ওঠার আশঙ্কা প্রকাশ করায় কিসিঞ্জারের ব্যস্ততার কারণ স্পষ্টতর হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর 'উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত' এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে উপমহাদেশের সংঘাতের জন্য মুখ্যত ভারতকে দায়ী করেন।[২৫১] নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য স্ব স্ব সীমান্তের ভিতরে ফিরিয়ে নেওয়া এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ মহাসচিবকে ক্ষমতা প্রদান করার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[২৫২] কিন্তু এই প্রস্তাবে 'সমস্যার মূল কারণ' তথা পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের উপর দীর্ঘ নির্যাতন এবং তার ফলে সৃষ্ট শরণার্থীর ভিড় ও সমস্যা জর্জরিত ভারতের অবস্থা বিবেচনা না করে ভারত ও পাকিস্তানকে একই মানদণ্ডে বিচার করায় সোভিয়েট প্রতিনিধি এই প্রস্তাবকে 'একতরফা' বলে অভিহিত করে ভেটো প্রয়োগ করেন। পোল্যান্ডও প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। ফ্রান্স ও ব্রিটেন ভোট দানে বিরত থাকে।

পরদিন ৫ই ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদের পুনরায় যে অধিবেশন বসে তাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তানে এমন এক 'রাজনৈতিক নিষ্পত্তি' প্রয়োজন যার ফলে বর্তমান সংঘর্ষের অবসান নিশ্চিতভাবেই ঘটবে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, পাক- বাহিনীর যে সহিংসতার দরুন পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে তাও অবলিম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।[২৫৩] একমাত্র পোল্যান্ড প্রস্তাবটি সমর্থন করে। চীন বাদে পরিষদের অন্য সকল সদস্য ভোটদানে বিরত থাকে। চীন ভোট দেয় বিপক্ষে। চল্লিশ দিন আগে জাতিসংঘের সদস্যপদ এবং নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যের আসন লাভের পর একটিই ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম ভেটো। ঐ দিন আরও আটটি দেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবের মর্ম পূর্ববর্তী মার্কিন প্রস্তাবের অনুরূপ হওয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন তার দ্বিতীয় ভেটো প্রয়োগ করে।

একই সময়ে ‘তাস’ মারফত এক বিবৃতিতে সোভিয়েট সরকার উপমহাদেশের যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানকে সর্বাংশে দায়ী করেন, ‘পূর্ব বাংলার জনগণের আইনসঙ্গত অধিকার ও স্বার্থের স্বীকৃতির ভিত্তিতে’ সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানান, এই সংঘর্ষ সোভিয়েট সীমান্তের সন্নিকটে সংঘটিত হওয়ায় ‘এর সঙ্গে সোভিয়েট নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, বলে উল্লেখ করেন এবং পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের যে কোনটির সঙ্গে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান।[২৫৪] উপমহাদেশের সংঘর্ষে পাকিস্তানের সহায়তায় তার মিত্রদ্বয় কি ব্যবস্থা নিতে পারে, স্পষ্টতই তার সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে এই সোভিয়েট বিবৃতি প্রচারিত হয়েছিল।

৬ই ডিসেম্বরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জ্ঞাপিত হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কূটনৈতিক স্বীকৃতি। একই দিনে পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের বিমান তৎপরতার ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার ফলে স্থলভূমিতে পাকিস্তানী বাহিনীর অপরিসীম চাপের সম্মুখীন হয়। ৬ই ডিসেম্বর থেকেই পাকিস্তানের সৈন্যরা ঢাকা ও সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের দিকে পশ্চাদপসরণ শুরু করে। ঐ দিন WSAG- এর বৈঠকে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (CIA) প্রধান রিচার্ড হেলম্‌সের সমীক্ষায় বলা হয়, দশ দিনের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী পূর্বাঞ্চলে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে। মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষমণ্ডলী (JCS)- এর পক্ষে উপস্থিত জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড বরং পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের প্রতিরোধের মেয়াদ তিন সপ্তাহ অবধি স্থায়ী হতে পারে বলে অভিমত দেন। এর পরই শুরু হয় সামরিক হস্তক্ষেপের অনুক্ত পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে কিসিঞ্জারের সুচিন্তিত প্রশ্নমালা: পূর্ব পাকিস্তানের বিহারীদের হত্যা করা শুরু হয়েছে কি না, এই আসন্ন রক্তপাত বন্ধের উপায় কি, যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদ থেকে সাধারণ পরিষদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সে দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে কি না, ভারতের নৌঅবরোধ বেআইনী কি না এবং তার আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদের খসড়া শীঘ্র তৈরী করা যাবে কি না, জর্ডান ও সৌদী আরব থেকে পাকিস্তানে সমরাস্ত্র পাঠানোর পথে যুক্তরাষ্ট্রের আইনে কোন বাধা আছে কি না, যদি থাকেও প্রেসিডেন্ট নিক্সন যেহেতু পাকিস্তানের পরাজয় রোধ করতে চান, সেহেতু এই বাধাগুলি অপসারণের উপায় কি, ইত্যাদি।[২৫৫] সংক্ষেপে, সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে সম্ভাব্য যুক্তি ও উপায় অন্বেষণই ছিল ৬ই ডিসেম্বরের WSAG বৈঠকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক।

পাশাপাশি শুরু হয় বাংলাদেশে পাকিস্তানের আসন্ন পরাজয় রোধ করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তীব্র কূটনৈতিক চাপ। প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েট নেতা ব্রেজনেভের কাছে প্রেরিত এক জরুরী বার্তায় জানান, সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতকে সামরিকভাবে নিষ্ক্রিয় না করে তবে পরবর্তী মে মাসে প্রস্তাবিত রুশ- মার্কিন শীর্ষ বৈঠক অ্নুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।[২৫৬] এ ছাড়া সরাসরি ভারতের উপর জাতিসংঘের চাপ প্রয়োগ করার জন্য মার্কিন প্রশাসন 'Uniting for Peace' ধারার অধীনে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদ থেকে সাধারণ পরিষদে নিয়ে যাবার জন্য তৎপর হন।[২৫৭]

৭ই ডিসেম্বরে নিয়াজীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ‘দুর্গ’ যশোরের পতন ঘটে। ভারতের ৯ম ডিভিশন ঐ দিন এক রক্তাক্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে যশোর সেনাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে পায়, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ ভর্তি সুরক্ষিত বাঙ্কার সম্পূর্ণ জনশূন্য। পাকিস্তানের ‘বীর মুজাহিদ’ চার ব্যাটালিয়ান সৈন্যের এইরূপ অকস্মাৎ অন্তর্ধানে দেশের পশ্চিমাঞ্চল কার্যত মুক্ত হয়। যশোর থেকে ঢাকা অথবা খুলনার দিকে বিক্ষিপ্ত পলায়নপর পাকিস্তানী সৈন্যরাই অন্যান্য স্থানে স্বপক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে; দু- তিনটি স্থান বাদে সর্বত্রই পাকিস্তানীদের প্রতিরক্ষার আয়োজনে ধস নামে। ৭ই ডিসেম্বরে ভারতীয় বাহিনী সিলেটে হেলিকপ্টার যোগে অবতরণ করার পর মুক্তি বাহিনীর সহায়তায় সিলেট শহর মুক্ত করে। ঝিনাইদহ ও মৌলভীবাজারও মুক্ত হয় একই দিনে। ভারতীয় বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানী জওয়ান ও অফিসারদের উদ্দেশে শুরু হয় ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ’র মনস্তাত্ত্বিক অভিযান: বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার আগে বরং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণই পাকিস্তানীদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

যশোরের পতন পাকিস্তানের সামরিক প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্রকে নাড়া দেয় প্রবলভাবে। সাত তারিখেই গভর্নর আবদুল মালেক পূর্বাঞ্চলের সৈন্যাধ্যক্ষ লে. জে. নিয়াজীর অভিমত উদ্ধৃত করে এক দুর্গত বার্তায় ইয়াহিয়াকে জানান, যশোরের বিপর্যয়ের ফলে প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের পতন প্রায় সম্পন্ন এবং মেঘনার পূর্বদিকের পতনও কেবল সময়ের প্রশ্ন; এই অবস্থায় ‘আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সামরিক সহায়তা না পৌঁছায়’ তবে জীবন রক্ষার জন্য বরং ক্ষমতা হস্তান্তরের

ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা বাঞ্ছনীয়।[২৫৮] গভর্নর মালেকের এই দুর্গত বার্তা ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষের জন্য আরও বেশী দুর্ভাগ্যজনক ছিল এ কারণে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের দিকে তাদের আকাঙ্ক্ষিত অগ্রাভিযান তখনও কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, একমাত্র ছম্ব এলাকায় কিছু অগ্রগতি ছাড়া। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন বড় বা মাঝারি ভূখণ্ড দখল করার আগেই পূর্ব বাংলায় তাদের সামরিক নেতৃত্ব যদি আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে তবে সমূহ বিপর্যয়। কাজেই মালেকের দুর্গত বার্তা ঐ সন্ধ্যাতেই 'হোয়াইট হাউসে' পৌঁছানো হয় সম্ভবত অবিলম্বে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য মালেকের আবেদনকে আকুলতর করেই।[২৫৯] পাকিস্তান যাতে পূর্বাঞ্চলে পরাজিত না হয় তদমর্মে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেন্টাগণের সুপারিশ কিসিঞ্জারের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল ঐ দিনই। ফজল মুকীম খানের বর্ণনা অনুসারে এরও দু'দিন আগে অর্থাৎ ৫ই ডিসেম্বর থেকে নিয়াজীর মনোবল ঠিক রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি আবদুল হামিদ আসন্ন চীনা হস্তক্ষেপের সংবাদ নিয়াজীকে দিয়ে চলেছিল।[২৬০] উত্তরের গিরিপথের প্রায় সব ক'টিই তখনও বরফমুক্ত। কিন্তু সিংকিয়াং সীমান্তে সোভিয়েট স্থল ও বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির তাৎপর্য চীনের জন্য উপক্ষেণীয় ছিল না।

নিক্সন প্রশাসনের জন্যেও সমস্যা তখন কম নয়। বস্তুত পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা মার্কিন জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করানো তখন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কি মানবিকতার যুক্তিতে, কি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের বিবেচনা থেকে, মার্কিন প্রশাসনের পাকিস্তান নীতি নিয়ে মার্কিন গণপ্রতিনিধি ও সংবাদমাধ্যমগুলির সমালোচনা তখন তুঙ্গে। মার্কিন সিনেটে এবং হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে ডেমোক্র্যাট দলীয় কোন কোন সদস্য পাকিস্তানী জান্তার গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী নীতির প্রতি মার্কিন প্রশাসনের সমর্থন এবং জাতিসংঘের বিলম্বিত ও একদেশদর্শী ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।[২৬১] মানবতাবাদী কারণ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরেট জাতীয় স্বার্থের হিসাব-নিকাশ থেকে উপমহাদেশের সংঘর্ষের জন্য ভারতকে এককভাবে দোষী করা, ভারতের উন্নয়ন বরাদ্দ বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়ে মার্কিন সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলি নানা প্রশ্ন তোলে। জনমতের এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা দৃষ্টে ৭ই ডিসেম্বর কিসিঞ্জার নিজেই এক অজ্ঞাতনামা 'সরকারী

মুখপাত্র’ হিসাবে আস্থাভাজন কিছু সাংবাদিকদের কাছে পরিবেশিত এক সমীক্ষার দ্বারা মার্কিন জনমত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।[২৬২]

কিসিঞ্জারের এই বেনামী সমীক্ষা মার্কিন জনমতকে পরদিন কতটুকু বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হত তা অজ্ঞাত থাকলেও, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ উপমহাদেশের যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষে সে দিন যে রায় দেন, তা- ই মার্কিন সরকারের পরবর্তী কার্যক্রমের প্রধান মূলধনে পরিণত হয়। সাধারণ পরিষদ ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিতে- উপমহাদেশে তখন ৮ই ডিসেম্বর- অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, উভয় পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহার এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান সম্বলিত এক প্রস্তাব ১০৪- ১১ ভোটে গ্রহণ করে। প্রত্যেক বক্তার জন্য সর্বাধিক দশ মিনিট বরাদ্দ করে উপমহাদেশের এই অত্যন্ত জটিল বিষয়কে অসম্ভব তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ পরিষদে আলোচনা করার ফলে অধিকাংশ সদস্য দেশের জন্যই বাহ্যত যুক্তিসঙ্গত এই প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জন্যই অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক অসন্তোষ এবং বিবদমান প্রতিবেশীর উপস্থিতি এক সাধারণ সমস্যা। ফলে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন, সমাজতন্ত্রী কয়েকটি দেশ, ভারত এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশ ভুটান বাংলাদেশের অভ্যুদয় রোধ করার জন্য এই আন্তর্জাতিক কূটবুদ্ধির বিজয়ের মুখেও অটল থাকে। উপমহাদেশের সংঘাতের জটিলতা সম্পর্কে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত গভীর ছিল বলে মার্কিন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই দুই দেশ এবং আরো আটটি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে।

৮ই ডিসেম্বরের রণক্ষেত্রের অবস্থা পাকিস্তানের জন্য আরও শোচনীয়। পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের মূল ভরসার স্থল ছম্বে উপর্যুপরি চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানের অগ্রগতি প্রায় থেমে যায়। অন্যত্রও অবস্থা বেশ খারাপ। রাজস্থান- সিন্ধু সীমান্তে বরং ভারতের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়, করাচীর উপর ভারতীয় নৌ ও বিমান আক্রমণ অব্যাহত থাকে। পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন - যশোরের মত ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকেও পাক সৈন্যরা পালিয়ে আসে। কুমিল্লার এক অংশের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং অন্য অংশের পাশ কাটিয়ে ভারত- বাংলাদেশ মিলিত বাহিনী এগুতে থাকে। কিন্তু পাক বাহিনী এই পশ্চাদপসরণের পর ঢাকার চারপাশে নিজেদের অবস্থানকে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম হবে কিনা, তা তখনও অজ্ঞাত। সংক্ষেপে, পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের কোন অগ্রগতি

নেই; আর পূর্বে কেবল পশ্চাৎগতি। পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের সম্যক বিপর্যয় দৃষ্টে রাওয়ালপিন্ডির সামরিক কর্তারা নিয়াজীর মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য 'চীনের তৎপরতা শুরু হয়েছে' বলে তাকে জানায়।[২৬৩] এহেন শোচনীয় সামরিক পরিস্থিতির মাঝে ইয়াহিয়া খান বেসামরিক প্রতিনিধিদের হাতে তার শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের দীর্ঘ দিনের 'ওয়াদা' বাস্তবায়িত করতে শুরু করেন এবং 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে নুরুল আমিন ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। অন্যত্র ভারতে একই দিন অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় সর্বশেষ সামরিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকে ভারতের সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করেন, পাকিস্তান যদি পূর্ব বাংলায় তাদের পরাজয় স্বীকার করে নেয়, তবে অন্যান্য সকল অঞ্চলেই ভারত যুদ্ধ বন্ধ করবে; বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেই কোন ভূখণ্ড দখল করার অভিপ্রায় ভারতের নেই।[২৬৪]

এই ঘোষণা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা বাদে ওয়াশিংটন সময় সকাল এগারটায় যখন WSAG- এর বৈঠক শুরু হয়, তখন JCS- এর জেনারেল রায়ান উপমহাদেশের সর্বশেষ সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে, পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর জোর এগুবার কোন লক্ষণ নেই, বরং পাকিস্তানের অগ্রাভিযান ঠেকিয়ে রেখেই তারা সন্তুষ্ট রয়েছে বলে মনে হয়।[২৬৫] কিন্তু WSAG- এর সভাপতি হেনরী কিসিঞ্জার রায়ানের কাছে জানতে চান পূর্ব রণাঙ্গন থেকে ভারতীয় সৈন্যদের পশ্চিম রণাঙ্গনে নিয়ে যেতে কত সময় লাগতে পারে। জেনারেল রায়ান জানান, বেশ কিছু দিন; তবে বিমানবাহিত ব্রিগেড তাড়াতাড়িই নিয়ে যাওয়া সম্ভব, পাঁচ বা ছ'দিনের মধ্যেই।[২৬৬] তৎসত্ত্বেও এক সম্পূর্ণ নতুন আশঙ্কার অবতারণা করে কিসিঞ্জার বলেন, 'মূল প্রশ্ন হল ভারত যদি আজাদ কাশ্মীর দখলের চেষ্টা চালায় এবং পাকিস্তানের বিমান ও সাঁজোয়া বাহিনীর ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তবে তা হবে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ভারতের ইচ্ছাকৃত উদ্যোগ'। কিসিঞ্জার অতঃপর আবেগময় ভাষায় সমবেতদের জিজ্ঞাসা করেন, 'এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের এক মিত্রকে সম্পূর্ণ পরাভূত হতে দিতে' এবং পাকিস্তানকে 'প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত রাখার জন্য ভারত যদি ভয় দেখায় তা কি আমরা মেনে নিতে পারি'? স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি সিস্কো বলেই বসেন, ভারতের এমনতর অভিপ্রায় রয়েছে কি না তা সন্দেহজনক।[২৬৭] তথাপি কিসিঞ্জার পাকিস্তানের জন্য 'সামরিক সরবরাহ' নিশ্চিত করার পক্ষে দৃঢ়

অভিমত প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ করে বলেন যে, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সব কিছুই আমরা করেছি, কিন্তু সবই দু'সপ্তাহ বিলম্বে'।[২৬৮]

কিসিঞ্জার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আজাদ কাশ্মীর দখল এবং পাকিস্তানের বিমান ও সাঁজোয়া বাহিনী ধ্বংসের ব্যাপারে ভারতের অভিপ্রায়- সংক্রান্ত তথ্য সিআইএ- র এমন এক সূত্র কর্তৃক সংগৃহীত যে এর সত্যতা সম্পর্কে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না।[২৬৯] বাংলাদেশকে মুক্ত করার পর সেখান থেকে ভারতীয় বাহিনীর একাংশ পশ্চিমের রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করে কথিত লক্ষ্য অর্জনের বাসনা পোষণ ভারতীয় নেতৃত্বের একাংশের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকে বিশেষত ৭- ৮ই ডিসেম্বরে সাধারণ পরিষদের ভোটে জোট- নিরপেক্ষ সমস্ত দেশের মধ্যে একমাত্র ভুটানের সমর্থন লাভ করার পর, এই বাসনা যে আর বাস্তবধর্মী নয় সে কথা ভারতের নীতিনির্ধারকদের কোন অংশের কাছেই অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। পক্ষান্তরে, ভারতের এহেন চাঞ্চল্যকর উদ্যোগের উদঘাটন ব্যতীত সাধারণ পরিষদের ভোট এবং কিসিঞ্জারের বেনামী সমীক্ষা সত্ত্বেও মার্কিন জনমতের বিরুদ্ধতা অকিক্রম করে[২৭০] সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে তখনও দুরূহ। এই তথ্যের সূত্র ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে ভ্যান্ হোলেন্ তার ১৯৮০ সালের প্রবন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন, তা থেকে জানা যায়, সিআইএ- র এই সূত্রটিই আগস্ট মাসে ভারত- সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য প্রণীত এক 'গোপন সমীক্ষায়' দাবী করেছিল যে, মৈত্রীচুক্তির ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদান থেকে নিবৃত্ত করবে।[২৭১] স্মরণযোগ্য যে, আগস্ট মাসের এই উদ্দেশ্যমূলক সমীক্ষা নিউইয়র্ক টাইমসে 'ফাঁস' হওয়ার পর ভারতের দক্ষিণপন্থী দলসমূহ এবং আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী অংশ একযোগে ভারত- সোভিয়েট চুক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও আন্দোলন শুরু করে।

সেই একই সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের বিমান ও সাঁজোয়া বাহিনীর ধ্বংস সাধন পাকিস্তানী কাশ্মীর দখলের জন্য ভারতীয় অভিসন্ধির অভিযোগ আনার পর ৯ই ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট নিক্সন অপেক্ষমাণ মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।[২৭২] 'প্রত্যাসন্ন হামলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষার করার জন্য সপ্তম নৌবহরকে পাঠানো হয় করাচীর সন্নিকটে আরব সাগরে নয়, বরং তার প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পূর্বে বঙ্গোপসাগরের

উদ্দেশে। এবং এই মহৎ দায়িত্ব পালনের জন্য কথিত ভারতীয় প্রচেষ্টা উদঘাটিত হওয়ার প্রায় দু'সপ্তাহ আগেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় সপ্তম নৌবহরের এখতিয়ার বঙ্গোপসাগর অবধি সম্প্রসারিত করা হয়। ঘটনার ও ব্যাখ্যার এই সব অসঙ্গতি বৃহত্তর যুদ্ধের ডামাডোলে চাপা পড়ে। এই সব অসঙ্গতি অক্ষত রেখেই নিক্সন ও কিসিঞ্জার স্ব স্ব স্মৃতিকথায় 'পশ্চিম পাকিস্তানের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতকে সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে' সপ্তম নৌবহর পাঠানো হয়েছিল বলে দাবী করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তপ্রায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বাত্মক পতন রোধের জন্য 'নৌ, বিমান ও স্থল তৎপরতা চালানোই' যে সপ্তম নৌবহরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে সমর্থিত।[২৭৩] স্পষ্টতই এই শক্তিশালী নৌবহরের গঠন[২৭৪] ছিল বঙ্গোপসাগরে ভারতের নৌঅবরোধ ব্যর্থ করা, পাকিস্তানী স্থল বাহিনীর তৎপরতায় সাহায্য করা, ভারতীয় বিমান তৎপরতা প্রতিহত করা এবং মার্কিন নৌসেনা অবতরণে সাহায্য করার উপযোগী।

কিন্তু মার্কিন নৌবহরের জন্য বঙ্গোপসাগর ছিল ৪/৫ দিনের যাত্রাপথ। সপ্তম নৌবহর যখন যাত্রা শুরু করে তখন অর্থাৎ ৯-১০ই ডিসেম্বরে ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত বাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে পাকিস্তানী বাহিনী দ্রুত পশ্চাদপসরণে ব্যস্ত। ৯ই ডিসেম্বরে চাঁদপুর ও দাউদকান্দি থেকে পাকিস্তানী দখলের অবসান ঘটায় মেঘনার সমগ্র পূর্বাঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়। ত্রিপুরার দিক থেকে আগত ভারতের প্রথম স্থল বাহিনী চতুর্থ কোর (IV Corps)-এর অধিনায়ক লে. জেনারেল সগত সিং-এর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রশস্ত মেঘনা ও তার শাখা-প্রশাখার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ঢাকা কোন সাধ্যাতীত লক্ষ্য নয়। ১০ই ডিসেম্বরে রায়পুরা অঞ্চলে মোট চৌদ্দটি হেলিকপ্টারের সাহায্যে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ মেঘনা অতিক্রম করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের উদ্দীপ্ত সহযোগিতায় দেশী নৌকার সাহায্যে অবশিষ্ট সৈন্য ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম মেঘনার অপর পারে আনার কাজ শুরু হয়।

পক্ষান্তরে ৯-১০ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানের চতুর্দশ ও ষোড়শ ডিভিশন যথাক্রমে কুমিল্লা ও উত্তরবঙ্গ থেকে পিছু হটতে থাকে। ৯ই ডিসেম্বরে ঢাকাতেও পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ও গভর্নর মালিক সসৈন্যে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ দিন দাউদকান্দির পতনের পর তাদের কাছে এ কথা হয়ত অজ্ঞাত ছিল না যে, ঢাকাই ভারতীয় বাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্য। জানা যায়, পাকিস্তানীদের সম্পূর্ণ

পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত ইয়াহিয়ার পূর্ণ অনুমোদন লাভ করে। ১০ই ডিসেম্বর হেলিকপ্টারযোগে ভারতীয় বাহিনীর রায়পুরা অবতরণের পর এবং প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী ঢাকার সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর ভারতীয় বিমানের আক্রমণ চলার পর গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলী ঢাকায় অবস্থানকারী জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরীকে 'অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আয়োজন করে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা' এবং সমগ্র পাকিস্তানী বাহিনীকে সসম্মানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা' সম্পন্ন করার আবেদন জানায়।[২৭৫] পল মার্ক হেনরী ঢাকাস্থ আমেরিকান, রাশিয়ান, ব্রিটিশ ও ফরাসী কন্সালকে অবহিত করার পর এই প্রস্তাব জাতিসংঘ সদর দফতরে প্রেরণ করেন। নিরাপত্তা পরিষদে যখন রাও ফরমান আলীর এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ চলছিল সে সময় হঠাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক এই প্রস্তাব নাকচ হওয়ার সংবাদ পৌঁছায়।[২৭৬] বস্তুত রাও ফরমান আলীর প্রস্তাবের সংবাদ ওয়াশিংটনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকার এই প্রস্তাব রদ করার পরামর্শসহ ইয়াহিয়াকে জানান যে, পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সপ্তম নৌবহর ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছে। এর ফলে ইয়াহিয়ার মত পরিবর্তিত হয়।[২৭৭] অন্যদিকে নিক্সনের পূর্ববর্তী সতর্কবাণীর জবাবে ৯ই ডিসেম্বরে ব্রেজনেভ নিক্সনকে জানান যে, উপমহাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন পূর্বাঞ্চল থেকে পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ইয়াহিয়াকে সম্মত করানো।[২৭৮] রণাঙ্গনের বাস্তব চাপে ১০ই ডিসেম্বরে পাকিস্তান নিজেই যখন 'সম্মানজনক'ভাবে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে, তখন সেই উদ্যোগকে সমর্থন না করে মার্কিন সরকার বরং তা রদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অধিকন্তু ভারতকে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মত করানোর তাগিদ দিয়ে ৯ ও ১০ই ডিসেম্বরে নিক্সন ব্রেজনেভকে দু' দফা বার্তা পাঠান। ১০ই ডিসেম্বরে ভারতীয় বাহিনীর মেঘনা অতিক্রমের সংবাদ লাভের পর যে কোন মূল্যে এই অগ্রাভিযান রোধ করে সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী করার মত সময় লাভের উদ্দেশ্যে, ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শর্ত ছাড়াই, যে যেখানে আছে সেই ভিত্তিতে 'নিশ্চল যুদ্ধবিরতি' (standstill cease-fire) কার্যকর করার ব্যাপারে ভারতকে সম্মত করানোর জন্য ব্রেজনেভের উপর চাপের মাত্রা বাড়ানো হয় এবং তাকে জানানো হয় যে, ভারত যদি এর পরেও সম্মত না হয় তবে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।[২৭৯] নিক্সন

প্রদর্শিত এই ভীতি জোরদার করার উদ্দেশ্যে কিসিঞ্জার নিজেও ওয়াশিংটনস্থ সোভিয়েট প্রতিনিধি ভোরেন্টসভকে 'ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার-সংক্রান্ত' ১৯৬২ সালের স্মারকলিপি পড়ে শোনান এবং এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য মার্কিন সরকারের সংকল্প ব্যক্ত করেন।[২৮০] ঐ দিন সন্ধ্যায় কিসিঞ্জার নিউইয়র্কে হুয়াং হুয়ার সঙ্গে সমগ্র পরিস্থিতি আলোচনা করেন এবং বিশেষ করে 'পশ্চিম পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনী ধ্বংসের জন্য ভারতীয় পরিকল্পনা' সম্পর্কে সিআইএ কর্তৃক সংগৃহীত 'নির্ভরযোগ্য তথ্যের' উল্লেখ করেন।[২৮১] সম্ভবত এই আলোচনার ফলে তিব্বত ও সিংকিয়াং- এর মত ভূখণ্ডের জন্য 'ভারত- সোভিয়েট আঁতাত' কোন তাৎপর্য বহন করে কি না সে সম্পর্কে হুয়াং হুয়ার সন্দেহ গভীরতর হয় এবং হুয়াং হুয়া উপমহাদেশের সংঘর্ষে চীনের সামরিক দায়িত্ব সম্পর্কে যে আবেগপূর্ণ মন্তব্য করেন তা কিসিঞ্জার 'বিলম্ব হলেও চীনের সামরিক হস্তক্ষেপের আভাস' হিসাবে গণ্য করেন।[২৮২] ফলে উৎসাহিত কিসিঞ্জার একই দিনে অর্থাৎ ১০ই ডিসেম্বরে তৃতীয় বারের মত হুঁশিয়ারিসহ সোভিয়েট ইউনিয়নকে জানিয়ে দেন যে, ভারতকে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত করানোর ব্যাপারে শীঘ্রি কোন সন্তোষজনক উত্তর যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন না দিতে পারে, তবে যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর প্রেরণসহ 'শক্ত ব্যবস্থা' গ্রহণ করবে।[২৮৩]

উপমহাদেশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র 'শক্ত ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে পারে এই উপলব্ধি স্পষ্টতই সোভিয়েট ইউনিয়নের আগে থেকেই ছিল। কাজেই ৫ই ডিসেম্বরে সকল রাষ্ট্রকে পাকিস্তান বা ভারতের সক্রিয় পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো ছাড়াও তা যাতে সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহ কর্তৃক গ্রাহ্য হয় তজ্জন্য সোভিয়েট সরকার তাদের নৌবাহিনীকে সতর্ক রাখে। মার্কিন নৌবহরের যাত্রারম্ভের আগেই সোভিয়েট পূর্ব উপকূল থেকে আগত রুশ যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন তাদের ভারত মহাসাগরীয় নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধি শুরু করে এবং মার্কিন নৌবহর যখন বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী হয় তখন পাঁচটি সাবমেরিনসহ মোট ষোলটি যুদ্ধ ও সরবরাহ জাহাজ বঙ্গোপসাগরে বা তার আশেপাশে সমবেত হয়েছিল বলে জানা যায়।[২৮৪] ১০ই ডিসেম্বর মার্কিন সপ্তম নৌবহর চীন সাগর ও ভারত মহাসাগর সংযোগকারী পাঁচ শ' মাইল দীর্ঘ মালাক্কা প্রণালীর ওপারে; ভারত মহাসাগরে সোভিয়েট নৌবহরের সমাবেশও তখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত নয়। এই অবস্থায় জানা যায়, সপ্তম নৌবহরের গতিবিধি জানার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন 'কস্‌মস্‌ ৪৬৪'

পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। তার চারদিন আগে সম্ভবত উপমহাদেশের রণাঙ্গন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ‘কস্‌মস্‌ ৪৬৪’ উপগ্রহটি উৎক্ষেপিত হয়।[২৮৫] ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক থেকে সপ্তম নৌবহরের যাত্রা- সংক্রান্ত প্রথম যে সংবাদ দিল্লী এসে পৌঁছায় তদনুযায়ী কেবল বঙ্গোপসাগরে শক্তি প্রদর্শন নয়, বাংলাদেশের উপকূলের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠাও ছিল মার্কিন নৌবহরের প্রধান লক্ষ্য। ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে প্রথম যাদের কাছে এই সংবাদ এসে পৌঁছায়, তাঁরা মুহূর্তেই ধারণা করে নেন যে, এর পরে যুদ্ধের গতিধারা যে কোন দিকে মোড় নিতে পারে।[২৮৬]

রাত্রিতে দিল্লীর সর্বোচ্চ সামরিক মন্ত্রণাসভায় গভীর সঙ্কটের আবহাওয়া বিরাজমান ছিল। প্রত্যাসন্ন বহিঃহস্তক্ষেপের সমুচিত প্রতিবিধান নির্দেশের প্রশ্নে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর উচ্চতর নেতৃবর্গের অধিকাংশ ছিলেন প্রায় নিরুত্তর। পাকিস্তানী বাহিনীর শেষ প্রতিরক্ষার স্থল ঢাকাকে মুক্ত করার আগেই বাংলাদেশের উপকূল ভাগে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নৌবহর সমাবেশের আয়োজন এবং সিকিম-ভুটানের উত্তর সীমান্তে চীনা সামরিক বাহিনীর অগ্রবর্তী অবস্থানের ফলে বাংলাদেশের যুদ্ধের পরিধি অসামান্যভাবে বিস্তৃত এবং এর পরবর্তী গতিধারা জটিল, অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই বৃহত্তর সংঘাত থেকে ভারতের পিছিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘নিশ্চল স্থিতাবস্থা’ এবং ‘সঙ্কটের রাজনৈতিক মীমাংসা’র প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই সম্মানজনক পশ্চাদপসরণের সঙ্গে পরাজয়ের উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকলেও উদ্ভূত সামরিক পরিস্থিতিতে তা প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে যে অদম্য সাহস ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন জড়িত ছিল, সেই দুরূহ পরীক্ষায় ইন্দিরা গান্ধী সমুত্তীর্ণ হন। সপ্তম নৌবহরের বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য ভারতের দুর্বল নৌশক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার, ঢাকা অভিমুখে সামরিক অভিযানের গতি বৃদ্ধি এবং মৈত্রীচুক্তি অনুযায়ী বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সোভিয়েট সামরিক সহায়তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ডি. পি. ধরকে মস্কো প্রেরণ- এই তিনটি সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা একে একে ঘোষণা করেন।[২৮৭] এর আগে ঐ দিন বাংলাদেশের প্রত্যাসন্ন মুক্তির পটভূমিতে ভারত ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মিলিত অভিযানের জন্য যুগ্ম- কমান্ডব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দিবাবসানে যখন দেখা যায় যুদ্ধের পরিধি প্রায় সীমাহীনভাবে বিস্তৃত হওয়ার পথে, তখন ভারতের জন্য মস্কোর পূর্ণাঙ্গ সামরিক সহযোগিতা এবং উচ্চতর

পর্যায়ে মস্কোর সঙ্গে সামরিক ও কূটনৈতিক উদ্যোগের সমন্বয় সাধনই মূল প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

পরদিন ১১ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শত্রুমুক্ত যশোরের পূর্ব- নির্ধারিত সফর থেকে কোলকাতা ফিরে আসার আগে পর্যন্ত তাজউদ্দিন জানতেই পারেননি, মার্কিন হস্তক্ষেপের আশঙ্কা সত্যই বাংলাদেশের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে চলেছে। ডি. পি. ধর দিল্লী থেকে মস্কোর উদ্দেশে রওনা হন সে দিনই। স্পষ্টতই ইসলামাবাদের নয়া নির্দেশ অনুযায়ী, জেনারেল নিয়াজী পুনরায় ঢাকা রক্ষার জন্য আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংকল্প প্রচার করতে শুরু করেন।[২৮৮] কিন্তু ঢাকা রক্ষার জন্য না ছিল তাদের কোন আয়োজন, না ছিল উদ্যম। নদীমাতৃক এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা অনুযায়ী ঢাকা প্রতিরক্ষার জন্য ব্যূহ রচনার সম্ভাবনা দু'টি। একটি দূরবর্তী, অন্যটি ঢাকা নগরীর নিকটবর্তী। আরিচা- কালিয়াকৈর- নরসিংদী- বৈদ্যেরবাজার- নারায়ণগঞ্জ ঘিরে ঢাকার জন্য দূরবর্তী প্রতিরক্ষা বৃত্ত রচনার যে সুযোগ ছিল স্পষ্টতই তা সদ্ব্যবহারের উদ্যোগ পাকিস্তানীদের ছিল না। ঢাকার নিকটবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার সুযোগ ছিল মিরপুর ব্রীজ, টঙ্গী ব্রীজ, ডেমরা ফেরী ও নারায়ণগঞ্জে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু সর্ববিষয়ে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করার দীর্ঘ মনোবৃত্তির ফলেই হয়ত পাকিস্তানী নেতৃত্ব নিজেদের শেষ আত্মরক্ষার জন্যও আমেরিকা ও চীনের সাহায্যের উপর মানসিকভাবে নির্ভরশীল ছিল এবং সে কারণে ঢাকার নিকটবর্তী প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাকে জোরদার করার মত কোন ব্যবস্থা তারা অবলম্বন করে ওঠেনি। ১১ই ডিসেম্বরে ঢাকা শহরে ইপিকাফ, পুলিশ, রাজাকারসহ পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের অনধিক।[২৮৯] কোন কোন অঞ্চল থেকে - এমনকি নিকটবর্তী ভৈরব বাজার থেকে - ঢাকার জন্য সৈন্য পুনর্সমাবেশের পাকিস্তানী প্রচেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বিমান আক্রমণের ফলে দুরূহ হয়। উত্তরে ময়মনসিংহ থেকে পাকিস্তানের ৯৩ এ্যাডহক ব্রিগেড ঢাকা আসার কালে প্রথমে কাদের সিদ্দিকী পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধা এবং পরে ভারতীয় প্যারাস্যুট ব্যাটালিয়ান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ১১ই ডিসেম্বর বিকেলে ভারতের প্যারাস্যুট বাহিনীর মাত্র ৭০০ জন সৈন্য কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী অধ্যুষিত মধুপুর এলাকায় অবতরণ করে এবং পাকিস্তানী ব্রিগেডের পশ্চাৎবর্তী ইউনিটের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ব্রিগেড দলপতি ব্রিগেডিয়ার কাদিরকে পিছনে ফেলে রেখে, ক্ষয়িত শক্তি নিয়ে পাকিস্তানী ব্রিগেড ঢাকা ফিরে আসে। বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলি ভারতের প্যারাস্যুট

বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পাঁচ হাজার বলে উল্লেখ করায় পাকিস্তানীদের মনোবল আরও হ্রাস পায়।

অন্যত্র পশ্চাদপসরণে ব্যস্ত পাকিস্তানী বাহিনীর লক্ষ্যস্থল ছিল দক্ষিণের দিকে - খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী অঞ্চলে। উপকূল থেকে জাহাজযোগে - এবং কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন দেশীয় পতাকা ব্যবহার করে - বাংলাদেশ ছেড়ে পালাবার ব্যাপারে তাদেরকে সচে দেখা যায়। পাকিস্তানী সৈন্যদের অবরুদ্ধ করার পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং অংশত উপকূলভাগে সপ্তম নৌবহরের সংযোগ প্রতিষ্ঠার কাজ অপেক্ষাকৃত দুরূহ করার জন্য ১১ই ডিসেম্বর থেকে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর এবং উপকূলভাগে অবকাঠামো, জাহাজ, নৌযান প্রভৃতির ধ্বংস সাধনে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমান ও যুদ্ধজাহাজ ব্যাপকভাবে নিযুক্ত করা হয়। ঐ দিনই ঢাকার উদ্দেশে ভারতের একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ান একটি গোলন্দাজ ইউনিটকে সঙ্গে করে নরসিংদীর দিকে এগুতে থাকে। তবে পূর্ব রাত্রিতে যুদ্ধের গতি বৃদ্ধির জন্য দিল্লীতে যে সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়ে থাকুক, বিস্তীর্ণ মেঘনার এই সব অঞ্চলে প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা বড় প্রবল। তদুপরি সর্বত্রই ছিল যানবাহনের তীব্র অভাব, পথঘাট ভাঙ্গা। মন্থর হলেও এই সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ভারতীয় ইউনিটের অগ্রগতি চলতে থাকে স্থানীয় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায়।

প্রয়োজনের তুলনায় ভারতীয় বাহিনীর এই ‘মন্থর’ অগ্রগতিতে সে সময় যারা উদ্বিগ্ন ছিল, সোভিয়েট ইউনিয়ন নিঃসন্দেহে তাদের অন্তর্ভুক্ত। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তারাই ছিল মার্কিনী চাপের সরাসরি সম্মুখে। দাঁতাত, SALT I ও প্রভৃতি বিষয়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা ছিল সব চাইতে বেশী। অন্য অর্থে তাদের সামরিক ঝুঁকিও ছিল বিরাট। বাংলাদেশের উপকূলভাগের দিকে প্রেরিত মার্কিন সপ্তম নৌবহরের বিরুদ্ধে সোভিয়েট নৌশক্তির যে দ্রুত সমাবেশ ঘটানো হয় তার ফলে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নৌবহরের মধ্যে যেমন সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটা[২৯০] বিচিত্র ছিল না, তেমনি কোথায় যে তার শেষ হত তা বলা কঠিন ছিল। কাজেই বাংলাদেশ যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তির জন্য এবং এরপর এই যুদ্ধ যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্প্রসারিত না হয়, সম্ভবত তাও নিশ্চিত করার জন্য সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুজনেটসভ দিল্লী অভিমুখে রওনা হন।

উপমহাদেশ থেকে গোলার্ধ পথ দূরে নিউইয়র্কে হুয়াং হুয়ার 'সর্বশেষ রাইফেল পর্যন্ত লড়াই' করার অভিপ্রায় শোনার পরদিন উদ্দীপ্ত কিসিঞ্জার ওয়াশিংটনে ফিরে এসেই সোভিয়েট প্রতিনিধি ভেরেন্টসভকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি প্রদান করেন: তার পরদিন অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের মধ্যাহ্নের আগে ভারত যদি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা না করে, তবে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে অগ্রসর হবে।[২৯১]

৭-৮ই ডিসেম্বরে সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অনুমোদিত হওয়ার পর ৮ই ডিসেম্বর WSAG বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'ধ্বংস করার গোপন ভারতীয় প্রচেষ্টা' সম্পর্কে সিআইএ পরিবেশিত 'তথ্যের' ভিত্তিতে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা আবিষ্কার করা, ৯ই ডিসেম্বরে সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রার নির্দেশ দেওয়া, ১০ই ডিসেম্বরে 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে পশ্চাদপসরণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও পাকিস্তানী শাসকদের মত পরিবর্তনে বাধ্য করা এবং ভারত অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় সম্মত না হলে '১৯৬২ সালের স্মারকলিপি অনুযায়ী' ভারতের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে বলে সোভিয়েট ইউনিয়নকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া- এ সবই ছিল বাংলাদেশের যুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের জন্য নিক্সন প্রশাসনের বিস্তারিত আয়োজন। ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হুয়াং হুয়ার সংগ্রামী বিবৃতির পর এই আয়োজন সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই সব আয়োজনের মধ্যে তিনটি উপাদান ছিল মার্কিন জনমত তথা রাজনৈতিক অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য অত্যাবশ্যক: (১) সাধারণ পরিষদে গৃহীত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা; (২) এমন কোন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আশ্রয় নেওয়া যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 'আক্রান্ত' পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ; এবং (৩) সামরিক হস্তক্ষেপে অংশগ্রহণে চীনকে সম্মত করানো। এই সব ক'টি উপাদান আয়ত্তাধীন হয়েছে বলে মনে করায় কিসিঞ্জার ১১ই ডিসেম্বর ভোরেন্টসভকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি জ্ঞাপন করে বলেন, পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্বে ভারতকে অবশ্যই যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে, অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্র নিজেই প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কিন্তু কিসিঞ্জার নিশ্চয়ই জানতেন, রণাঙ্গনে আসন্ন বিজয় দৃষ্টে ভারত এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করবেই। কাজেই মার্কিন প্রশাসন ঐ দিনই

কোন এক সময়ে তাদের আসন্ন হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকে জানিয়ে দেন- উপমহাদেশে তখন অবশ্য ১২ই ডিসেম্বর। এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে CGS লে. জেনারেল গুল হাসান টেলিফোনযোগে পশতু ভাষায় নিয়াজীকে জানিয়ে দেন, পরদিন অর্থাৎ ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যাহ্নে পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য 'উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক থেকে বন্ধুরা এসে পড়বে।'[২৯২] দক্ষিণের বন্ধু তথা সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর অবধি আসার জন্য মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের যে অজুহাত ব্যবহার করে সেই মার্কিন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য নাগরিকদের উদ্ধারকর্ম তিনটি ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্সের বিমান কর্তৃক ১২ তারিখেই সম্পন্ন হয়। গুল হাসানের সংবাদের পর ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রতিরক্ষার আয়োজন নিরঙ্কুশ করার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারী করে ঘরে ঘরে তল্লাশী শুরু করে।[২৯৩] সম্ভবত এই সময়েই কোন পূর্ব- পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের আটক করার সিদ্ধান্ত নেয়; পাকিস্তানীদের পরাজয়ের প্রাক্কালে যাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।[২৯৪]

পাকিস্তানী মহলের এই শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি সত্ত্বেও রণাঙ্গনে তাদের পশ্চাদপসরণের ধারা তখনও অপরিবর্তিত। ১২ই ডিসেম্বর সকাল আটটায় নরসিংদীর উপর পাকিস্তানী দখলের অবসান ঘটে। বিকেলে ভারতের আর একটি ইউনিট (৪ গার্ডস্) ডেমরা ঘাট থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে এসে হাজির হয়। ১০ই থেকে ১২ই ডিসেম্বরের তিন দিনে ভারতীয় বাহিনীর সর্বমোট পাঁচটি ব্যাটালিয়ান, দুটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ও ৫৭ ডিভিশনের ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টার মেঘনা অতিক্রমে সমর্থ হয়। ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের মেঘনা অতিক্রমের প্রচেষ্টা ছিল তখনও অসফল। ১২ই ডিসেম্বর সূর্যাস্তের আগে জামালপুর ও ময়মনসিংহের দিক থেকে জেনারেল নাগরার বাহিনী টাঙ্গাইলে প্যারাস্যুট ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ঢাকা অভিযানের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাপূর্ণ পথের [২৯৫] সদ্ব্যবহার শুরু হয়। দক্ষিণে ভারতীয় নৌবাহিনী সপ্তম নৌবহরের আসন্ন তৎপরতা সর্ব উপায়ে বিঘ্নিত করার জন্য চালনা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ছোট বড় অবশিষ্ট সকল জাহাজ ও নৌযান, উপকূলীয় অবকাঠামো, কক্সবাজার বিমানবন্দর প্রভৃতি ধ্বংস বা অকেজো করে ফেলে।[২৯৬] বঙ্গোপসাগরের জাহাজগামী নৌপথগুলি (sea lane) সঙ্কীর্ণ ও প্রায়শ অগভীর হওয়ায়, অনুমান করা হয়, সপ্তম নৌবহরের বৃহদায়তন জাহাজগুলির পক্ষে উপকূলের নিকটে নোঙ্গর করা অসাধ্য ব্যাপার। তাদের বিমান আক্রমণ ও হেলি উত্তোলন ক্ষমতা যথেষ্ট হলেও,

পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকূলীয় জলযানের অভাবে স্থলভাগের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা অথবা পাকিস্তানী সৈন্য অপসারণের কাজ বহুলাংশে দুরূহ হবে বলে মনে করা হয়।

দিল্লীতে কুজনেটসভ এবং মস্কোতে ডি. পি. ধরের যুগপৎ আলোচনার ফলে দ্রুতগতিতে উভয় সরকার মার্কিন ও চীনা হস্তক্ষেপের হুমকি মোকাবিলায় যুগ্ম ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হন। সপ্তম নৌবহরের আগমন-সংক্রান্ত খবর তখনও (এবং ১৩ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যা পর্যন্ত) ভারতে কেবল স্বল্প সংখ্যক নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে সীমিত। তবু মার্কিন প্রশাসনের হুমকির প্রকাশ্য জবাব দান এবং ভারতের জনসাধারণকে আসন্ন বিপদ ও কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে বিশেষভাবে আয়োজিত এক জনসভায় ইন্দিরা গান্ধী 'সম্মুখের অন্ধকার দিন' ও 'দীর্ঘতর যুদ্ধের সম্ভাবনা' সম্পর্কে সতর্ক করেন।[২৯৭] সেই সঙ্গে সাধারণ পরিষদের সামপ্রতিক আহ্বানের জবাবে এবং পরোক্ষভাবে মার্কিন চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে জাতিসংঘ মহাসচিক উ থানকে এক বার্তায় ইন্দিরা জানান, ভারত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং ভারতীয় সৈন্য স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রস্তুত আছে, একমাত্র যদি পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছুতে সম্মত হয়।[২৯৮]

সোভিয়েট ইউনিয়ন যদিও সপ্তম নৌবহরের অনুসরণ/মোকাবিলা করার জন্য ভারত মহাসাগরে তার নিজের নৌবহর জোরদার করে, তবু এ সম্পর্কে ভারতকে অবহিত রাখা ভিন্ন তা নিয়ে কোন প্রচার, সতর্কবাণী উচ্চারণ বা অন্য কোন প্রকার প্ররোচনামূলক কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সতর্কবাণী এবং ১২ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্নের পূর্বে ভারতকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় বাধ্য করার জন্য চরমপত্র লাভ করা সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকার সেগুলি সরাসরি অগ্রাহ্য বা প্রতিবাদ না করে বরং সংলাপের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং দাঁতাত প্রক্রিয়ার কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেই আমেরিকান অভিযোগের সমাধান অন্বেষণে দৃশ্যত সচেষ্ট থাকেন। তবে তাদের এই প্রচেষ্টা কার্যক্ষেত্রে কালক্ষেপণের সমতুল্য হয়ে ওঠে- যেন এইভাবে বাংলাদেশ যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির জন্য ভারতকে সময় দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু যে দু'টি ক্ষেত্রে শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল, সেখানে নিঃশব্দে, যথোচিত মাত্রাতে এবং মার্কিন উপগ্রহের ক্যামেরার সামনে তা

প্রদর্শিত হয়: মার্কিন নৌশক্তি মোকাবিলার ক্ষেত্রে ভারত মহাসাগরে এবং চীনকে নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রে সিংকিয়াং সীমান্তে।[২৯৯] সোভিয়েট সামরিক শক্তির নিঃশব্দ প্রদর্শনী দ্বিধান্বিত চীনের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে সম্পূর্ণ অর্থে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় সংলাপ ও শক্তি প্রদর্শনের এই সমন্বয় সম্ভবত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সোভিয়েট কূটনীতির সফলতম দৃষ্টান্তসমূহের অন্যতম।

১২ই ডিসেম্বর রবিবার হওয়া সত্ত্বেও মধ্যাহ্নের বেশ আগে থেকেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় ভারতকে বাধ্য করার প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়নের চূড়ান্ত জবাব শোনার জন্য 'হোয়াইট হাউসের' খাস কামরা 'ওভাল অফিসে' প্রেসিডেন্ট নিক্সন, তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী হেনরী কিসিঞ্জার এবং তথ্য সহকারী আলেকজান্ডার হেগ উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষমাণ ছিলেন। নির্ধারিত সময়সীমার প্রায় দু'ঘণ্টার আগে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকার চরমপত্রের উত্তরে কেবল জানায়, পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতের কোন আক্রমণাত্মক অভিপ্রায় নেই। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন যে উদ্দেশ্যে এই চরমপত্র দেন, সেই মূল বিষয় তথা পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় ভারতকে বাধ্য করার প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়ন নীরব থাকে। কাজেই প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশে পাকিস্তানের পরাজয় রোধ করার আর যে কোন উপায় অবশিষ্ট নেই, তা মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য নিক্সন এবার অভিযোগ করেন যে, সোভিয়েট জবাবে পাকিস্তানী কাশ্মীরের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নেই (বস্তুত পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রই একে অপরের অধীনস্থ কাশ্মীরকে বিরোধপূর্ণ মনে করে এবং ৩রা ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান ভারতীয় জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশ দখল করে নেওয়ায় তা পুনরুদ্ধারের পূর্বে ভারত সরকারের পক্ষে এ জাতীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে রাজনৈতিকভাবে সম্ভব নয়, তা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরকে অবহিত করেন)। নিক্সন সাধারণ পরিষদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ব্যাপারে ভারতের অবাধ্যতার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য পুনরায় সেই দিন, অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর বিকালেই নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও কঠোর ভাষায় 'গুরুতর পরিণতির' সাবধানবাণী 'হট লাইন' মারফত ক্রেমলিনে পাঠান।[৩০০] কিন্তু এবারের সাবধানবাণীতে- ক্রুশ্চভের ভাষায়- 'পারমাণবিক দাঁত' বসানো ছিল।

পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানোর ক্ষেত্রে শেষ চেষ্টা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত 'হট লাইনে' এই সতর্কবাণী পাঠাবার পর পরই মার্কিন যুদ্ধ-সংকল্পে এক অবিস্মরণীয় উত্থান-পতনের পালা শুরু হয়। নিউইয়র্ক থেকে হুয়াং হুয়া তখনই জানান, পিকিং থেকে এক জরুরী বার্তা এসে পৌঁছেছে এবং তা অবগত হওয়ার জন্য কিসিঞ্জারকে অবিলম্বে নিউইয়র্কে যাওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে তাদের মানসিক প্রস্তুতি তখন এমনই তুঙ্গে যে এই বার্তার বিষয়বস্তু কি তা শোনার আগেই নিক্সন ও কিসিঞ্জার সাব্যস্ত করে ফেলেন যে, নিঃসন্দেহে চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করতে চলেছে; এবং চীনের এই সম্ভাব্য অভিযান প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন শক্তি প্রয়োগ করবে। এই অনুমানের ভিত্তিতে নিক্সন-কিসিঞ্জার তৎদণ্ডে এ-ও স্থির করে ফেলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্যাপারে তারা 'নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন না'।[৩০১] সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করে বিশ্বযুদ্ধের এত বড় ঝুঁকি গ্রহণের এহেন ক্ষমতা সম্ভবত সর্বশক্তিমান মার্কিন প্রেসিডেন্টেরই একান্ত অধিকার। কাজেই মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করে সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রার নির্দেশ দিয়েই নিক্সন সে দিন ক্ষান্ত হননি, সেই সঙ্গে চীনকে এই প্রতিশ্রুতি জানিয়ে দেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি চীন আক্রমণ করে তবে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৩০২] সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা যে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়া আর কিছু ছিল না, তা ঘটনার প্রায় চৌদ্দ বছর পর নিক্সন 'টাইম' ম্যাগাজিনের প্রতিনিধির কাছে স্বীকার করেন।[৩০৩]

কিন্তু হুয়াং হুয়া নিউইয়র্কে ১২ই ডিসেম্বরের বিকেলে আলেকজান্ডার হেগকে অবহিত করেন, চীন কেবল আরেক-দফা নিরাপত্তা পরিষদ অধিবেশনে যুদ্ধবিরতির বিষয় আলোচনার ব্যাপারেই আগ্রহী-উপমহাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে নয়।[৩০৪] সামরিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে চীনের এই 'অপ্রত্যাশিত' ভূমিকার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনায় এমন ওলট-পালট ঘটে যে বঙ্গোপসাগর থেকে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার পথের দূরত্বে সপ্তম নৌবহর নিশ্চল করে ফেলা হয়।[৩০৫] চীনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমেরিকার হস্তক্ষেপ পরিকল্পনা এবং আমেরিকার পরিকল্পনার সঙ্গে ঢাকার প্রতিরক্ষার সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতির প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় চীনের মত পরিবর্তন ছিল পাকিস্তানের জন্য

অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ জন্য দরকার ছিল কিছু সময়ের। সময়ের দরকার ছিল ভারতেরও; কিন্তু তা ভারত- বাংলাদেশ মিলিত বাহিনীকে ঢাকার দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই। কাজেই পাকিস্তান ও ভারত উভয় প্রতিনিধির দীর্ঘ বক্তৃতার পর ১২ই ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায়। ইতিপূর্বে ঐ দিন মধ্যাহ্নে নিক্সন ব্রেজনেভকে যে চরম সতর্কবাণী পাঠান তার জবাবে ১৩ই ডিসেম্বরের ভোর পাঁচটায় হোয়াইট হাউসের 'হট লাইনে' মস্কোর নিরুত্তপ্ত জবাব এসে পৌঁছায়: ভারতে সমস্ত ব্যাপার ভাল করে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।[৩০৬]

এদিকে উপমহাদেশে ১৩ই ডিসেম্বরে নিয়াজীকে জানানো হয়, ঐ দিন পাক বাহিনীর সহায়তার জন্য 'মিত্রদের' যে এসে পৌঁছানোর কথা ছিল, তা আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৩০৭] পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব চীনকে সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে রাজী করানোর কাজে ইসলামাবাদে সারাদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যায়। পিকিং- এ পাকিস্তানী দূতাবাসকেও দেখা যায় কর্মতৎপর।[৩০৮] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের এই মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সিকিম- ভুটান সীমান্তে মোতায়েন চীনা সৈন্যবাহিনীকে কিছুটা তৎপর হতে দেখা যায়, কিন্তু ভারতে যে তা বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল এমন নয়।[৩০৯] এদিকে বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী সদরদপ্তরে বাংলাদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক অসফল প্রয়াস ঠিক একই সময়ে পরিলক্ষিত হয়।

১২- ১৩ই ডিসেম্বরে নিউইয়র্কের মধ্যরাত্রির আগে সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়ে চীনের সম্মতি আদায় সাপেক্ষে সপ্তম নৌবহরকে নিশ্চল করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক মুলতবি করার ব্যবস্থা চলছিল, ঠিক সেই সময় কোলকাতায় ১৩ই ডিসেম্বর সকালে পররাষ্ট্র সচিবের পদ থেকে প্রায় মাসাধিককাল যাবত অব্যাহতিপ্রাপ্ত মাহবুব আলম চাষী যুদ্ধবিরতির এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন। এই প্রস্তাবিত বিবৃতির প্রধান বক্তব্য ছিল: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে তৎক্ষণাৎ বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবেন। বাংলাদেশ তখন ভারতের সঙ্গে যুগ্ম- কমান্ডব্যবস্থায় আবদ্ধ, কাজেই বাংলাদেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি যদি একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতেন, তবে ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে এককভাবে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাওয়া নীতিগতভাবে অসিদ্ধ হত।[৩১০]

সম্ভবত এই বিবেচনা থেকেই সৈয়দ নজরুল উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর দানে অসম্মত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের গোচরে আনেন।

১৩ই ডিসেম্বরে ভারত ও বাংলাদেশের স্থলবাহিনীর অভিযান ঢাকাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অগ্রসর। উত্তর দিক থেকে জেনারেল নাগরার বাহিনী এবং কাদের সিদ্দিকী পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধাগণ ঐ দিন সন্ধ্যায় পাক বাহিনীর হাল্কা প্রতিরোধ ব্যর্থ করে কালিয়াকৈর অবধি এসে পৌঁছায়। বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর সর্বপ্রথম ইউনিট হিসাবে ২- ইবি ঢাকার শীতলক্ষ্যার পূর্ব পাড়ে মুরাপাড়ায় উপস্থিত হয় একই দিনে। ঢাকার পূর্ব দিকে ডেমরা ফেরীর দিকে অগ্রসরমাণ ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানী প্রতিরোধের সম্মুখীন। ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী ট্যাঙ্কের মোকাবিলা করার মত ভারতীয় ট্যাঙ্ক তখনও মেঘনা অতিক্রমে অসমর্থ এবং তৎকারণে ঢাকা নগরীতে পাকিস্তানী প্রতিরোধের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত স্থল অভিযানের তখনও দেরী। সমুদ্রপথে পলায়নের সুযোগ লোপ পাওয়ায় ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। ফলে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ক্ষেত্র হিসাবে ঢাকার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সমগ্র আকাশ জুড়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একচ্ছত্র অধিকার, ঢাকায় পাকিস্তানী সামরিক অবস্থানের বিরুদ্ধে তাদের নির্ভুল ও তীব্রতর আক্রমণ রচনা, ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক পলায়ন উপযোগী সকল সমুদ্রযানের ধ্বংস সাধন, ভারতীয় স্থলবাহিনীর পূর্ব পরিকল্পিত অভিযানের মুখে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ড- বিখণ্ড পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয়বরণ, ঢাকার ভিতরে সর্বত্র বিরুদ্ধচারী মানুষ, সুযোগের প্রতীক্ষারত অগণিত মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকার চারপাশে ভারতের ও বাংলাদেশের মিলিত বাহিনীর ক্রমসঙ্কুচিত বেষ্টনী এবং শেষ ভরসার স্থল আমেরিকা ও চীনের প্রতিশ্রুত হস্তক্ষেপ পুনরায় পিছিয়ে যাওয়া- এই সমস্ত কিছুর একত্র সমাবেশের ফলে ঢাকায় পাকিস্তানী সেনানায়কদের মনোবল উঁচু রাখার সামান্যতম অবলম্বন কোথাও ছিল না। প্রত্যাসন্ন বিপর্যয়ের মুখে আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেল মানেকশ- এর তৃতীয় ও সর্বশেষ আহ্বানে সাড়া দেওয়াই অবরুদ্ধ পাকিস্তানী নেতৃত্বের পক্ষে প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে। অবরুদ্ধ পাকিস্তানী নেতৃত্বের এই মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঢাকায় তাদের শেষ প্রতিরক্ষার স্পৃহাকে প্রায় নিঃশেষিত করে ফেলে।

১৩ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের মুলতবি বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব তৃতীয় সোভিয়েট ভোটের মুখে যথারীতি বাতিল হয়ে যায়। যে কারণেই হোক সামরিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নে চীনের সম্মতির সম্ভাবনাকে তখনও যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ বাতিল করে উঠতে পারেনি।[৩১১] কাজেই সেই ভরসায় চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্চল রাখার পর সপ্তম নৌবহরকে পুনরায় সচল করা হয় বঙ্গোপসাগরের দিকে। কিন্তু সামগ্রিক ঘটনাবলী দৃষ্টে এই নৌ-অভিযানের পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যের কতখানি অবশিষ্ট ছিল তা অজ্ঞাত। চীনকে নিয়ে বিস্তর টানাটানির পরেও সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে তাদের দৃঢ় সম্মতির অভাব,[৩১২] ঢাকা নগরীতে শেষ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে পাকিস্তানী বাহিনীর পরিদৃষ্ট ব্যর্থতা এবং বঙ্গোপসাগরে ও তার আশেপাশে সোভিয়েট রণতরী ও সাবমেরিন বহরের নীরব সম্বর্ধনা দৃষ্টে সপ্তম নৌবহরের সামরিক লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ অসঙ্গত ছিল না। আর কোনভাবে না হোক, শেষ পর্যন্ত পাক বাহিনীর উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিতে পারে, ক্রমশ এই ধরনের এক অস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই মার্কিন নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৩১৩]

উপমহাদেশে ১৪ই ডিসেম্বর ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল দিন। একমাত্র ঢাকা শহর এবং গুটিকয় ছোট এলাকা বাদে সারা বাংলাদেশ তখন শত্রুমুক্ত। কোন সরকারী নির্দেশ বা আবেদনের আগেই হাজার হাজার শরণার্থী সহজাত প্রবৃত্তির টানে বিগত ক'দিন ধরে ফিরতে শুরু করেছে যে যার পরিত্যক্ত বসত, ভিটে-মাটির দিকে। অবশ্য বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠই তখনও স্বদেশমুখী নন। এদের মধ্যে যারা রাজনীতি সচেতন তারা, এমনকি অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রভাতী সংবাদপত্র থেকে আজকেই প্রথম জানতে পারেন, মার্কিন সপ্তম নৌবহর এক অজানা বিপদের হুমকি নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে ছুটে আসছে। সপ্তম নৌবহর আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য ধ্বংসক্ষমতা সম্পর্কে তাদের অধিকাংশই ছিলেন অনবহিত অথবা নিরুদ্বিগ্ন। সকলেই মত্ত আসন্ন বিজয়ের উল্লাসে, ব্যস্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতিতে। কিন্তু ঢাকায় তখন আসন্ন যুদ্ধ ও সম্ভাব্য ধ্বংসের থমথমে আশঙ্কা।[৩১৪] শহরের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা এই সময় পনের থেকে কুড়ি হাজারে উন্নীত বলে অনুমিত।[৩১৫] ঢাকাকে মুক্ত করার জন্য সমবেত ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর সংখ্যাও দ্রুত উর্ধ্বমুখী। একটি ভারতীয় ব্রিগেড এবং একটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ঘোড়াশাল থেকে টঙ্গী আসার পথে পুবাইলে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অন্য আর একটি ভারতীয়

ব্রিগেডের অর্ধাংশ দাউদকান্দি থেকে হেলিকপ্টারযোগে নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে এসে পৌঁছায়। ঢাকায় পাকিস্তানী ট্যাঙ্কের মোকাবিলায় চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার জন্য ভারতীয় ট্যাঙ্কবহর মেঘনার পশ্চিম পাড়ে আনার চেষ্টা ইতিপূর্বে তিন দিন যাবত ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৪ই ডিসেম্বর ভারতের পিটি- ৭৬ উভচর ট্যাঙ্কবহর যখন সাফল্যের সঙ্গে মেঘনা সন্তরণে ব্যস্ত, তখন ভারতীয় বিমানবাহিনীর ছ'টি মিগ- ২১ ঢাকায় গভর্নর ভবনের উপর আক্রমণ চালিয়ে অধিকৃত এলাকায় পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক প্রশাসনকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগে বাধ্য করে, আত্মসমর্পণের জন্য নিয়াজীকে মনস্থির করতে সাহায্য করে এবং এমনিভাবে স্থলযুদ্ধের অবধারিত বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও ঢাকা শহরের ধ্বংস ব্যতিরেকেই মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি সম্ভব করে তোলে।

১৪ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্নের কিছু আগে সংগৃহীত একটি পাকিস্তানী সিগন্যাল থেকে দিল্লীর বিমান সদর দফতর জানতে পারে, মাত্র ঘণ্টাখানেক বাদে ঢাকার গভর্নর ভবনে গভর্নরের মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তৎক্ষণাৎ ঐ বৈঠক চলাকালেই গভর্নর ভবন আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মেঘালয়ের শিলং বিমান ঘাঁটি থেকে প্রেরিত অর্ধ ডজন মিগ- ২১ সঠিক সময়ে গভর্নর ভবনের উপর নির্ভুল রকেট আক্রমণ চালায়। মন্ত্রী পরিষদসহ গভর্নরের তাৎক্ষণিক পদত্যাগের ফলে 'পূর্ব পাকিস্তানের' শেষ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিয়াজীর উপর ন্যস্ত হয়।[৩১৬] গভর্নর ভবনের পরেও ঢাকার সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর ভারতীয় বিমান আক্রমণ অব্যাহত থাকে। সপারিষদ গভর্নর মালেকের পদত্যাগের সংবাদ এবং ঢাকার ইস্টার্ন কমান্ড থেকে ঘন ঘন প্রেরিত দুর্গত বার্তায় 'পূর্ব পাকিস্তানের' প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবশেষে ইয়াহিয়া খানের চৈতন্যোদয় হয়। বেলা আড়ইটার দিকে গভর্নর মালেক এবং ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতি লে. জেনারেল নিয়াজীর কাছে ইয়াহিয়ার যে বার্তা এসে পৌঁছায় তাতে পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের জীবনরক্ষার জন্য 'যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের' অনুমতি দেওয়া হয়।[৩১৭]

১৪ই ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের ভোর তিনটায় অর্থাৎ ঢাকায় ভারতীয় বিমানবাহিনী কর্তৃক গভর্নর ভবন আক্রমণের অন্তত দু'ঘণ্টা পরে সোভিয়েট সরকার নিক্সনের সর্বশেষ চরমপত্রের জবাবে জানান: উপমহাদেশ প্রশ্নে তাদের দুই সরকারের ভূমিকা 'যথেষ্ট নিকটতর' এবং ভারত সরকারের কাছ থেকেও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে যে পশ্চিম

পাকিস্তানের কোন ভূখণ্ড দখলের পরিকল্পনা তাদের নেই; কিন্তু পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের পরাজয় রোধের জন্য নিক্সনের চরমপত্রসমূহে বর্ণিত সর্বপ্রধান দাবী তথা ভারত কর্তৃক তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণার প্রশ্নে সোভিয়েট নোট সম্পূর্ণ নীরব থাকে।[৩১৮] নীরব থাকার কারণও ছিল- সে দিনই সন্ধ্যা থেকে সোভিয়েট সংবাদমাধ্যমগুলি 'মুক্ত এলাকায় প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শাসন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ প্রচার করতে শুরু করে।[৩১৯]

এদিকে বিমান আক্রমণের ফলে ঢাকার ট্রান্সমিটার কয়েক দিন আগেই অচল হয়ে পড়েছিল। কাজেই ইয়াহিয়ার অনুমতি লাভের পর লে. জেনারেল নিয়াজী কয়েকটি শর্ত সম্বলিত যুদ্ধবিরতির এক প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য মার্কিন কন্সাল জেনারেল স্পিভাককে অনুরোধ জানায়। স্পিভাক বার্তাটি দিল্লী না পাঠিয়ে ওয়াশিংটনে পাঠান। যদিও যে কোন বার্তা তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে পাঠাবার মত ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল, তবু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ এই বার্তা- যা অবিলম্বে পৌঁছলে ঢাকায় বন্দী কিছু বুদ্ধিজীবীসহ অনেকের প্রাণ হয়তো রক্ষা পেত- সংশ্লিষ্ট প্রাপকের কাছে পৌঁছাতে প্রায় একুশ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। এই অসাধারণ বিলম্ব থেকে অনুমান করা চলে, বার্তাবাহক মার্কিন প্রশাসন 'পাকিস্তানকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করার' সকল অবশিষ্ট সম্ভাবনা ইতিমধ্যে অন্বেষণ করেন।[৩২০] ইতিপূর্বে ইয়াহিয়ার পূর্ণ অনুমতি নিয়ে রাও ফরমান আলী ১০ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি, পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহার এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রস্তাব জাতিসংঘের কাছে পাঠিয়েছিল তা কেবলমাত্র মার্কিন সরকারের হস্তক্ষেপের ফলেই বাতিল হয়। সপ্তম নৌবহর তাদের সাহায্য করার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে এই মর্মে নিশ্চয়তা লাভ করার পরেই আরও পাঁচ দিনের জন্য এ যুদ্ধ সম্প্রসারিত হয়। তারপর ১৪-১৫ই ডিসেম্বরের এই ২১ ঘণ্টার অধিকাংশ সময় ধরে অবশিষ্ট পন্থার অন্বেষণ ও পর্যালোচনার পর মার্কিন প্রশাসন সম্ভবত নিশ্চিত হন যে, শক্তির পরিবর্তিত ভারসাম্যের জন্য এই উপমহাদেশ তাদের প্রথাসিদ্ধ 'গানবোট কূটনীতি' প্রয়োগের উপযুক্ত স্থান নয়।

১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে নিয়াজীর যুদ্ধবিরতির বার্তা দিল্লীতে পৌঁছানোর পর দেখা যায়, পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এই প্রস্তাবের অন্তর্গত নয়। তার প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল, যুদ্ধবিরতির পর অস্ত্রশস্ত্র সমেত পাকিস্তানী বাহিনীর কোন পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে- স্পষ্টতই দক্ষিণে উপকূলভাগে- জমায়েত হওয়ার পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা। এ ছাড়া,

১৯৪৭ সাল থেকে যে সব বহিরাগত পূর্ব বাংলায় বসবাস করে এসেছে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যারা ১৯৭১- এর মার্চ থেকে পাকিস্তানী শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাদের যাতে কোন ক্ষতি না করা হয় তদ্মর্মে নিশ্চয়তা লাভের অনুরোধ নিয়াজীর বার্তায় জানানো হয়। মার্চে গণহত্যা শুরুর পর স্বেচ্ছায় যারা পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, তাদের কৃতকর্মের গুরুত্ব নিরূপণ করে শাস্তি বিধানের অধিকার ছিল বাংলাদেশ সরকারের একার- কাজেই এ ব্যাপারে ভারতের কোন বক্তব্য ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র সমেত দক্ষিণের কোন মনোনীত স্থানে নির্বিঘ্নে জমায়েত হতে দেওয়ার প্রস্তাব এবং বাংলাদেশের উপকূলভাগ অভিমুখে সপ্তম নৌবহরের অগ্রগতির সংবাদ থেকে এই সন্দেহ প্রবল হয়ে ওঠে যে, মার্কিন নৌবহর অন্ততপক্ষে এই অবরুদ্ধ পাক সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করবে।[৩২১] উপকূলভাগে পৌঁছার পর সপ্তম নৌবহর কেবল পাকিস্তানীদের স্থানান্তরের মধ্যেই নিজেদের ভূমিকা আবদ্ধ রাখবে কি না সে নিশ্চয়তারও অভাব ছিল। তা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে নিয়াজীর প্রস্তাবে কোন উল্লেখ না থাকায়,[৩২২] এই সৈন্যবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছার পর যুদ্ধের পরবর্তী গতিপ্রকৃতি কি দাঁড়াবে তা ছিল আর একটি বিচার্য বিষয়।

এই সব অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য জেনারেল মানেকশ পাকিস্তানী প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নিয়াজীর কাছে দাবী করেন, ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাক বাহিনীর শর্তহীন আত্মসমর্পণই যুদ্ধবিরতি ঘোষণার একমাত্র ভিত্তি হতে পারে।[৩২৩] মানেকশ'র এই দাবীর পিছনে যে শক্তি বিদ্যমান ছিল তা তখন সমগ্র রণাঙ্গনে প্রতিফলিত। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ, পূর্ব, পূর্ব- উত্তর ও উত্তর দিক থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত বাহিনী ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে সমবেত। সপ্তম নৌবহরের স্থল সংযোগ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য স্থান চট্টগ্রাম উপকূলভাগও তখন মিত্রবাহিনীদ্বয়ের করায়ত্ত হওয়ার পথে। সারাদিন ধরে ভারতীয় জঙ্গীবিমান ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানস্থল, বাঙ্কার, কমান্ড- কেন্দ্র, সামরিক উপদফতর প্রভৃতির উপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে চলে।

আক্রমণের মুখে দখলদার সৈন্যরা নানা কৌশল অবলম্বন করে। কোন কোন পাকিস্তানী বাঙ্কারের উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে ভারতীয় বিমান ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়; কেননা আত্মরক্ষার্থে পাকিস্তানীরা সেই সব

বাঙ্কারের তাপদগ্ধ ছাদে হাত-পা বাধা অবস্থায় স্থানীয় জনসাধারণকে শায়িত রেখেছিল।[৩২৪] সেনানিবাস থেকে অফিসাররা তাদের দফতর সরিয়ে নিয়েছিল অসামরিক এলাকার বিভিন্ন অংশে। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষই যেখানে বিপক্ষে, সেখানে সরে গিয়েও তাদের পরিত্রাণ মেলেনি। তাদের নতুন আশ্রয়ের খবর সাথে সাথে আশেপাশের মানুষ জানিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের; মুক্তিযোদ্ধারা খবর পাঠিয়েছে নগরের উপকণ্ঠে ভারতীয় সিগন্যালসকে এবং তার কিছু পরেই ভারতের জঙ্গী ও বোমারু বিমান এই সব নতুন লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে তৎপর হয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর লক্ষ্যভেদী, উপর্যুপরি আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কাজে ব্যতিব্যস্ত, সন্ত্রস্ত ও সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত পাকিস্তানী ইস্টার্ন কমান্ড এমনিভাবে শর্তহীন আত্মসমর্পণের দিকে তাড়িত হয়।[৩২৫] অবশেষে নিয়াজীর অনুরোধে ১৫ই ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ভারতীয় বিমান আক্রমণ স্থগিত রাখা হয়।

পরদিন সকালে বিমানাক্রমণ বিরতির সময়সীমা শেষ হওয়ার কিছু আগে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের প্রতিনিধি জন কেলীর মাধ্যমে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষকে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময়সীমা আরও ছ'ঘণ্টার জন্য বাড়িয়ে দিয়ে ভারতের একজন স্টাফ অফিসার পাঠানোর অনুরোধ জানান যাতে অস্ত্র সমর্পণের ব্যবস্থাদি স্থির করা সম্ভব হয়। এই বার্তা পাঠানোর কিছু আগে অবশ্য মেজর জেনারেল নাগরার বাহিনী কাদের সিদ্দিকী বাহিনীকে সঙ্গে করে মিরপুর ব্রীজে হাজির হন এবং সেখান থেকে নাগরা নিয়াজীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। নিয়াজীর আত্মসমর্পণের ইচ্ছা ব্যক্ত হওয়ার পর সকাল ১০:৪০ মিনিটে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে নাগরার বাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের দলিল এবং সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত করার জন্য ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যেকব মধ্যাহ্নে ঢাকা এসে পৌঁছান। বিকেল চারটার আগেই বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনীর দুটি ইউনিটসহ মোট চার ব্যাটালিয়ান সৈন্য ঢাকা প্রবেশ করে। সঙ্গে কয়েক সহস্র মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকার জনবিরল পথঘাট ক্রমে জনাকীর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে 'জয় বাংলা' মুখরিত মানুষের ভিড়ে। বিকেল চারটায় ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ও ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম-কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, বাংলাদেশের ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খোন্দকার,[৩২৬] এবং ভারতের অপরাপর সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিনিধিগণ ঢাকা অবতরণ করেন। এর আধ ঘণ্টা বাদে

ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল হর্ষোৎফুল জনতার উপস্থিতিতে ভারত- বাংলাদেশ মিলিত বাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সমরাধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজী 'বাংলাদেশে অবস্থিত' সকল পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।[৩২৭] কিছু পরেই ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে ভারতের পক্ষ থেকে এককভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিনই সপ্তম নৌবহর প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণতম প্রান্তে। কিন্তু বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের দখল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

অধ্যায়- ২২: ডিসেম্বর - জানুয়ারি

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় যেদিন পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, ঠিক সেদিনই কোলকাতায় প্রবাসী সদর দফতর থেকে বাংলাদেশ সরকার সমগ্র দেশে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসকদের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী পাঠাতে শুরু করেন। শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তার জরুরী করণীয় নির্ধারণের জন্য ২২শে নভেম্বরে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা সচিবদের সমবায়ে যে সাবকমিটি গঠন করেছিলেন (পরিশিষ্ট ঠ- এ বর্ণিত), সেই সাবকমিটি এবং পরিকল্পনা সেল পাশাপাশি এ যাবত কাজ করে চলেন। ফলে বেসামরিক প্রশাসন এবং আইন ও শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুনরুজ্জীবন, শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন, খাদ্য ও জ্বালানিসহ জরুরী পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, পাকিস্তানের আধা- সামরিক বাহিনী ও সশস্ত্র সমর্থকদের নিষ্ক্রিয়করণ, সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্রের পুনরুদ্ধার, জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে সচিব- সাবকমিটি ও পরিকল্পনা সেলের সুপারিশসমূহ মন্ত্রিসভার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য হাজির করা হয়।[৩২৮] বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রিসভার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের পর জেলা পর্যায়ে জরুরী করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের প্রতি নির্দেশপত্র প্রেরিত হয় [৩২৯] ৭ই ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে উনিশটি জেলার জন্য জেলা প্রশাসকদের মনোনয়ন ও নিয়োগ সম্পন্ন হয়। ১৭ই ডিসেম্বর ঐ সব জেলার সহকারী প্রশাসক পর্যায়ে নিয়োগ করা হয় আরো ছ'চল্লিশজন অফিসার।

জেলা প্রশাসকদের কাছে প্রেরিত নির্দেশপত্রে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল সর্বাগ্রে। সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রচারিত বিভিন্ন বিবৃতি এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত আবেদনে মুক্ত এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বারংবার আহ্বান জানানো হয়। প্রায় ন'মাস ধরে হানাদার বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের রাজত্বকালে যে সব স্থানীয় অনুচরদের কার্যকলাপ মানুষের দুর্গতির মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল, তাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত দেশবাসীর পুঞ্জীভূত ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা যে এক ক্ষমাহীন সংকল্পে পরিণত হয়েছে তা কারো অজ্ঞাত ছিল না। একবার এই পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটা মাত্র সারা দেশে নতুন করে রক্তের প্লাবন শুরু হওয়ার আশঙ্কা ছিল খুবই প্রবল। এর ফলে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করাও যে সাতিশয় দুরূহ হয়ে পড়ত, সে বিষয়ে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের কোন সংশয় ছিল না। তাই যুদ্ধ চলাকালেই মন্ত্রিসভা পাকিস্তানী অনুচর হিসাবে অভিযুক্তদের বিচার ও শাস্তির আইনসঙ্গত পন্থা উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩৩০] এ ছাড়া এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড যাতে কোনক্রমেই সংঘটিত হতে না পারে তজ্জন্য মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়।

বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার কর্মসূচী কাগজপত্রে যত নির্ভুলভাবেই ব্যক্ত করা হোক, প্রায় ন'মাস দীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের পর সারা দেশের প্রশাসন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়- বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তখন সর্বাংশে বিপর্যস্ত। আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি ছিল নামে মাত্র। দেশের আয়তন ও সমস্যার তুলনায় বাংলাদেশের নিজস্ব সৈন্যবলও ছিল অতিশয় নগণ্য। দেশের অফিস- আদালত ছিল জনশূন্য, ডাক বিভাগ সম্পূর্ণ বন্ধ; তার বিভাগ প্রায় অচল; অসংখ্য ব্রীজ ও সেতু বিধ্বস্ত হওয়ায় রেল ও সড়কপথে যোগাযোগ প্রতি পদে বিঘ্নিত; সচল অসামরিক বাস ও ট্রাক বিরল বস্তু; যান্ত্রিক জলযান প্রায়শই জলমগ্ন অথবা বিধ্বস্ত; স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই; কলকারখানা সব বন্ধ; বন্দর অচল ও বহির্বাণিজ্য নিশ্চল। অন্যদিকে পাকিস্তানী নির্যাতনের কবল থেকে জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষার প্রচেষ্টায় দেশের ভিতরেই তখন দেড় থেকে দু'কোটি লোকের উদ্বাস্তুর দশা; ভারতে আশ্রয়লাভকারী এক কোটি শরণার্থীকেও সেখানকার সাধারণ নির্বাচনের আগে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার তাগিদ রয়েছে। মোট

প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি লোকের পুনর্বাসন ছিল দেশের জরুরী সমস্যাগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। খাদ্যশস্যের ঘাটতি ৪০ লক্ষ টন।[৩৩১] স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিল এমনই ঘোর দুর্যোগপূর্ণ।

আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতি একাধিক কারণেই ছিল সব চাইতে সমস্যা- সঙ্কুল ও বিপজ্জনক। নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও গণবাহিনী হিসাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল ৮৪,০০০ মুক্তিযোদ্ধাকে।[৩৩২] মুজিব বাহিনীর সংখ্যা ছিল আরও দশ হাজার। এদের প্রায় সবাইকে অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। তৎপরতার সময় অস্ত্র খোয়ানো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খুব বিরল ঘটনা ছিল না; এদের মধ্যে যারা মোটামুটি দক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, সেই সব যোদ্ধাদের পুনরায় অস্ত্র দেওয়া হয়। এ ছাড়া টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে মূলত স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগের ভিত্তিতে যে সব বাহিনী গ্রুপ এক ধরনের গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করে চলেছিল তাদেরকেও বিভিন্ন দফায় অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। এক নির্ভরযোগ্য ভারতীয় সূত্র অনুসারে, নিয়মিত বাহিনীর জন্য স্বতন্ত্র বরাদ্দ বাদে, কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরবরাহকৃত মোট অস্ত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।[৩৩৩] সরবরাহকৃত এই বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভাব্য অপব্যবহারে স্বাধীনতা- উত্তর বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গোলাগুলির (ammunition) পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হত, যাতে যুদ্ধের পর তাদের হাতে উদ্বৃত্ত গোলাগুলি খুব একটা অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকায়, তাদের অব্যবহৃত গোলাগুলির পরবর্তী ব্যবহার সম্পর্কে কিছু দুশ্চিন্তার উদ্রেক ঘটে। কেন্দ্রীয় কমান্ডকাঠামোবিহীন মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদের কারণে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সমস্যাটি ছিল জটিল। ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ‘মুজিব বাহিনীর’ একাংশের কার্যকলাপ এবং চীনাপন্থী হিসাবে পরিচিত কোন কোন উগ্র বামপন্থী গ্রুপের বিঘোষিত ভূমিকার দরুন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণের সমস্যা জটিলতর হয়। সাধারণভাবেই এক বর্বর সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কয়েক মাস অস্ত্র ধারণের পর এই সব তরুণদের মনোজগতে যে বিপুল আলোড়ন এবং মূল্যবোধের যে বিরাট রূপান্তর ঘটে, স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়ার পরেও তা কতখানি প্রবল থাকবে বা কিভাবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে, তা ছিল সর্ববৃহৎ প্রশ্ন।

কিন্তু পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পর আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় বিপদ আশঙ্কা করা হয় পাকিস্তানের আধা-সামরিক বাহিনীসমূহের মধ্যে গোঁড়া ইউনিটগুলিকে নিয়ে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক মিশ্র উপাদানে গঠিত রাজাকার, সশস্ত্র জামাতে ইসলামীদের দ্বারা গঠিত আল-বদর এবং সশস্ত্র বিহারীদের আল-শামস্-এই তিন আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০/৭০ হাজার। এ ছাড়া যুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানীরা বিহারী ও জামাতে ইসলামী কর্মীদের মধ্যে অকাতরে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করে বলে জানা যায়। পাকিস্তানের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের অধিকাংশই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আত্মগোপন করার অথবা মফস্বল ও ভারত অভিমুখে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও এদের ধর্মান্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ অংশের পক্ষে কোন বেপরোয়া কাজই অসাধ্য ছিল না। পাকিস্তান সমর্থক গোঁড়া অংশকে চিহ্নিত করে তাদের নিবৃত্ত না করা পর্যন্ত ঢাকা শহরকে বিপদমুক্ত হিসাবে গণ্য করা অসম্ভব হত। নিয়াজীর আত্মসমর্পণের কয়েক ঘণ্টা বাদেই ইয়াহিয়া খান 'পূর্ণ বিজয় লাভ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংকল্প' ঘোষণা করায় এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পূর্ণ শক্তিতে উপস্থিত থাকায়, নবতর যুদ্ধের আশঙ্কা তখনও সর্বাংশে তিরোহিত নয়।

এই পটভূমিতে ঢাকায় উপনীত ভারতীয় সামরিক কমান্ড শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না-আসা পর্যন্ত বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিধানে তাদের সামরিক অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। এর ফলে এবং ভারত সরকারের সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনে তিন অথবা চার দিন বাদে মন্ত্রিসভার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য দিন স্থির করা হয়। তার আগে ঢাকায় ন্যূনতম প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের সচিবদের একটি দল ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকা এসে পৌঁছান। একই দিনে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ঢাকা আসেন। ১৯শে ডিসেম্বর থেকে স্বল্প সংখ্যক অফিসার ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েট প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়।

ঢাকায় আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে কত জটিল তা ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ক্রমশ উন্মোচিত হতে শুরু করে। ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রি থেকে বিজয়োল্লাসে মত্ত যে সব 'মুক্তিযোদ্ধা' পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ১৭ই ডিসেম্বর দেখা যায় তাদের অনেকের হাতেই চীনা AK৪৭ রাইফেল

ও স্টেন গান।[৩৩৪] এই সব অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করার কোন প্রশ্ন ছিল না। বস্তুত এই সব অস্ত্রধারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কখনো মুক্তিযোদ্ধাও ছিল না- অন্তত মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ইউনিট নেতাই এদের সনাক্ত করতে পারেনি। জানা যায়, এতদিন যে সব তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করে - এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সচ্ছল বা প্রভাবশালী অভিভাবকদের নিরাপদ আশ্রয়ে - বসবাস করছিল তারাও পাকিস্তানের পরাজয়ের পর বিজয় উল্লাসে বিজয়ী পক্ষে যোগ দেয়। মুখ্যত এদের হাতেই ছিল পাকিস্তানী সৈন্য এবং সমর্থকদের ফেলে দেওয়া অস্ত্র অথবা অরক্ষিত পাকিস্তানী অস্ত্রাগার থেকে লুঠ করা অস্ত্রশস্ত্র এবং অঢেল গোলাগুলি। ১৬ই ডিসেম্বর নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পর এই বাহিনীর উৎপত্তি ঘটে বলেই অচিরেই ঢাকাবাসীর কাছে এরা 'Sixteenth Division' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কালক্ষেপণ না করে এদেরই একটি অংশ অন্যের গাড়ী, বাড়ী, দোকানপাট, স্থাবর ও অস্থাবর বিষয়সম্পত্তি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে দখল করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। এদের পিছনে তাদের সৌভাগ্যান্বেষী অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থন কতখানি ছিল বলা শক্ত, তবে ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত-বিভাগ ও দাঙ্গার পর এই প্রক্রিয়াতেই অনেক বিষয়সম্পত্তির হাতবদল ঘটেছিল। সুযোগসন্ধানী 'সিক্সটিনথ ডিভিশন' সৃষ্ট এই ব্যাধি অচিরেই সংক্রমিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মধ্যে। তারপর কে যে 'সিক্সটিনথ ডিভিশনের' লোক, কে যে মুক্তিযোদ্ধা আর কে যে দলপরিবর্তনকারী রাজাকার - সব যেন একাকার হয়ে এমন এক লুঠপাটের রাজত্ব শুরু করে যে, ঢাকা শহরে নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক জরুরী দায়িত্ব পালন ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়।[৩৩৫]

অন্যদিকে পাকিস্তানীদের স্থানীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে স্বজন হারানো, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত দেশবাসীর পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। ভারতীয় সেনাবাহিনী রেডক্রসের অভয়াশ্রয় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এবং পাক বাহিনী ও বিহারী-অধ্যুষিত অঞ্চলের চারদিকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ে তোলে ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটতে থাকে। দৃশ্যত মুক্তিযোদ্ধাদের ইউনিট কমান্ডারদের মধ্যে কারো কারো পক্ষে তাদের সহযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ করাও সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে।[৩৩৬] এহেন অবস্থার মাঝে ১৮ই ডিসেম্বর রায়ের বাজারে কাটাসুর নামক এক ইটখোলার খাদে হাতবাঁধা অবস্থায় দেশের বিশিষ্ট

বুদ্ধিজীবীসহ প্রায় দুইশত ব্যক্তির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আবেগ চরমে পৌঁছায়।[৩৩৭]

ঐ দিন সন্ধ্যায় ঢাকার প্রথম গণজমায়েতে মুক্তিযোদ্ধাদের কতিপয় নেতা শান্তি ও শৃঙ্খলার আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করার পর হঠাৎ কি আবেগবশত বিদেশী সাংবাদিক ও টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে অজ্ঞাত অভিযোগে ধৃত চারজন বন্দীকে আধ ঘণ্টাকাল ধরে পিটিয়ে অবশেষে বেয়োনেটবিদ্ধ করে হত্যা করে। স্থলভূমির মুক্তিযুদ্ধে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা সফল অধিনায়ক টাঙ্গাইলের আবদুল কাদের সিদ্দিকী কর্তৃক নিজ হাতে এদের বেয়োনেটবিদ্ধ করার সচিত্র সংবাদ সারা বিশ্বে ফলাও করে প্রচারিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের শবদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর সারা শহরে যখন প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তখন সেই অবস্থায় কাদের সিদ্দিকীর এই দৃষ্টান্ত ভয়াবহ রক্তপাতের সূচনা করতে পারে এই আশঙ্কায় ভারতীয় বাহিনী কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করার উদ্যোগ নেয়। বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার অধিনায়ক এবং যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব ও জনপ্রিয়তার অধিকারী কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করার উদ্যোগ ভারতীয় বাহিনীর জন্য সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না।[৩৩৮] তা ছাড়া ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অংশ থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানী সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির খবর আসছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের সূত্রপাত হয় যখন দৃশ্যত কিছু শিখ অফিসার এবং তাদের অধীনস্থ সেনা যশোর, ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের মূলত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এবং খুলনার ক্যান্টনমেন্ট ও শিল্প এলাকায় লুঠপাট শুরু করে; কিন্তু তা ব্যাপক আকার ধারণ করার আগেই তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃঢ় হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যায়। এই সব ঘটনার ফলে ভারতীয় বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কমান্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান, আরও ৩/৪ দিনের আগে ঢাকার ন্যূনতম শৃঙ্খলা আনয়ন করা সম্ভব নয়।

মন্ত্রিসভার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগে ঢাকায় ন্যূনতম নিরাপত্তার প্রতিষ্ঠা করা ভারতীয় বাহিনীর মূল উৎকণ্ঠা হলেও, মন্ত্রিসভার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটার প্রধান কারণটি ছিল অন্য। পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করেন ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বিপর্যস্ত অবস্থা এবং পাকিস্তানভিত্তিক অর্থনৈতিক সত্তা থেকে সহসা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অর্থ ও সম্পদের চূড়ান্ত অভাবের দরুন উক্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী

অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল করা কার্যত অসম্ভব ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল করার মত সম্পদ ও কারিগরি সহায়তার বাস্তব আয়োজন ব্যতীত কেবল মন্ত্রিসভার প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ সরকার কার্যকরভাবে সক্রিয় হতে পারতেন না। দ্বিতীয়ত, যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশের এই যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়, সেই এক কোটি শরণার্থীকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার নির্দিষ্ট আয়োজন না করে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের জন্য মন্ত্রিসভার ব্যগ্রতা প্রকাশ সঠিক বা শোভনীয় কোনটাই হত না।

যুদ্ধ শুরু হবার পর উপরোক্ত বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার পূর্ণ সুযোগ ছিল না। বিশেষত, বাংলাদেশ- সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিযুক্ত ভারতের প্রধান কর্মকর্তা ডি. পি. ধর সপ্তম নৌবহর উদ্ভূত জরুরী পরিস্থিতির জন্য ১১ই ডিসেম্বর থেকে যুদ্ধের সমাপ্তি অবধি মস্কোয় অবস্থান করছিলেন। ১৮ই ডিসেম্বরে ডি. পি. ধর কোলকাতা এসে পৌঁছাবার পর ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে তাঁর আলাপ- আলোচনা চলে এবং বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার অনুরোধ ভারতের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। সেই সময় ঢাকা ও দিল্লীর মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থা যা ছিল, তাতে দু'দেশের সরকারের পক্ষে এতগুলি জরুরী বিষয়ে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল করা এবং বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত অর্থনীতির জরুরী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সহযোগিতার পরিসর নীতিগতভাবে স্বীকৃত হওয়ার পর স্থির হয়, বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট আয়োজন নিরূপণ করা এবং সরবরাহের কর্মসূচী প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ২৩শে ডিসেম্বর এক উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধিদল ঢাকা পৌঁছাবেন। এই সব ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার পর অবশেষে ২২শে ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। মন্ত্রিসভা জনতার কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন বটে, তথাপি এই বিলম্বের ফল রাজনৈতিকভাবে মন্ত্রিসভার জন্য শুভ হয়নি - বাংলাদেশের আগ্রহে উদ্বেলিত মানুষের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি হয় এবং মন্ত্রিসভা তীব্রভাবে সমালোচিত হন। কিন্তু ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর মন্ত্রিসভা দ্রুতগতিতে যে সব সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার ফলে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন উপযোগী কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়, আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা হ্রাস পায়, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হয়, পরিত্যক্ত কলকারখানাসমূহ সচল করার জন্য নতুন

ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠন করা হয় এবং সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন সচল হতে শুরু করে।

দেশ শত্রুমুক্ত এবং জাতীয় সরকার স্বদেশে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রকে সচল ও সংগঠিত করার মুহূর্তে প্রধানতম অনায়ত্ত লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিবের মুক্তি। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য তখন আগ্রহে অধীর। ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রিতে প্রত্যাসন্ন আঘাতের মুখে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চোখে তিনিই ছিলেন মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা; ১৯৬৬ সালে ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণার ফলে কারারুদ্ধ হওয়ার পর ১৯৬৮-৬৯ সালের ছাত্র-জনতার ৬-দফা/১১-দফা দাবীর প্রমত্ত আন্দোলনের মুখে মুক্তিপ্রাপ্ত শেখ মুজিব যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে। ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৭১ এই দুই যুগান্তকারী সংগ্রামের কোনটিতেই তিনি নিজে যোগ দিতে পারেননি, কেবল সংগ্রামের ডাক দেবার অভিযোগে দু'বারই তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও, এর মাঝখানে ১৯৭০-এর নির্বাচনকে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির গণভোটে রূপান্তরিত করে সমগ্র দেশকে তিনি যেভাবে এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় সংহত করেন, যেভাবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির দাবীর বৈধতা সম্পর্কে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলেন এবং যেভাবে ১লা মার্চ থেকে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে এক দুর্বার অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করে মানুষের সংগ্রামী চেতনায় মৌল রূপান্তর সাধন করেন - তার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতা হিসাবে সাধারণ গণমানসে তিনি সর্বোচ্চ আসন অধিকার করেন। ২৫শে মার্চের পর ইয়াহিয়ার হত্যাউন্মত্ত সৈনিকেরা যখন এদেশের মানুষকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণে বাধ্য করে, তখন সংগ্রামের লক্ষ্য ও পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে তাঁর সেই আসন অপরিবর্তিত থাকে; সাধারণ মানুষ হত্যা ও বিভীষিকার মাঝে শেখ মুজিবকেই মনে করেছে তাদের মুক্তিআকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁর এই প্রতীক মূল্য যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, তজ্জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠার প্রচার করেছে বঙ্গবন্ধুর 'বজ্রকণ্ঠ', প্রচার করেছে তাঁকে নিয়ে রচিত অজস্র কথা, গাথা ও গান।

অবশেষে এই বাস্তব ও কল্পনার মিলিত উপাদানে গঠিত সেই অপরাজেয় নায়ককে পাকিস্তানী বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করার পালা। তাঁর

মুক্তির পণমূল্য হিসাবে সাড়ে একানব্বই হাজার পাকিস্তানী সামরিক ও বেসামরিক বন্দী তখন বাংলাদেশের করায়ত্ত। মুখ্যত শেখ মুজিবের মুক্তির পণমূল্য হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের অবরুদ্ধ উপকূলভাগ দিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর নিষ্ক্রমণ পরিকল্পিতভাবে বন্ধ করা হয়েছিল। যদি উপকূলভাগ দিয়ে তাদের পলায়নপথ উন্মুক্ত রাখা হত, তবে ৭ই ডিসেম্বর যশোরে তাদের পতনের পর দক্ষিণ দিকে তাদের যেভাবে দৌড় শুরু হয়েছিল তার ফলে সম্ভবত পরবর্তী দু'তিন দিনের মধ্যেই সমগ্র বাংলাদেশ খালি করে সমুদ্রপথে তারা পালিয়ে যেত; ফলে ৯ই ডিসেম্বরে যুদ্ধবিরতির ও সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য মালেকের আবেদন, ইয়াহিয়ার সম্মতি এবং তার পরের দিন রাও ফরমান কর্তৃক সসম্মানে সৈন্য প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সহায়তা প্রার্থনা - এই সব কোন কিছুর প্রয়োজন হয়ত তাদের হত না। পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে, পাকিস্তানের জন্য নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সমর্থন যত প্রবলই হোক, তারপর বঙ্গোপসাগরের অভিমুখে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর কোন সামরিক ভিত্তিই তাঁকে দেখতে পেতেন না। কাজেই সর্বাধিক সংখ্যক যুদ্ধবন্দী পাবার আশায় পাকিস্তানী বাহিনীর পলায়নপথকে রুদ্ধ করে কার্যত সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়; ফলে যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়, প্রাণহানি বাড়ে, বিশ্বের বৃহত্তম দুই শক্তির সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। সপ্তম নৌবহর এসে পড়ার প্রাক্কালে দৈবাৎ পাকিস্তানী সিগন্যালস্ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকায় গভর্নর ভবনের উপর ভারতীয় বিমানবাহিনীর অভ্রান্ত আক্রমণে এবং স্থল বাহিনীর ক্রম সঙ্কুচিত বেষ্টনীর মুখে পাকিস্তানী কমান্ডের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ায় বাংলাদেশের বিজয় সম্পন্ন হয়। কাজেই এক অসামান্য ঝুঁকি নিয়ে শেখ মুজিবের এই মুক্তিপণ সংগৃহীত হয়। কিন্তু তা সদ্ব্যবহারের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়ার আগেই জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ২১শে ডিসেম্বর ইসলামাবাদ থেকে স্পষ্ট আভাস দেওয়া হয়, শেখ মুজিবকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হবে।

পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে তাদের নির্বুদ্ধিতার মাশুল দিতে হয় নিয়াজীর আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই। বৈদেশিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তানের' স্থিতাবস্থা কায়েম করার কৌশল হিসাবে ইয়াহিয়াচক্র ৩রা ডিসেম্বর থেকে সীমিত যুদ্ধ শুরু করেছিল। তার পরিণাম ফল হিসাবে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান তো বটেই, তদুপরি তাদেরকে ৯১,৪৯৮ জন অভিজ্ঞ সামরিক ও বেসামরিক

ব্যক্তিকেও [৩৩৯] যে যুদ্ধবন্দী হিসাবে হারাতে হবে, তা ছিল ইয়াহিয়াচক্রের চিন্তার অগম্য। ১৬ই ডিসেম্বরে সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া 'চূড়ান্ত বিজয় অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংকল্প' প্রকাশ করা সত্ত্বেও পরদিন পাকিস্তানের সর্বত্র গণবিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে। ঐ দিন ভুট্টোর সামপ্রতিক চীন সফরের দুই সঙ্গী সামরিক বাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান- সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষোভকে মূলধন করে ইয়াহিয়াচক্রের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার শেষ চেষ্টা প্রতিহত করেন (ফলে ভারতের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গৃহীত হয়) এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষে সিদ্ধান্ত গঠন করেন।

এই সংবাদ পাওয়ার পর নিউইয়র্কে অবস্থানরত ভুট্টো ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে স্বল্পকালের জন্য সাক্ষাৎ করেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্রের বিবৃতি অনুসারে নিক্সন 'উপমহাদেশের স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি' সেই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বলে ভুট্টোর কাছে উল্লেখ করেন।[৩৪০] 'উপমহাদেশের স্থিতিশীলতা' প্রসঙ্গে নিক্সন ভুট্টোকে নির্দিষ্টভাবে কি পরামর্শ দিয়েছিলেন তা অজ্ঞাত থাকলেও, ওয়াশিংটন থেকে পাকিস্তান ফিরে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর পরই ভুট্টো ২০শে ডিসেম্বর তাঁর প্রথম বেতার বক্তৃতায় 'পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে ঘোষণা করেন, সেখানকার জনগণ যে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে বসবাস করতে চায় তাঁর এই বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেন, এবং সর্বোপরি ঘোষণা করেন 'অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোর ভিতরে - বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও ভারতের সৈন্যের উপস্থিতি ব্যতিরেকে - আলাপ- আলোচনাভিত্তিক সমাধানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য' তিনি প্রস্তুত রয়েছেন।[৩৪১] ২১শে ডিসেম্বর ভুট্টো ঘোষণা করেন, শেখ মুজিবকে শীঘ্রই জেল থেকে মুক্তি দিয়ে অন্য কোথাও গৃহবন্দী করা হবে।[৩৪২] ২২শে ডিসেম্বর ইসলামাবাদ থেকে ঘোষণা করা হয়, কারাগার থেকে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করা হয়েছে।[৩৪৩] ২৩শে ডিসেম্বর সংবাদ পাওয়া যায় তাঁকে আলোচনার জন্য রাওয়ালপিন্ডি আনা হয়েছে।[৩৪৪] ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার পরদিনই।[৩৪৫] ভুট্টোর এই অসাধারণ গতিবেগ তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়ের অসাধারণ গুরুত্বকেই প্রতিফলিত করে মাত্র।

২০শে ডিসেম্বর ‘অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোর অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য মিলিত’ হতে রাজী আছেন এই মর্মে ভুট্টোর ঘোষণা এবং শেখ মুজিবের আসন্ন মুক্তির সংবাদ স্বভাবতই বাংলাদেশের স্বাধীন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে। লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকার প্রতিনিধি কর্তৃক এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তাজউদ্দিন স্পষ্ট ভাষায় জানান, কোন শিথিল ফেডারেশনের অধীনে, ‘অখণ্ড পাকিস্তানের’ অধীনে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবের সহায়তা পাওয়া যাবে এর চাইতে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই তিনি ঘোষণা করেন, যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা আর কিছুতেই পরিবর্তনীয় নয়।[৩৪৬] পশ্চিমা দেশগুলির চোখে তাজউদ্দিন স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন সব চাইতে আপোসহীন; কাজেই ১৪ই ডিসেম্বরে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব জানানোর পর এবং নিক্সনের ‘গানবোট কূটনীতি’ বঙ্গোপসাগরের চরাভূমিতে আটকে যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশ্চিমা ইউরোপীয় মহলে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে যে, পাকিস্তানের সামরিক আধিপত্য বিলুপ্ত হওয়ার পর ‘পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ’ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে এর ‘ভবিষ্যৎ সম্পর্ক’ নিরূপণের জন্য উভয়পক্ষের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, সেখানে তাজউদ্দিনের পরিবর্তে শেখ মুজিবকে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।[৩৪৭]

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে যে ক’টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ছিল তন্মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্ন। বাংলাদেশ সরকার বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আটকের পর এক জোরাল অবস্থান থেকেই সে আলোচনা চালাতে পারতেন। কিন্তু তার আগেই ক্ষমতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো শেখ মুজিবের বন্দিত্বের সুযোগ নিয়ে সরাসরি তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। ইত্যবসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের শেষ দু’দিনে সপ্তম নৌবহরের ব্যর্থতা পরিদৃষ্টে ক্রুদ্ধ কিসিঞ্জার যখন নির্মীয়মাণ রুশ-মার্কিন সম্পর্ককাঠামোর ক্ষতিসাধনের হুমকি দেন, তখন এই বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়া হিসাবে মার্কিন বৈদেশিক নীতির বিষয়ে সেক্রেটারী রজার্স ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ফলে উপমহাদেশ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গিগত অনৈক্য বহুলাংশে হ্রাস পায়। ২৩শে ডিসেম্বর সেক্রেটারী অব স্টেট রজার্স উপমহাদেশ-সংক্রান্ত তাঁদের

নীতির সংশোধন করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, তবে তাঁরা এই 'দুই অংশের' বিচ্ছিন্নতারও পক্ষপাতী নন।[৩৪৮] বিগত নয় মাসের ঘটনা সম্পর্কে বহুলাংশেই অনবহিত বন্দী শেখ মুজিবের সঙ্গে ভুট্টো যে দিন আলাপ- আলোচনা করতে চলেছেন, ঠিক সে দিনই রজার্সের এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

'পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণ', 'দেশের দুই অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য নয়'-এ জাতীয় বিবৃতির উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই ছিল, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে কোন না কোনভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কিত রাখার চেষ্টা করা। ভুট্টোও, জানা যায়, একই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[৩৪৯] এই সব প্রচেষ্টার পিছনে সম্ভবত একটি মুখ্য বিবেচনা সক্রিয় ছিল: সব সাফল্যের পরেও ভারত (এবং পরোক্ষভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন) যে উপমহাদেশের ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শক্তি নয় তা প্রমাণ করা। তৎসত্ত্বেও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ভুট্টোর সম্ভবত বৃহত্তর স্বার্থ নিহিত ছিল পাকিস্তানের এই দুই অঞ্চলের ক্ষমতার বিচ্ছেদ স্থায়ী করার মধ্যে। ভুট্টোর জন্য এই উপলব্ধি নিশ্চয়ই নতুন ছিল না যে, একমাত্র পূর্ব ও পশ্চিমের স্থায়ী বিচ্ছেদের মাধ্যমেই পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর ক্ষমতার আসনকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু এ বিষয়ে অশোভন ব্যগ্রতা প্রকাশের রাজনৈতিক সুযোগ ছিল সীমিত। কাজেই বাহ্যত হলেও ভুট্টোকে এই সময় পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে সংযোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত দেখা যায়। মূলত এই উদ্যোগ ছিল যুক্তরাষ্ট্রেরই দ্বিতীয় স্তরের প্রচেষ্টা - সপ্তম নৌবহর দ্বারা পাকিস্তানকে একত্রিত রাখায় প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরের। শেষ পর্যন্ত যদি এ প্রচেষ্টাও সফল না হয় এবং ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অপরিবর্তিতই থাকে, তবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সূচিত আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য মৌল রূপান্তর রদ করার জন্য এই দেশকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনস্থ করার উদ্যোগই সম্ভবত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় স্তরের প্রচেষ্টা। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দারিদ্র্য- প্রপীড়িত দেশের মত বাংলাদেশকে মার্কিনী উদ্বৃত্ত খাদ্য, পণ্য ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে পশ্চিমা প্রভাব বলয়ের অধীনস্থ করার চিন্তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অভিনব ছিল না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যদি শেষ পর্যন্ত সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেই অবস্থায় পণ্য ও অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে এই নতুন দেশকে মার্কিনী প্রভাব বলয়ের

অধীনস্থ করার প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা বস্তুত শুরু হয় বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করারও আগে।[৩৫০]

এ কথা সত্য যে মুক্তিসংগ্রামের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের নির্মীয়মাণ একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কব্জা থেকেই কেবল বেরিয়ে আসেনি, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা পাকিস্তানী শাসনের সমর্থক বাঙালী বিত্তশালী ও সচ্ছল শ্রেণীকেও দুর্বল করে ফেলে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কায়েমী স্বার্থের এই অনুপস্থিতি/দুর্বলতার প্রশ্ন ছাড়াও এই শ্রেণীর সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশ্যক হিসাবে বিবেচিত আমলাতন্ত্রের পুঁজিবাদ- তোষণকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ অংশের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল দুর্বল এবং সশস্ত্রবাহিনীর আয়তন ও ক্ষমতা ছিল সীমিত। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের উঠতি পুঁজিপতি ও বিত্তাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্তদের প্রভাব প্রবল হলেও, এই দলের মধ্য ও নিম্ন স্তরে, বিশেষত তরুণ অংশের মধ্যে, পুঁজিবাদী বিকাশের বিরুদ্ধবাদী অংশ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী অংশ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ব্যবধান এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন দেশের আর্থ- সামাজিক রূপান্তরের জন্য আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী অংশের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করা বিশেষ দুরূহ ছিল না। এক্ষেত্রে বরং অপেক্ষাকৃত জটিল সমস্যা ছিল, ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের এক শোষণহীন আর্থ- সামাজিক পুনর্গঠন কর্মসূচীর পিছনে ঐক্যবদ্ধ করা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ বহুদলীয় কমান্ডব্যবস্থার অধীনে এদের সৃজনশীল কর্মোদ্যমকে উৎসাহিত ও ব্যবহৃত করার।

এই অবস্থায় বাংলাদেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের দুরূহ কাজটি সম্পন্ন হতে পারত, একমাত্র মার্কিন সাহায্যের প্রভাব ও সমর্থনেই। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য সম্পদের বিশাল প্রয়োজন মার্কিন পণ্য ও অর্থ সাহায্যে বহুলাংশে সহজ হতে পারত। এই মার্কিন সাহায্যের কাঁধে ভর করে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ যাতে কেউ শুরু করতে না পারে, সেই সচেতনতা থেকে ১৯শে ডিসেম্বর বেতার বক্তৃতায় তাজউদ্দিন ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য মার্কিন সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী নয়।[৩৫১] ২২শে ডিসেম্বর ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর বিমানবন্দরে এবং ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকা সচিবালয়ের সমস্ত অফিসার ও কর্মচারীদের সমাবেশে তিনি ঘোষণা

করেন, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা - এই তিন মূল নীতির উপর ভিত্তি করে দেশকে গড়ে তোলা হবে। সচিবালয়ের বক্তৃতায় সরকারী প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তারা সংগ্রাম করেছিলেন আইনের শাসন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সকল ধরনের শোষণ ও বৈষম্য চিরতরে বন্ধ করার জন্য এবং একমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এদেশের সকল মানুষের জীবিকা নিশ্চিত করা সম্ভব।[৩৫২]

তাজউদ্দিনের এই সকল ঘোষণা প্রায় সর্বাংশেই ছিল আওয়ামী লীগের দলীয় ঘোষণাপত্রের অধীন। দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌল রূপান্তরের জন্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে আওয়ামী লীগ যে সব লক্ষ্য অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেয়, সে সম্পর্কে দলীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবশালী একাংশের মনোভাব ছিল নেতিবাচক।[৩৫৩] '৭০-এর নির্বাচনে জনসাধারণ বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করার পর সেগুলির বাস্তবায়ন ছিল স্বাধীন সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দলীয় নেতৃবৃন্দের দক্ষিণপন্থী অংশের সহযোগিতা যে সামান্যই পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে তাজউদ্দিনের কোন সংশয় ছিল না। কাজেই তিনি এই সব লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে স্বাধীনতাসমর্থক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবোধকে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে সংহত ও সক্রিয় করা এবং দেশের তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর শক্তিতে রূপান্তরিত করার সংকল্প প্রকাশ করেন।[৩৫৪] ইতিপূর্বে ১৮ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা গণবাহিনীর সকল সদস্যের সমবায়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে ঐ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর ২৩শে ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকার তালিকাভুক্ত ও তালিকা-বহির্ভূত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে 'জাতীয় মিলিশিয়া' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়: 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মনে করেন যে মুক্তিবাহিনী এদেশের মেধার বৃহত্তম আধার, যার মধ্য থেকে এদেশের দ্রুত পুনর্গঠন এবং অবকাঠামো পুনঃস্থাপনের জন্য উৎসর্গিত নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব সম্ভব।[৩৫৫] বাংলাদেশ সরকারের এ সঠিক ঘোষণার পাশাপাশি, মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল অনিয়মিত অস্ত্রধারীর কাছ থেকে অস্ত্র পুনরুদ্ধার করাও ছিল এ স্কীমের অন্যতম প্রধান অঘোষিত লক্ষ্য।

অস্ত্র তখন ছিল মূলত তিন ধরনের লোকের হাতে: (১) পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন আধা-সামরিক বাহিনী ও অসামরিক সমর্থক; (২) মুক্তিযোদ্ধা; এবং (৩) বিজয়কালীন স্বঘোষিত 'মুক্তিযোদ্ধাদের' হাতে। এদের মধ্যে প্রথম গ্রুপের কাছ থেকে অস্ত্র পুনরুদ্ধার অপেক্ষাকৃত সহজ প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানী সমর্থকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরাই অস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। যে সব জায়গায় এরা প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে তোলে সেখান থেকে অস্ত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব বলে মনে হয় এবং অস্ত্রধারী পলাতকদের সাধারণ মানুষ চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে বাকী অস্ত্রশস্ত্র পুনরুদ্ধারের কাজ এগিয়ে চলে। দ্বিতীয় গ্রুপ অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা ভারতের ট্রেনিং শিবির থেকে এসেছিল তারা এবং তাদের জন্য সরবরাহকৃত অস্ত্র ছিল তালিকাভুক্ত। দেশের ভিতরে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের জন্য সরবরাহকৃত অস্ত্র এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে তাদের পরিচয়, তাদের অধীনস্থ সদস্য সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। অগণিত মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংগ্রামী চরিত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক সফল মুক্তিযুদ্ধের অভিন্ন গৌরবদীপ্ত পটভূমিতে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার যে সম্ভাবনা ছিল তার জন্য সঠিক রাজনৈতিক আবহাওয়া ও সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনার মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হয়।[৩৫৬]

সমস্যা প্রধানত ছিল, স্বঘোষিত 'মুক্তিযোদ্ধাদের' নিয়ে। এরা না ছিল রাজাকারদের মত পলায়নপর বা চিহ্নিত, না ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মত তালিকাভুক্ত। তবু এদের জন্য জাতীয় মিলিশিয়াতে যোগদানের সুযোগ যদি উন্মুক্ত করা হয় তবে তাদের একাংশকে, সম্ভবত বৃহত্তর অংশকেই, জাতি গঠনের নবীন উদ্দীপনার মাঝে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব হবে- এই অনুমানের ভিত্তিতে সরকার সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সমবায়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। স্থির করা হয়, পূর্ণ রাজনৈতিক আস্থা সৃষ্টিকল্পে সকল দল, মত ও গ্রুপ নির্বিশেষে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সমবায়ে 'জাতীয় মিলিশিয়া' গঠন, সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে শুরু করে নিম্নতম ইউনিট পর্যন্ত বহুদলীয় কমান্ড গঠন, এই কমান্ডের অধীনে 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি' কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পুনর্গঠন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য 'জাতীয় মিলিশিয়া' বাহিনীর নিয়োগ এবং তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি, তাদের পেশাগত বিকাশের সুযোগ, সামাজিক সম্মান, সুশৃঙ্খল বিকাশের জন্য পেশাগত নেতৃত্বকাঠামো ও অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠা- ইত্যাকার

উপাদান ও আয়োজনের সমন্বয়ে জাতির স্বাধীনতা অর্জনকারী যুবশক্তিকে এক নতুন সমাজ গঠনের পুরোভাগে সংহত করা এবং এই উপায়ে জাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করা সম্ভব।[৩৫৭]

জাতীয় মিলিশিয়ায় যোগদানের ক্ষেত্রে 'মুজিব বাহিনী'র সম্ভাব্য বিরোধিতা দূর করার জন্য যে দিন মিলিশিয়া স্কীম ঘোষণা করা হয়, সে দিনই অর্থাৎ ২৬শে ডিসেম্বর মেজর জেনারেল ওবানকে ঢাকা আনানো হয়।[৩৫৮] 'মুজিব বাহিনী'র ভূমিকা যাতে নতুন স্বাধীনতার জন্য সহনীয় হয়, তদুদ্দেশ্যে বিলম্বে হলেও ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের সহযোগিতার নিদর্শন তখন স্পষ্ট। ইতিপূর্বে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে শেখ মণি গ্রুপের অগ্রাভিযানের পথ নির্ধারিত হওয়ায় ঢাকা পৌঁছাতে তাদের কিছু বিলম্ব হয় বটে। ততদিনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ঢাকায় ভারতীয় বাহিনী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। ওবান ঢাকা পৌঁছানোর পর শেখ মণি এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন, অতঃপর 'মুজিব বাহিনী' নামে কোন স্বতন্ত্র বাহিনীর অস্তিত্ব থাকবে না।[৩৫৯] ২রা জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকার যখন জাতীয় মিলিশিয়ার ১১ জন সদস্যের সমবায়ে জাতীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করেন, তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হলেও মুজিব বাহিনীর দু'জন সদস্যকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৩৬০] একই দিনে প্রকাশ করা হয় যে ইতিমধ্যেই প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা প্রশাসকদের জরুরীভিত্তিতে জাতীয় মিলিশিয়া শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে সর্বদলীয় কমান্ডকাঠামো গঠিত হতে শুরু করে। এই স্কীম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মেজর জেনারেল বি. এন. সরকারকে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

আওয়ামী লীগের ভিতরে যে উপদলীয় উত্তেজনা বিরাজমান ছিল, তার কিছু উপশম ঘটে ২৭শে ডিসেম্বর পাঁচজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগের পর। এরা ছিলেন: আবদুস সামাদ আজাদ, ফণিভূষণ মজুমদার, জহুর আহমদ চৌধুরী, ইউসুফ আলী এবং শেখ আবদুল আজিজ। এদিকে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খোন্দকার মোশতাক দেশ মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যথাসম্ভব সঠিক বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে শুরু করেন।[৩৬১] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ রক্ষা করতে পারেননি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই যাতে মন্ত্রিসভায় কোন বিভেদের ছাপ না পড়ে তজ্জন্য অবশ্য খোন্দকার মোশতাককে মন্ত্রী পদে বহাল রাখা হয়। ইতিপূর্বে ২১শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার আবুল ফতেহকে

মাহবুব আলম চাষীর কাছ থেকে পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সমর্থক দলগুলির মধ্যে ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ 'অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা' গঠনের পক্ষে অতিশয় অধৈর্য হয়ে পড়লেও [৩৬২] তাজউদ্দিন '৭০-এর নির্বাচনী রায় অনুযায়ী মন্ত্রিসভার দলীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্নে অটল থাকেন। কিন্তু সেই সঙ্গে জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি অন্যান্য দলের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের কাঠামো সুদৃঢ় করে তুলতে শুরু করেন।

অংশত বাংলাদেশ সরকারের এই সব সঠিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে, অংশত ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচ্ছন্ন ও নিরপেক্ষ দৃঢ়তার ফলে এবং সর্বোপরি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাবার জন্য সাধারণ মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে মন্ত্রিসভা ঢাকা প্রত্যাবর্তনের মাত্র সপ্তাহকালের মধ্যেই ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অংশে পরিস্থিতির বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে।[৩৬৩] শহরাঞ্চলে লুঠতরাজ, অপরাধমূলক কার্যকলাপ এবং হিংসাত্মক ঘটনার দ্রুত অবসান ঘটতে শুরু করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই রাষ্ট্র শাসনের একটি সাধারণ ও সুপ্রাচীন নীতির যথার্থতা প্রমাণিত হয়-আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা যদি নিরপেক্ষ দৃঢ়তায় আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম ও সতর্ক থাকে এবং তাদের কাজ যদি ঊর্ধ্বতন হস্তক্ষেপে বিঘ্নিত না হয়, তবে সমাজ যত বড় অস্থিরতার মাঝেই নিক্ষিপ্ত হোক, তা পুনরায় বসবাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব।

অবস্থার এই ক্রমোন্নতি দৃষ্টে ২৭শে ডিসেম্বর নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতের সৈন্য প্রত্যাহারের গতিবেগ ত্বরান্বিত হয়। ঐ দিন জেনারেল মানেকশ ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ থেকে পঁচিশ হাজার সৈন্য ভারতে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে, আরও পঁচিশ হাজার সৈন্য ১৫ই জানুয়ারী নাগাদ ভারতে ফিরে যাবে এবং মোট সাত থেকে আট ডিভিশন সৈন্যের অবিশিষ্টাংশ আরও কিছুকাল বাংলাদেশে অবস্থান করবে।[৩৬৪] ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় ডি. পি. ধরের উপস্থিতিকালে তাজউদ্দিন এবং ডি. পি. ধরের মধ্যে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শেখ মুজিবের মুক্তির সম্ভাবনাসহ আন্তর্জাতিক ঘটনাধারা ক্রমশ যেভাবে বাংলাদেশের অনুকূলে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার ফলে এবং বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীকে দ্রুত সংগঠিত করার পরিকল্পনা কার্যকর করার পর আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ভারতীয় সৈন্য

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই লক্ষ্যে অর্থাৎ দেশের আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর কাছে দ্রুত হস্তান্তরিত করার লক্ষ্যে এই সব বাহিনীর সমপ্রসারণের জন্য নতুন অফিসার প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজন ছিল জরুরী। এই উদ্দেশ্যে ২৬শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা জাতীয় দেশরক্ষা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ থেকেও অনুমান করা চলে নতুন সরকারের দৃষ্টিতে দেশরক্ষা বাহিনীর সাংগঠনিক বিকাশ কি পরিমাণ অগ্রাধিকার পেয়েছিল।[৩৬৫]

একই দিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতার পুনরুজ্জীবন-বিশেষত শিল্প ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান পুনরায় সচল করার প্রচেষ্টা যাতে সফল এবং প্রতিশ্রুত নতুন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তদুদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য।

৩১শে ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা কেবলমাত্র পাকিস্তানী ব্যক্তিমালিকানাধীন কলকারখানা ও ব্যবসায়িক সংগঠনকে সরকারী মালিকানাধীনে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাঙালী ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প ও ব্যবসায়িক সংগঠনকে এই সিদ্ধান্তের বাইরে রাখা হয়। পরিত্যক্ত কলকারখানা পুনরায় সচল করার জন্য নতুন ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের সদ্ধান্ত নেওয়া হয় একই দিনে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশের সমস্ত পরিত্যক্ত শিল্প ইউনিটকে মোট ছ'টি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি ইউনিটের পরিচালনার জন্য শিল্প দফতরের উপ- পরিচালক বা সহকারী পরিচালক, ঋণদানকারী ব্যাংকের প্রতিনিধি, মিল ব্যবস্থাপক, রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং সরকার মনোনীত আর একজন সদস্যের সমবায়ে মোট পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়।[৩৬৬] এই সব ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই কোন রাজনৈতিক দল বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার প্রয়াস ছিল না। প্রধানত যে বিবেচনা থেকে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় তা ছিল: নতুন স্বাধীনতার উৎসাহ- উদ্দীপনার মাঝে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি ন্যায়নীতিভিত্তিক ও গঠনমূলক সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাঙালী ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের সংখ্যাল্পতাজনিত তীব্র সমস্যা দূর করার পাশাপাশি এই সব উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার সামাজিকীকরণ ফলপ্রসূ করে তোলা সম্ভব। বস্তুত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ঘোষণা এবং বাস্তবে তা কার্যকর করার জন্য দলীয়

সঙ্কীর্ণতামুক্ত ও ন্যায়নীতিভিত্তিক প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার প্রতি তাজউদ্দিনের অবিচল নিষ্ঠাই নতুন সরকারের অন্তর্বর্তী শিল্প- ব্যবস্থাপনা নীতিতে প্রতিফলিত হয়। ৩১শে ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভা ব্যাংকসমূহের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ব্যাংকসমূহের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়। ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানীসমূহ জাতীয়করণ করা হয় ৭ই জানুয়ারী।[৩৬৭]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন নিরূপণের জন্য ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভারতের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল ঢাকা ছ'দিন ধরে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিশদ আলাপ- আলোচনা চালান। এই সব আলাপ- আলোচনায় বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য যথাশীঘ্র সচল করা এবং এই উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় মুখ্য স্থান অধিকার করে। একই সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও সোভিয়েট বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় উভয় দেশের মধ্যে অবিলম্বে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য শুরু করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৬৮] ইত্যবসরে ভারতীয় নৌবাহিনীর সহায়তায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্মোপযোগী করে তোলা এবং নিমজ্জিত নৌযান ও ভাসমান মাইন পরিষ্কার করে বঙ্গোপসাগরের অবরুদ্ধ নৌপথগুলি উন্মুক্ত করার কাজ পাকিস্তানের পরাজয় বরণের পর দিন থেকেই জরুরীভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে চলছিল। ফলে ১লা জানুয়ারী নাগাদ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাল ওঠানো- নামানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ পুনঃস্থাপিত হয় এবং এই বন্দর কুড়ি ফিট গভীরতা সম্পন্ন জাহাজ চলাচলের উপযোগী হয়।[৩৬৯]

আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাধিত অগ্রগতিও নগণ্য ছিল না। ২৫শে মার্চের পর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ২৪৭টি ছোট- বড় রেলওয়ে ব্রীজের মধ্যে ১৯৪টি ব্রীজের মেরামত সম্পন্ন হওয়ায় ৩রা জানুয়ারী নাগাদ তেইশটি সেকশনে রেল সার্ভিস পুনরায় চালু হয়; যদিও বড় ব্রীজগুলির মেরামত সম্পন্ন হওয়ার জন্য আরও ছ'মাসের মত সময়ের প্রয়োজন বলে সরকারী সূত্রে প্রকাশ করা হয়। একই সূত্র থেকে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মোট ৩১৮টি সড়ক ব্রীজ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অস্থায়ী সংযোগ ও বিকল্প পথের সাহায্যে ঢাকা- চট্টগ্রাম, ঢাকা- সিলেট এবং ঢাকা- উত্তরবঙ্গে সড়ক যোগাযোগ মোটামুটিভাবে

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৭০] দেশের সব কটি জেলার মধ্যে ডাক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় ৩রা জানুয়ারী থেকে।

প্রায় ন'মাস দীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর মন্ত্রিসভা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, পূর্বতন অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র থেকে সর্বাংশে বিচ্ছিন্ন ও যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরায় সচল করার ক্ষেত্রে এবং একই সঙ্গে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মৌলিক সংস্কার সাধনের জন্য যে সমুদয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে বাস্তব সাফল্য সূচিত হয়- তদ্রূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। তৎসত্ত্বেও এই সব উদ্যোগ জনমানসে প্রত্যাশিত উদ্দীপনা সৃষ্টিতে অসফল হয়। এর কারণ ছিল একাধিক। প্রথমত, পাকিস্তানী অত্যাচার ও দখল অবসানের পর বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তাদের পুনর্বাসন ও জীবিকার সমস্যায় এতবেশী ভারাক্রান্ত ছিল যে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি তাদের দৃকপাত করার সময় ছিল না। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রভাবশালী- সম্ভবত বৃহত্তর অংশই ছিলেন বহুদলীয় ঐক্যভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌল রূপান্তর কর্মসূচীর বিপক্ষে- পন্থা ও লক্ষ্য উভয় সম্পর্কেই এদের আপত্তি ছিল সুগভীর। তা ছাড়া নবার্জিত রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর গোষ্ঠী ও দলগত ক্ষমতা বিস্তারের পক্ষে এদের ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে, তাজউদ্দিনের প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার নীতি রদ করার জন্য এদের বিরুদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়ে চলে। তৃতীয়ত, আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা তো বটেই দেশের সাধারণ মানুষ উদগ্রীব হয়ে ছিল শেখ মুজিবের প্রত্যাসন্ন মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রতিক্ষায়। অংশত এই কারণেও অনেকের কাছে তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভার এই সব পদক্ষেপের মূল্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার অধিক কিছু ছিল না। অথচ তাজউদ্দিন অবিচল নিষ্ঠায় ১৯৭০ সালে প্রদত্ত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রীয় নীতি ও সরকারী কার্যক্রম প্রণয়ন করে চলেন। একই সঙ্গে সরকারের কতিপয় আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পন্থা হিসাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের কাঠামো সদ্ব্যবহারে উদ্যোগী হন।

ওদিকে ভুট্টো পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের পর শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার কাজে উদ্যোগী হলেও তিনি এবং তাঁর পাশ্চাত্য

পৃষ্ঠপোষকগণ অচিরেই এই উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেন।[৩৭১] ৩রা জানুয়ারী করাচীতে আহূত এক বিশাল জনসভায় প্রেসিডেন্ট ভুট্টো উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যদি শেখ মুজিবকে 'শর্তহীনভাবে' মুক্তি দেন, তবে তারা তা অনুমোদন করবে কি না। সমবেত জনতা সমস্বরে তা সমর্থন করে।[৩৭২] ৮ই জানুয়ারী রাওয়ালপিন্ডির বিমানবন্দরে ভোর তিনটায় ভুট্টো শেখ মুজিবকে বিদায় জ্ঞাপন করেন। ঐ দিন সকালে শেখ মুজিব লন্ডনে পৌঁছান।

ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রায় এক পক্ষকাল ধরে ভুট্টো মার্কিন অভিপ্রায় অনুযায়ী বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাখার যত চেষ্টাই চালিয়ে থাকুন, লন্ডনে পৌঁছানোর পর শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি নিজের সমর্থন ঘোষণা করেন। লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে আলোচনা এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীতে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা লাভের পর ১০ জানুয়ারী ঢাকায় পৌঁছেই রেসকোর্সের হর্ষোৎফুল বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে শেখ মুজিব ভুট্টোকে উদ্দেশ করে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অপরিবর্তনীয়, পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্বতন সম্পর্ক আর পুনঃপ্রতিষ্ঠার নয়।[৩৭৩]

এরপর মূল রাজনৈতিক প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্ব পুনর্নির্ধারণের। ১১ই জানুয়ারী সকালে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন প্রথম এ বিষয়ে একান্ত আলাপে প্রবৃত্ত হন। এতদিন শেখ মুজিব ছিলেন রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী। পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কোন কার্যকরী ক্ষমতা নেই। সরকার পরিচালনার সর্বপ্রধান ভূমিকা শেখ মুজিব পালন করেন, তা- ই ছিল অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের ঐকান্তিক কামনা। তাদের এই ইচ্ছার কথা উভয় নেতাই অবগত ছিলেন। কাজেই সরকার পরিচালনার মূল দায়িত্ব শেখ মুজিবের কাছে হস্তান্তরিত করার বিষয়টি স্বল্প আলোচনার মাধ্যমেই স্থির হয়। অবশ্য আলোচনার শুরুতে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করেন। তাজউদ্দিন তখন জানান, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আওয়ামী লীগের বাইশ বৎসরের দাবী সহসা বাতিল করে প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; কাজেই এদেশে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থাই গড়ে তুলতে হবে এবং সে গড়ে তোলার দায়িত্ব শেখ মুজিবকেই পালন করতে হবে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, ১৯৭০ সালে দেশবাসী বিপুল ভোটে সে রায়ই জ্ঞাপন করেছিল; মাঝখানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী

নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণ শুরু করার পর দেশের সেই দুর্যোগকালে রাজনৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন মাত্র।[৩৭৪]

বাইরে অপেক্ষমাণ অসংখ্য দর্শনার্থীর অধৈর্য ভিড়। সকাল দশটায় আহূত মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগদানের তাড়া। ফলে দু'জনের আলোচনা আর এগুতে পারেনি। তাজউদ্দিন জানান তাঁর আরও কিছু জরুরী কথা বলার ছিল - মুক্তিযুদ্ধের এই সাড়ে ন'মাসে কোথায় কি ঘটেছে, কোন্ নীতি ও কৌশলের অবলম্বনে, কোন্ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কি পরিবর্তন ঘটেছে দেশবাসীর মনোজগতে, তরুণদের প্রত্যাশা ও মূল্যবোধে। কেননা এ সব কিছুর মাঝেই নিহিত ছিল দেশের পরবর্তী সংগ্রামের, তথা, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সংহত ও স্থিতিশীল করার এবং সাধারণ দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াইকে সাফল্যমণ্ডিত করার মূলসূত্র। কিন্তু তখন এ সব কিছু আলোচনার সময় ছিল না। পরেও কখনো সে সুযোগ তাজউদ্দিনের ঘটে ওঠেনি।

তাজউদ্দিন মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সবল জাতি গঠনের জন্য যে বহুদলীয় ঐক্যের কাঠামো গঠন, দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য সকল মুক্তিযোদ্ধা তথা তরুণ সমাজকে একত্রিত ও উদ্দীপ্ত করার আয়োজন এবং সাহায্যের আবরণে দেশকে আশ্রিত পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে যাবার সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক প্রয়াস প্রতিহত করার জন্য সাহায্য নির্ভরশীলতা সীমিতকরণের যে সব নীতিমালা তৈরী করেছিলেন, তা অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। নির্মীয়মাণ বহুদলীয় জাতীয় ঐক্যকাঠামোর পরিবর্তে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ দলীয় শাসন প্রবর্তন, আর্থ- সামাজিক মৌল রূপান্তরের প্রধান শক্তি হিসাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সমবায়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিবর্তে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে মুক্তিযোদ্ধাদের কেবল অনুগত অংশের সমবায়ে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন, এবং দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সরাসরি মার্কিন সাহায্য গ্রহণের নীতি মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গৃহীত হয়। নতুন নেতৃত্বের নিজস্ব প্রয়োজন ও উপলব্ধি অনুযায়ী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিকাশ ও ব্যবহার চলল এগিয়ে। সে ইতিবৃত্ত অন্য এক সময়ের, অন্য এক রাজনৈতিক পর্বের।